আল কুরআনের আয়াতসমূহের সমন্বয়সাধনে একটি অনবদ্য প্রয়াস

আল কুরআনের দ্বন্দ্ব নিরসন

মাওলানা মুহাম্মদ আনওয়ার গাঙ্গুহী

আল কুরআনের
দ্বন্দ্ব নিরসন

রচনা

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আনওয়ার গাঙ্গুহী (দা.বা.)
শিক্ষক, হাদীস ও তাফসীর বিভাগ
আশরাফুল উলূম, গাঙ্গুহ, সাহারানপুর, ভারত।

অনুবাদ

মাওলানা সুজায়াত উল্লাহ
এমএম (দাওরায়ে হাদীস), এমএ ফার্স্ট ক্লাস
প্রভাষক, পাঠাননগর আমিনীয়া ফাযিল মাদরাসা
ছাগলনাইয়া, ফেনী

সম্পাদনা

মাওলানা জাভেদ আহমাদ
এমএম (দাওরায়ে হাদীস), বিএ (অনার্স), এমএ (ডাবল)
অল ফার্স্ট ক্লাস এন্ড স্কলার্স
এমফিল, পিএইচ.ডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

আল কুরআনের দ্বন্দ্ব নিরসন
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আনওয়ার গাঙ্গুহী (দা. বা.)

প্রকাশক
মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ

প্রকাশকাল : জানুয়ারী ২০১৬

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অক্ষরবিন্যাস
মাকতাবাতুল ফাতাহ কম্পিউটার সেকশন

প্রচ্ছদ : মাকতাবাতুল ফাতাহ ডিজাইন সেকশন

মূল্য : ১৮০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণ
সানরাইজ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
বাংলাবাজার, ঢাকা

Al-Quraner Dondo Nirosion
Writer : Mawlana Muhammad Anwar Gonguhi
Date of Publication : January 2016, Publisher : Maktabatul Fatah Bangladesh, Corporate Office : 260 Malibagh (3rd Floor), Dhaka-1217. Sales Centre : Islami Tower, 11/1Banglabazar, Dhaka, Phone : 7111500, e-mail : maktabatulfatah@gmail.com

লেখকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ :

আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তিনি আমাকে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছোট অথচ মহৎ একটি কাজ সম্পন্ন করার তাওফীক দান করেছেন। এ কাজ একমাত্র পরম দাতা মহান আল্লাহর তাওফীক ও অনুগ্রহেই সম্পন্ন হয়েছে। এ আমার কোনো কৃতিত্ব নয়। কবির ভাষায়–

কোথায় আমি, কোথায় ফুলের ঘ্রাণ
প্রভাত-বায়ু শীতল করে প্রাণ।
সব তোমারই দান, সব তোমারই দান ॥

এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, মহাগ্রন্থ আল কুরআন দৃঢ়-মার্জিত ও সহজ-সরল একটি গ্রন্থ। এটা মতানৈক্য ও অসমতা এবং অসংগতি ও বৈপরীত্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا، قَيِّمًا.

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি তাঁর বান্দা মুহাম্মদ (স)-এর ওপর এমন একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে কোনো বক্রতা নেই। উপরন্তু এটি সুদৃঢ় গ্রন্থ।

সুতরাং কুরআন মাজীদে কোনো ধরনের অসামঞ্জস্য, মতানৈক্য, বৈপরীত্য ও অসমতা নেই; বরং আল্লাহ তায়ালা একে قَيِّم ও مُسْتَقِيْم তথা সুদৃঢ় ও সহজ-সরল ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। অসামঞ্জস্য ও বৈপরীত্য তো ঐ ব্যক্তির কথায় থাকে, যার প্রকৃতিতে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে, যার জ্ঞান এতটাই অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ যে, সে একটু পূর্বে কী বলেছে, এখন কী বলছে এবং ভবিষ্যতে কী বলবে, তা স্মৃতিতে ধারণ করতে সে অক্ষম। তাই যার চিন্তা ও মননে তালগোল পাকিয়ে ফেলার দোষত্রুটি রয়েছে এবং যার মেধা ও স্মৃতিতে সংমিশ্রিত নানা বিষয় দ্বিধার সৃষ্টি করে, কেবল সেই ব্যক্তির কথা ও কাজে অসামঞ্জস্য ও বৈপরীত্য প্রতীয়মান হয়। এটা যৌক্তিকও।

পক্ষান্তরে যেসব কারণে تَنَاقُض ও تَعَارُض হয়ে থাকে, সেসব দোষত্রুটি থেকে আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। ভুলে যাওয়া, স্মৃতিপট ধূসর হয়ে যাওয়াসহ অন্যান্য দোষত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ পবিত্র; বরং তিনি তো দৃশ্য ও অদৃশ্যের মহান দ্রষ্টা।

সুতরাং পবিত্র কুরআনে কীভাবে বৈপরীত্য ও বিরোধ পরিলক্ষিত হবে? তদুপরি যেসব আয়াতে বৈপরীত্য দেখা যায়, তা কেবল বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধানের কারণেই দেখা যায়। আমাদের জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির স্বল্পতার কারণেই এমনটি হয়; অন্যথায় গভীর দৃষ্টিতে তাকালে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের কোনো বৈপরীত্য নেই।

আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল বিজ্ঞ আলেম ও প্রাজ্ঞ মুফাসসিরকে উত্তম প্রতিদান দিন, যাঁরা বিশুদ্ধ নস ও গভীর জ্ঞানের আলোকে বিরোধপূর্ণ আয়াতসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন। পাশাপাশি তাঁরা এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন যে, সেদিকে দৃষ্টি দিলে এক আয়াতকে অন্য আয়াতের মোটেই বিরোধী মনে হয় না। তবে এ ব্যাখ্যা ও সমন্বয়-বিশ্লেষণগুলো শুধু তাফসীর গ্রন্থে নির্ধারিত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছে; সেখানে কোথাও ইঙ্গিতমূলকভাবে বর্ণিত হয়েছে, আবার কোথাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইবারতের মাধ্যমে دَفْع تَعَارُض তথা বৈপরীত্যের সমন্বয়সাধনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণে মানুষের মন খুব তাড়াতাড়ি এর প্রতি ধাবিত হয় না। এমনকি বৈপরীত্যের ধরন কী ছিল এবং তার সমন্বয় কীভাবে সাধন করা হলো, তাও মানুষ অনুধাবন করতে পারে না।

এমন কোনো কিতাব এ অধমের দৃষ্টিগোচর হয়নি, যাতে সকল বিরোধপূর্ণ আয়াতের বিরোধের ব্যাখ্যা ও তার যথোপযুক্ত সমাধান ও বিশ্লেষণ রয়েছে। তাই আমার ইচ্ছা হলো এমন একটি পুস্তিকা লেখার, যার মধ্যে বিরোধপূর্ণ সকল আয়াত সংকলন করে সেগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও বিরোধের বিশ্লেষণ তুলে ধরব। বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থের নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করে উক্ত দ্বন্দ্ব ও বিরোধের জবাব ও সমাধান প্রদান করব। যাতে করে ইলমে তাফসীরের ছাত্রদের জন্যে বিশেষ করে তরজমাতুল কুরআন ও জালালাইন শরীফের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্যে এ বিষয়টি সহজ ও বোধগম্য হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহে আমার এই ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করেছে।

চল্লিশ দিনের মধ্যে এ কাজটি সম্পন্ন করার বাসনা নিয়ে ২৯ শে রবিউস সানী ১৪১১ হিজরী মোতাবেক ১৮ নভেম্বর ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ রবিবার আল্লাহর নামে এ কিতাব প্রণয়নের কাজ শুরু করি। আল্লাহ তায়ালার রহমতে শিক্ষকতার দায়িত্ব ও খানকার ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও চল্লিশ দিনের মধ্যেই কাজটি সম্পন্ন হয়। ৮ জমাদিউস সানী ১৪১১ হিজরী, মোতাবেক ২৭ শে ডিসেম্বর ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ বৃহস্পতিবার যোহর নামাযের পরে এ কাজ সম্পন্ন হয়। সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার।

বাহুবলে এ ভাগ্য হয় না অর্জন
যদি না দান করেন প্রভু-নিরঞ্জন।

আল্লাহ তায়ালা যেন এ খেদমত কবুল করেন, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করেন, পুস্তিকাটি পাঠকের জন্যে উপকারী হিসেবে সাব্যস্ত হয় এবং আল্লাহ তায়ালা একে আখেরাতের পাথেয় ও নাজাতের উপায় হিসেবে কবুল করেন, আমীন!

বিনীত
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আনওয়ার গাঙ্গুহী (দা.বা.)
শিক্ষক, হাদীস ও তাফসীর বিভাগ
আশরাফুল উলূম গাঙ্গুহী, সাহারানপুর, ভারত।

অনুবাদকের কথা

পবিত্র কুরআন মাজীদ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (স)-এর ওপর নাযিলকৃত একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব। এর মাঝে সন্দেহ বা বক্রতার কোনো অবকাশ নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهٗ عِوَجًا، قَيِّمًا .

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে, যিনি স্বীয় বান্দার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। আর তাতে একটুও বক্রতা রাখেননি; (বরং) সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (সূরা কাহাফ : আয়াত ১)

পবিত্র কুরআন এমন ছন্দবদ্ধভাবে সাজানো হয়েছে যে, এর একটি আয়াত অপরটির সাথে বড়ই সামঞ্জস্যশীল– শব্দগত ও অর্থগত উভয় দিক থেকে। তবে কতিপয় আয়াত এমন রয়েছে, বাহ্যিকভাবে যেগুলোর একটির সাথে অপরটিকে সাংঘর্ষিক বলে মনে হয়। মূলত ঐ আয়াতগুলোর মাঝে পরস্পর কোনো বিরোধ ও দ্বন্দ্ব নেই। আমাদের স্বল্প মেধা ও বিচক্ষণতার অভাব হেতু এমনটি মনে হয়। এই বাহ্যিক দ্বন্দ্ব নিরসনে যুগে যুগে মুফাসসিরীনে কেরাম তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে অনবদ্য খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। তাফসীর গ্রন্থগুলোর কলেবর এত বৃহৎ যে, তা থেকে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী পাঠকমহলের জন্যে এ বিষয়ে জ্ঞান আহরণ দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে সুখের বিষয় হলো, এ বিরোধপূর্ণ আয়াতসমূহকে একত্র করে ১৩৫টি শিরোনামে সাজিয়ে آیات متعارضہ اور ان کا حل নামে উর্দূ ভাষায় এক চমকপ্রদ গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন হযরত মাওলানা আনওয়ার সাহেব গাংগুহী (দাঃ বাঃ)।

কিতাবটি কওমী, আলিয়া ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ব্যাপক সমাদৃত হওয়ায় **মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ** এর বাংলা অনুবাদ করতে মনস্থ করে। আলহামদুলিল্লাহ! মাকতাবাতুল ফাতাহ বহু গ্রন্থ অনুবাদ করে ইলমে দীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে, যা ইতোমধ্যে সুধীজনের ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ কিতাবটি বাংলাভাষায় অনূদিত হওয়ার ফলে পাঠকগণের নিকট বিশেষ করে তাফসীরে জালালাইন জামাতের শিক্ষার্থী ও সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হবে বলে আমি আশাবাদী।

গ্রন্থটির গুণগত মান বৃদ্ধিতে সচেতন শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও বিজ্ঞজনের যে কোনো গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে এবং সে মোতাবেক পরবর্তী সংস্করণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট এ গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা ও পাঠকপ্রিয়তা কামনা করছি।

সূচিপত্র

আল কুরআন কাদের জন্যে হেদায়াত? # ১৩
বৃষ্টি আকাশ থেকে হয় না মেঘমালা থেকে? # ১৫
আরবদের কুরআনের কয়টি সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল? # ২০
আকাশ সৃষ্টি পূর্বে না জমিন সৃষ্টি পূর্বে? # ২৩
কাফেররা জাহান্নাম থেকে বের হবে কি? # ২৯
পরকালে কেউ কারো থেকে কোনো উপকার পাবে কী? # ৩৪
কেয়ামত দিবসে কারো সুপারিশ কবুল হবে কি? # ৩৮
কেয়ামত দিবসে কাফেরদের জন্যে কোনো সুপারিশকারী হবে কি? # ৪০
হযরত মুসা (আ)-কে তূর পাহাড়ে কয় দিনের জন্যে ডাকা হয়েছিল? # ৪২
কবীরা গুনাহকারী কি সর্বদা জাহান্নামে থাকবে? # ৪৩
আল কুরআনের আয়াতে পরিবর্তন সাধিত হয় কি? # ৪৭
সবচেয়ে বড় জালেম কে? # ৪৮
মাশরিক ও মাগরিব তথা পূর্ব-পশ্চিমের সংখ্যা কত? # ৫১
নামাযে কিবলামুখী হওয়া জরুরি কি না? # ৫৩
সৃষ্ট জগতের সাথে আল্লাহর সাদৃশ্য আছে কি না? # ৫৪
কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিন না কাফের? # ৬০
রমযানের রাতে ঘুমানোর পর খানাপিনা ও স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ কি না? # ৬৩
রমযানের রোযা রাখা জরুরি না ফিদিয়াও দেয়া যায়? # ৬৫
কুরআন লাইলাতুল কদরে নাজিল হয়েছে নাকি লাইলাতুল বারাআতে? # ৬৭
কাফেরদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ শুরু করা বৈধ না অবৈধ? # ৭১
নিষিদ্ধ বা সম্মানিত মাসে যুদ্ধবিগ্রহ বৈধ না অবৈধ? # ৭৩
স্বামীহারা স্ত্রীর ইদ্দত চার মাস দশ দিন নাকি এক বছর? # ৭৬
একটি নেকীর প্রতিদান তার সমকক্ষ না বহুগুণ? বহুগুণ হলে কত? # ৭৮
মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রকৃতি কী হবে? # ৮৩
মনের অনিচ্ছাধীন কুমন্ত্রণার ওপর পাকড়াও করা হবে কি না? # ৮৭
বান্দা সাধ্যাতীত কর্ম সম্পাদনে বাধ্য কি না? # ৮৯
পূর্ণ কুরআন সুস্পষ্ট না রূপক? না কিছু আয়াত রূপক আর কিছু সুস্পষ্ট? # ৯১
বদর যুদ্ধে কাফেররা মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখেছিল না তদপেক্ষা কম? # ৯৩
ঈমান ও ইসলাম এক নাকি ভিন্ন? # ৯৫
কাফেরদের সাথে সর্বাবস্থায় বন্ধুত্ব করা অবৈধ না শুধু ক্ষতির আশঙ্কা হলে? # ৯৭
হযরত যাকারিয়া (আ)-এর সন্তান লাভের নিদর্শন তিন দিন কথা না বলা নাকি তিন রাত? # ৯৯
স্রষ্টা কী শুধু আল্লাহ তায়ালা নাকি বান্দাও? # ১০০
হযরত আদম (আ) কীসের দ্বারা সৃষ্ট? # ১০২

কাফেরের তওবা কবুল হয় কি না? # ১০৫
আল্লাহ্ তায়ালাকে কতটুকু ভয় করা উচিত? # ১০৭
বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে কতজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়েছেন? # ১১০
সব পাপ ক্ষমা হবে না কিছু পাপ? # ১১৩
জান্নাত সৃষ্ট না কেয়ামতের পরে সৃষ্টি করা হবে? # ১১৫
মুমিনদের জন্যে পরকালে লাঞ্ছনা আছে কি? # ১১৭
মানুষ একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা রক্ষা করতে সক্ষম কিনা? # ১১৮
রিজিকদাতা শুধু আল্লাহ্ নাকি বান্দাও? # ১২০
ব্যভিচারের শাস্তি কী? # ১২২
উত্তরাধিকার নিকটাত্মীয়দের জন্যে নাকি চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের জন্যে? # ১২৪
মুশরিকরা কেয়ামত দিবসে কোনো কথা গোপন করতে পারবে কি? # ১২৭
নিয়ামত ও মুসিবত সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে, না মুসিবত বান্দার পক্ষ থেকে হয়? # ১২৯
আল কুরআনে কোনো দ্বন্দ্ব বা বিরোধ আছে কি? # ১৩১
রূহ্ কবজকারী আল্লাহ্ তায়ালা, মালাকুল মউত নাকি অন্যান্য ফেরেশতাগণ? # ১৩৩
পাপী ঈমানদার জাহান্নামে প্রবেশ করবে কি না? # ১৩৬
যাবতীয় সম্মান আল্লাহর জন্যে না রাসূল (স) ও মুমিনদের জন্যেও? # ১৩৭
অযুতে পা ধৌত করা ওয়াজিব না মাসেহ করা? # ১৩৮
আহলে কিতাবের ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা ওয়াজিব না ইচ্ছাধীন? # ১৩৯
আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার ওয়াজিব নাকি স্বীয় ইসলাহই যথেষ্ট? # ১৪১
অসিয়তের ব্যাপারে সাক্ষীগণ মুসলমান হওয়া আবশ্যক নাকি কাফেররাও সাক্ষী হতে পারে? # ১৪৪
আল্লাহ্ তায়ালা কি কাফেরদের সাহায্যকারী? # ১৪৬
তাবলীগে রিসালাতের ওপর পারিশ্রমিক দাবি করা নিষিদ্ধ না অনুমোদিত? # ১৪৭
আল্লাহ্ তায়ালার দর্শন হবে কি? # ১৫০
গুনাহের শাস্তি কি তদনুরূপ মিলবে না অতিরিক্ত? # ১৫২
পাপীরা কি কেয়ামত দিবসে শুধু নিজ পাপের বোঝা বহন করবে না অন্যদেরও? # ১৫৩
কেয়ামত দিবসে লোকদেরকে প্রশ্ন করা হবে কি? # ১৫৫
কাফেরদের দোয়া কি কবুল হয়? # ১৫৭
আসমান-জমিনের সৃষ্টি কি ছয় দিনে হয়েছে না আট দিনে? # ১৫৮
লূত (আ)-এর নসীহতের জবাবে তাঁর কওম কী উত্তর দিয়েছিল? # ১৬১
ছামুদ সম্প্রদায়ের ওপর কোন শাস্তি এসেছিল? # ১৬৩
হযরত শুয়াইব (আ)-এর কওম কোন আজাবে ধ্বংস হয়? # ১৬৫
মুসা (আ)-এর লাঠি মুজিযাস্বরূপ ছোট সাপে রূপান্তর হয়েছে না বড় সাপে? # ১৬৭
জাদুকররা ঈমান আনার সময় কি বলেছিল امنا برب موسى وهارون না برب هارون وموسى # ১৬৮

প্রিয়নবী (স)-এর ওপর শয়তানের কুমন্ত্রণা কার্যকর হতো কি? # ১৬৯
মুমিনদের অন্তঃকরণ আল্লাহর যিকিরে ভীত হয় না প্রশান্ত? # ১৭১
বদর যুদ্ধে কাফেরদের প্রতি কঙ্কর আল্লাহ তায়ালা নিক্ষেপ করেছেন না রাসূল (স)? # ১৭২
হুজুর (স)-এর উপস্থিতিতে কাফেরদের ওপর শাস্তি আসতে পারে কি? # ১৭৩
কাফেরদের সৎকাজ উপকারী নাকি বিনষ্ট ও ব্যর্থ? # ১৭৫
কাফেরদের সাথে সন্ধি করা বৈধ কি না? # ১৭৮
যুদ্ধের ময়দানে কত সংখ্যক কাফেরের সাথে মোকাবেলা করা অপরিহার্য? # ১৭৯
সমস্ত মুশরিকের সাথে যুদ্ধ করা অপরিহার্য, নাকি শুধু নিকটাত্মীয় মুশরিকদের সাথে? # ১৮১
জিহাদ কি সক্ষম, অক্ষম উভয়ের ওপর ফরয, নাকি শুধু সক্ষমের ওপর ফরয? # ১৮২
জিহাদে সবার বের হওয়া প্রয়োজন না একদলের? # ১৮৪
মানুষ বিপদে দোয়া করে নাকি নিরাশ ও হতাশ হয়ে থাকে? # ১৮৫
বনী আদমকে কীসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে? # ১৮৭
জান্নাতে প্রবেশ আমলের দ্বারা হবে, নাকি শুধু আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে? # ১৯১
কাফেরদের ঈমান আনয়নে কোন জিনিস প্রতিবন্ধক? # ১৯৪
কাফেরদের কেয়ামত দিবসে অন্ধ, বোবা ও বধির করে উঠানো হবে নাকি দৃষ্টিসম্পন্ন, কথক ও শ্রবণকারীরূপে? # ১৯৬
আসহাবে কাহাফ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কি বলেছিলেন? # ১৯৯
জান্নাতবাসীকে স্বর্ণের কংকন পরানো হবে নাকি রৌপ্য বা মোতির? # ২০১
বনী ইসরাঈলের দুই ভাইয়ের মধ্য থেকে কাফের ভাইকে দুটি বাগান দেয়া হয়েছিল না একটি? # ২০৩
কেয়ামত দিবসে পর্বতমালার কি অবস্থা হবে? # ২০৪
কেয়ামতের দিন কাফেরদের আমল পরিমাপ করা হবে কি? # ২০৬
সৎকর্মশীল মুমিনরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে কি? # ২০৮
হযরত মুসা (আ)-এর জিহ্বার জড়তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছিল কি না? # ২১১
হযরত সোলাইমান (আ)-এর অনুগত বাতাস তীব্র ছিল না মৃদু? # ২১৩
হযরত আইয়ুব (আ) স্বীয় অসুস্থতায় ধৈর্যধারণ করেছেন কি না? # ২১৪
কাফেরদের ভ্রান্ত উপাস্যরা তাদের সাথে জাহান্নামে উপস্থিত থাকবে কি না? # ২১৫
কেয়ামত দিবসে আকাশমণ্ডলীর কি অবস্থা হবে? # ২১৭
কেয়ামতের যলযলার সময় মানুষের ওপর মাতলামি আপতিত হবে কি? # ২২০
কেয়ামত দিবসের পরিমাণ কতটুকু? # ২২১
সমস্ত ফেরেশতাকে বার্তাবাহক বানানো হয়েছে নাকি কোনো কোনো ফেরেশতাকে? # ২২২
আদ সম্প্রদায়ের ওপর কী শাস্তি এসেছিল? # ২২৩
কেয়ামত দিবসে মানবসমাজ একে অপরকে কোনো প্রশ্ন করকে কি না? # ২২৫
যেনাকারীর সঙ্গে সতী নারীর বিবাহ বৈধ কি না? # ২২৭

শয়তানরা ফেরেশতাদের কথা শুনতে পায় কি না? # ২২৯
সোলাইমান (আ) শুধু পাখির ভাষা বুঝতেন নাকি অন্যান্য প্রাণীরও? # ২৩১
ইসরাফীল (আ)-এর প্রথম শিঙ্গা ফুঁকে লোকজন আতঙ্কিত হবে, না মৃত্যুবরণ করবে? # ২৩২
হযরত মুসা (আ)-এর ব্যাপারে তাঁর মাতা কোনো আশঙ্কা করেছিলেন কি? # ২৩৩
প্রিয়নবী (স) কাউকে হেদায়াত করতে পারেন কী? # ২৩৪
প্রিয়নবী (স)-এর জন্যে নয়জন পবিত্রতমা পত্নীর অতিরিক্ত কোনো পত্নী গ্রহণ করা বৈধ ছিল কি? # ২৩৫
কেয়ামতের দিন কাফেরদের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হবে নাকি দুর্বল? # ২৩৭
আল্লাহ তায়ালা মক্কা নগরের শপথ করেছেন কি? # ২৩৮
বনী ইসরাঈল গরু জবাই করেছিল কি? # ২৩৯
ইহুদিরা জাদুর অনুকরণ করাকে কি ঘৃণ্য জানত? # ২৪২
বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহর ইচ্ছায় প্রকাশিত হয়, না বান্দার ইচ্ছায়? # ২৪৫
আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত দিবসে কাফেরদের সাথে আলাপ করবেন কি? # ২৫০
পূর্ববর্তী যুগে লোকেরা ধর্মের ব্যাপারে এক ছিলেন, না ভিন্ন ভিন্ন? # ২৫৪
মানবসমাজের মধ্যে মতানৈক্য নবীগণের আগমনের পূর্বে হয়েছে, না পরে? # ২৫৬
হযরত ঈসা (আ) শুধু বনী ইসরাঈলের নবীরূপে প্রেরিত হয়েছেন, না অন্যান্যদেরও? # ২৫৮
বনী ইসরাঈলের সবাই কাফের ছিল, না কিছু মুমিনও ছিল? # ২৬০
দাওয়াত ও তাবলীগ পুরা উম্মতের ওপর অত্যাবশ্যক, না উম্মতের একাংশের ওপর? # ২৬১
নবী করীম (স) শুধু ভীতিপ্রদর্শনকারী না সুসংবাদদাতাও? # ২৬৩
কাফেররা নবুওয়তের নিদর্শনাবলি দেখলে কি ঈমান আনয়ন করতো? # ২৬৬
হযরত আদম (আ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ইচ্ছাকৃত ভক্ষ করেছেন না ভুলবশত? # ২৬৭
মানব ও জিন জাতিকে ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, না ইবাদত বর্জনের জন্যে? # ২৬৮
সাহাবায়ে কেরাম কি প্রিয়নবী (স)-এর কাছ থেকে জিহাদে গমন থেকে বিরত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করতেন? # ২৬৯
আজাব প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান আনয়নে কোনো লাভ হবে কি না? # ২৭০
অহী আসার পূর্বে প্রিয়নবী (স) ও তাঁর কওম কি পূর্বেকার গোত্রসমূহের কাহিনী জানতেন? # ২৭২
প্রত্যেক উম্মতের জন্যে রাসূল প্রেরিত হয়েছেন কি? # ২৭৪
জান্নাতের হুরসমূহ সাদা-হলদে বর্ণ হবে না লাল-সাদা মিশ্রিত? # ২৭৫
প্রিয়নবী (স) কি পথভ্রষ্ট ছিলেন? # ২৭৭

আল কুরআন কাদের জন্যে হেদায়াত?

١. الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

٢. الٓمّٓ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ. *

٣. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ. *

٤. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ.

অনুবাদ

১. আলিফ-লাম-মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই।
(সূরা বাকারা : আয়াত ১-২)

২. আলিফ-লাম-মীম। এগুলো প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত। হেদায়াত ও রহমত সৎকর্মপরায়ণদের জন্যে। (সূরা লোকমান : আয়াত ১-৩)

৩. হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশ বাণী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়। আর হেদায়াত ও রহমত মুসলমানদের জন্যে। (সূরা ইউনুস : আয়াত ৫৭)

৪. রমযান মাস হলো সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের হেদায়াত। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৫)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপরোল্লিখিত ১ ও ২ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল কুরআন শুধু মুত্তাকী ও সৎকর্মশীলদের হেদায়াতের পথে পরিচালিত করবে। পক্ষান্তরে ৩ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, সাধারণ মুমিন-মুসলমানদের হেদায়াতের পথে পরিচালিত করবে।

এবং ৪ নং আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত মানবের জন্যে আল কুরআন হেদায়াতরূপে দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব আয়াতগুলো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. বাস্তবে আল কুরআন হচ্ছে সমস্ত মানবের জন্যে হেদায়াতের চাবিকাঠি ও পথপ্রদর্শনের উজ্জ্বল প্রদীপ। যে কুরআন পাককে প্রত্যক্ষ করবে, পাঠ করবে এবং তার আলোচ্য বিষয় ও ভাবার্থে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা চালাবে, সে হেদায়াতের পথে পরিচালিত হতে সক্ষম হবে। তবে আয়াতগুলোর প্রথম তিনটিতে যা বলা হয়েছে অর্থাৎ তাকওয়া অর্জনকারী, সৎকর্মশীল ও মুমিন-মুসলমানদের আল কুরআন হেদায়াতের পথে পরিচালিত করবে, তার কারণ হলো, কুরআন পাকের মতো মহামূল্যবান ঝরনাধারা থেকে হেদায়াত গ্রহণ করতে তাঁরা অন্যদের তুলনায় খুব অগ্রগামী ও উৎসাহী হয়ে থাকেন। যদিও মর্তবা বা স্তরের দিক দিয়ে তাদের মাঝে কিছুটা তারতম্য থাকে, তবুও তারা ফায়দা অর্জনে পরস্পর অংশীদারপূর্ণ হন।

আরেকটি কারণ হলো, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ঈমান, তাকওয়া ও সৎকর্ম সম্পাদনের মতো মহামূল্যবান দৌলত দ্বারা ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী করেছেন। এজন্যে তাদের গুণকীর্তনকরণার্থে মহান আল্লাহ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ এবং هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِيْنَ বলেছেন।

(তাফসীরে আবুস সঊদ, তাফসীরে কাবীর ও তাফসীরে খাযেন)

২. হেদায়াত শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে। যথা– ক. إِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ তথা পথ দেখানো। খ. إِيْصَالٌ إِلَى الْمَطْلُوْبِ তথা গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। আল কুরআনের হেদায়াতের ব্যাপারে উভয় অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। আল কুরআন মুসলিম-অমুসলিম সব মানুষকে পথ দেখাতে সম্পূর্ণ সামর্থ্য রাখে এবং হক-না হক ও সত্য-মিথ্যার সবগুলো পথ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন– هُدًى لِلنَّاسِ অর্থাৎ, যা দল, মত নির্বিশেষে সকল মানুষকে পথ দেখাতে সক্ষম। তবে ঈমানদার, তাকওয়া অর্জনকারী ও সৎকর্মশীলগণের ব্যাপারে إِيْصَالٌ إِلَى الْمَطْلُوْبِ-এর অর্থটি সুনির্দিষ্ট। সুতরাং তারা কুরআনের শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে আসল গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে। একেই আল্লাহ তায়ালা প্রথমোক্ত তিন আয়াতের মধ্যে هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ ,هُدًى لِلْمُحْسِنِيْنَ ও هُدًى لِلْمُؤْمِنِيْنَ বলে ব্যক্ত করেছেন। অতএব প্রথমোক্ত তিনটি আয়াতের অর্থ إِيْصَالٌ إِلَى الْمَطْلُوْبِ ও শেষোক্ত আয়াতের অর্থ إِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ গ্রহণ করলে আয়াতগুলোর মাঝে আর কোনো দ্বন্দ্ব বাকি থাকে না। (তাফসীরে কাবীর)

বৃষ্টি আকাশ থেকে হয় না মেঘমালা থেকে?

١۔ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّأَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً.

٢۔ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا.

٣۔ وَهُوَ الَّذِىْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ.

٤۔ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ.

٥۔ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا.

٦۔ اَللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ.

٧۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوْهُ.

٨۔ وَاللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا.

٩۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ.

١٠۔ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهٖ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى.

١١۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً.

١٢۔ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ.

١٣۔ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا.

١٤۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً.

١٥۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ.

١٦۔ وَمِنْ اٰيَاتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً.

١٧. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ.

١٨. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ.

١٩. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ.

٢٠. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا.

٢١. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ. *

٢٢. حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ.

٢٣. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ.

٢٤. اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ
يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ.

٢٥. أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ.

٢٦. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.

অনুবাদ

১. যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্যে ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। (সূরা বাকারা : আয়াত ২২)

২. আর আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত জমিনকে সজীব করে তুলেছেন। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৪)

৩. তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি এর দ্বারা সব প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (সূরা আনয়াম : আয়াত ৯৯)

৪. পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম। (সূরা ইউনুস : আয়াত ২৪)

৫. তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। (সূরা রা'দ : আয়াত ১৭)

৬. তিনিই আল্লাহ্, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। (সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩২)

৭. আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি, অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদের তা পান করাই। (সূরা হিজর : আয়াত ২২)

৮. আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। তদ্দারা জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন। (সূরা নাহাল : আয়াত ৬৫)

৯. তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। (সূরা কাহাফ : আয়াত ৪৫)

১০. আকাশ থেকে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (সূরা তোয়াহা : আয়াত ৫৩)

১১. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর ভূপৃষ্ঠ সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। (সূরা হজ্জ : আয়াত ৬৩)

১২. আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মতো।
(সূরা মুমিনূন : আয়াত ১৮)

১৩. আর আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি পবিত্রতা অর্জনের জন্যে।
(সূরা ফুরকান : আয়াত ৪৮)

১৪. বল তো, কে সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেছেন পানি? (সূরা নামল : আয়াত ৬০)

১৫. যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে তার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে?
(সূরা আনকাবূত : আয়াত ৬৩)

১৬. তাঁর আরো নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ ভয় ও ভরসার জন্যে এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন।
(সূরা রূম : আয়াত ২৪)

১৭. আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি। অতঃপর তাতে উদ্‌গত করেছি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ। (সূরা লোকমান : আয়াত ১০)

১৮. তুমি কি দেখনি, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর তদ্দারা আমি বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উদ্‌গত করি।
(সূরা ফাত্বির : আয়াত ২৭)

১৯. তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর সে পানি জমিনের ঝরনাসমূহে প্রবাহিত করেছেন।
(সূরা যুমার : আয়াত ২১)

২০. এবং যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন পরিমিত। অতঃপর তদ্দ্বারা আমি মৃত ভূভাগকে পুনরুজ্জীবিত করেছি।
(সূরা যুখরুফ : আয়াত ১১)

২১. আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা দ্বারা বাগান উদ্‌গত করি। (সূরা কাফ : আয়াত ৯)

২২. এমনকি যখন বায়ুরাশি পরিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। (সূরা আরাফ : আয়াত ৫৭)

২৩. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন? অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। (সূরা নূর : আয়াত ৪৩)

২৪. তিনি আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন। অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এর পর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টির ধারা (সূরা রূম : আয়াত ৪৮)

২৫. তোমরা তা মেঘমালা থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি?
(সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত ৬৯)

২৬. আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি।
(সূরা নাবা : আয়াত ১৪)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপরিউক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে ১ থেকে ২১ পর্যন্ত আয়াতসমূহ দ্বারা বোঝা যায় যে, বৃষ্টি আকাশ থেকে বর্ষিত হয়।

পক্ষান্তরে ২২ থেকে ২৪ পর্যন্ত আয়াতসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয়।

এভাবে ২২, ২৩, ২৪ নং আয়াতে سَحَاب শব্দ এসেছে। যার অর্থ মেঘমালা।

২৫ নং আয়াতে مُزْن শব্দ উল্লেখ হয়েছে। যার অর্থ পানিতে ভরা সাদা মেঘমালা এবং

২৬ নং আয়াতে مُعْصِرَات শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। যার অর্থ হলো ঐ মেঘমালা যা বর্ষণের নিকটবর্তী হলো। সুতরাং উল্লিখিত শব্দগুলো দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। অতএব আয়াতগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : (১) প্রথমোক্ত ২১ আয়াতে سَمَاء (আকাশ) শব্দ ব্যবহার হয়েছে, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো سَحَاب তথা মেঘমালা। আর মেঘমালাকে سَمَاء শব্দ দ্বারা এজন্যে প্রকাশ করা হয়েছে যে, মহাশূন্যে বা আকাশ সীমায় যত বস্তু থাকে, সব বস্তুকে سَمَاء শব্দের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। এজন্যেই বলা হয়– كُلُّ مَا عَلَاكَ فَهُوَ سَمَاءٌ (তোমার উপরে যত বস্তু রয়েছে, সবগুলো سَمَاء)। সুতরাং মেঘমালাও যেহেতু প্রত্যেকের উপরে থাকে, এজন্যে তাকে سَمَاء বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এ বিশ্লেষণ মোতাবেক আয়াতগুলোতে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি থাকে না।

(২) বৃষ্টি বর্ষণ হয় মেঘমালা থেকে। আর মেঘমালা সৃষ্টি হয় আকাশমণ্ডলীর বিভিন্ন প্রভাব বা ক্রিয়ার দরুন। যেমন– সূর্য আকাশের মধ্যে বিদ্যমান থেকে স্বীয় আলোকরশ্মি সমুদ্রের পানিতে নিক্ষেপ করে, যার উষ্ণতার ফলে পানি বাষ্প হয়ে মহাকাশে গমন করতে সক্ষম হয়। অতঃপর সে বাষ্প বাতাসের তৃতীয় স্তরে পৌঁছে জমাট হয়ে যায়। আর যখন অধিক ভারী হয়ে যায়, তখন ফোঁটা ফোঁটা করে নীচের দিকে বর্ষণ হতে থাকে। এভাবে জলীয় বাষ্পগুলো মহাকাশে জমাট হয়ে ভারী ও গাঢ় হয়ে যাওয়াকে মেঘমালা নামে নামকরণ করা হয়। আর যখন জমিনের দিকে ফোঁটা ফোঁটা করে বর্ষণ হয়, তখন তার নাম হয়ে যায় বৃষ্টি। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। আর মেঘমালা সৃষ্টি হয় আকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের মাধ্যমে। এজন্যে রূপকার্থে বলা হয় যে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয়েছে। অতএব এবার বোধগম্য হলো যে, প্রথমোক্ত একুশ আয়াত রূপকার্থে ব্যবহৃত। আর শেষোক্ত পাঁচ আয়াত প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং এখন আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বাকি নেই।

(তাফসীরে রুহুল মাআনী)

আরবদের কুরআনের কয়টি সূরা
রচনার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল?

١. وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ.

٢. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ. *

٣. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ. *

٤. قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ.

٥. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ.

অনুবাদ

১. এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। (সূরা বাকারা : আয়াত ২৩)

২. তারা (মানুষ) কি বলে যে, এটি সে বানিয়ে এনেছে? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো এর মতো একটি সূরা। (সূরা ইউনুস : আয়াত ৩৮)

৩. তারা কি বলে? কুরআন তৈরি করেছ? তুমি বলো, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরি করে নিয়ে এসো। (সূরা হূদ : আয়াত ১৩)

৪. বলুন, যদি মানব ও জিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, তারা তা আনয়ন করতে পারবে না। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৮৮)

৫. যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর অনুরূপ কোনো রচনা উপস্থিত করুক। (সূরা তূর : আয়াত ৩৪)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা আল কুরআন অবতরণের সময় থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আগন্তুক সকল মানুষকে একত্রে সম্বোধন করে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন যে, যদি তোমরা

পবিত্রতম মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ কর, এবং এ ধারণা কর যে, উক্ত গ্রন্থ নবীজী (স) নিজের পক্ষ থেকে রচনা করেছেন, তাহলে তোমরা কুরআনের মতো ফাসাহাত ও বালাগাতপূর্ণ মহামূল্যবান কালাম রচনা করে নিয়ে এসো। এবং তোমাদের সাথে তোমাদের বন্ধুবান্ধব ও সাহায্যকারীও রাখ। তবে স্মরণ রাখবে যে, সকল মানুষ এক সঙ্গে মিলেও উক্ত মহাগ্রন্থের মতো কোনো কালাম রচনা করতে সক্ষম হবে না। মহান আল্লাহ উক্ত চ্যালেঞ্জ প্রদান করতে গিয়ে ১ ও ২ নং আয়াতে বলেছেন, তোমরা কুরআনের সূরার মতো একটি সূরা রচনা করো। ৩ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দশটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো এবং ৪ ও ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, পূর্ণ কুরআনে পাকের মতো একটি মহাগ্রন্থ রচনা করো। এভাবে ৫ নং আয়াতে حَدِيْث শব্দের উল্লেখ হয়েছে, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল কুরআন। অনুরূপভাবে উক্ত হাদীস শব্দ দ্বারা আল কুরআনের একটি আয়াত বা একটি বাক্যও উদ্দেশ্য নেয়া যেতে পারে। তখন চ্যালেঞ্জের অবস্থা খুব চমৎকার বলে গণ্য হয়ে যাবে। সুতরাং আয়াতগুলোতে কুরআনের অনুরূপ কালাম রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদানের পরিমাণের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেছে।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আল্লাহ তায়ালা প্রথমে পূর্ণ কুরআন শরীফের সমতুল্য মহাগ্রন্থ রচনা করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন। যখন মক্কার কাফেররা তথা সারা দুনিয়ার কুরআনবিরোধী চক্র চ্যালেঞ্জ কবুল করার সামর্থ্য রাখল না, তখন আল্লাহ তায়ালা দশটি সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন। এতেও তারা সমর্থ হলো না। ফলে আল্লাহ তায়ালা তৃতীয়বারের মতো আবার কুরআনে পাকের একটি মাত্র সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। এবং বললেন– فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ অর্থাৎ, আল কুরআনের মতো যে কোনো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো– বড় কিংবা ছোট। এখানে আল্লাহ তায়ালা سُوْرَة শব্দটিকে نَكِرَة (অনির্দিষ্ট) অবস্থায় উল্লেখ করেছেন। যার দ্বারা আল কুরআনের ছোট বা বড় যে কোনো সূরা বোঝা যায়। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণেও তারা সক্ষম হলো না। এজন্যে চতুর্থ বারের মতো আবার চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হলো–

فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِثْلِهِ.

অর্থাৎ, হে কুরআনবিরোধী চক্র! যদি তোমরা কুরআনের ছোট একটি সূরা রচনা করতেও সক্ষম না হও, তাহলে কুরআনের একটি আয়াত বা একটি বাক্য হলেও রচনা করে নিয়ে এসো। এ চ্যালেঞ্জ তারা গ্রহণ করতে সক্ষম

হলো না এবং ভবিষ্যতেও কেউ তা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মহাগ্রন্থ আল কুরআন কোনো মানবরচিত গ্রন্থ নয়; বরং এটি দৃশ্য ও অদৃশ্যের সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত মহান আল্লাহর বাণী।

অবশ্য উপরে চ্যালেঞ্জ প্রদানের যে ক্রমধারা বর্ণনা করা হয়েছে, তা কুরআন নাযিল হওয়ার ক্রমধারার ওপর ভিত্তিশীল। যদিও সূরাসমূহের বিন্যাস এর বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন– চ্যালেঞ্জবিশিষ্ট সূরাগুলোর মধ্যে প্রথমে সূরা ইসরা নাযিল হয়েছে এবং তাতে بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ তথা পূর্ণ কুরআনের সমকক্ষ গ্রন্থ রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর সূরা হূদ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাতে فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ অর্থাৎ, দশটি সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর সূরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাতে فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ অর্থাৎ, একটি সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার সারমর্ম হলো এই যে, উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহর বাণী রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদানের পরিমাণের ক্ষেত্রে যে তারতম্য দৃশ্যমান হচ্ছে, তা اِخْتِلَافُ الزَّمَانِ তথা সময়ের তারতম্য ও ব্যবধানের ওপর ভিত্তিশীল। আর যখন একাধিক বিপরীতমুখী বস্তু একাধিক সময়ে সংঘটিত হয়, তখন উক্ত বস্তুসমূহের মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয় না। অতএব আয়াতগুলোর মাঝে চ্যালেঞ্জ প্রদানের পরিমাণের ক্ষেত্রে এখন আর কোনো বিরোধই বাকি নেই।

(তাফসীরে রুহুল মাআনী, তাফসীরে কাবীর ও হাশিয়ায়ে সাবী)

আকাশ সৃষ্টি পূর্বে না জমিন সৃষ্টি পূর্বে?

١- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

٢- قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. *

٣- أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا إِلَى قَوْلِهِ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا.

অনুবাদ

১. তিনি সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্যে যা কিছু জমিনে রয়েছে সেসব। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুত তিনি তৈরি করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত। (সূরা বাকারা : আয়াত ২৯)

২. বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে, এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থির কর? তিনি সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন। তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন– পূর্ণ হলো জিজ্ঞাসুদের জন্যে। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন, যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ।
(সূরা হা-মীম সাজদা : আয়াত ৯-১১)

৩. তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন? তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন। এরপর এ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন। (সূরা নাযিয়াত : আয়াত ২৭-৩০)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতদ্বয় দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা প্রথমে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন।

পক্ষান্তরে ৩য় আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভূমণ্ডল আগে সৃষ্টি হয়নি; বরং নভোমণ্ডল আগে সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর ভূমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আয়াতগুলোতে পরস্পর বিরোধ হয়ে গেল। কেননা, তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে- وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا অর্থাৎ, ভূমণ্ডলকে নভোমণ্ডল সৃষ্টির পর বিস্তৃত করা হয়েছে।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতগুলোর মাঝে সৃষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা-

১. প্রথমে ভূমণ্ডল সৃষ্টি-বিষয়ক আয়াতগুলোকে আসল ও মূল সাব্যস্ত করে নভোমণ্ডল সৃষ্টি-বিষয়ক আয়াতগুলোতে তাবীল করা যাবে।

২. নভোমণ্ডল সৃষ্টি প্রথমে হয়েছে এ বিষয়ক আয়াতগুলোকে আসল সাব্যস্ত করে ভূমণ্ডল সৃষ্টি-বিষয়ক আয়াতগুলোকে তাবীল করা যাবে।

৩. এমন ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ বেছে নিতে হবে যার দরুন উভয় প্রকার আয়াতের মাঝে সৃষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর হয়ে যায়।

এই দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে নিম্নে চারটি জবাব প্রদান করা হলো-

১. ভূমণ্ডল সৃষ্টি প্রথমে হয়েছে এ বিষয়ক আয়াতসমূহ আসল বা মূল। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা প্রথমে ভূমণ্ডল ও তার পৃষ্ঠে অবস্থিত বস্তুসমূহ (পর্বতমালা, গাছপালা ও নদনদী ইত্যাদি) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, যা উপরিউক্ত প্রথম দুটি আয়াত দ্বারা বোঝা যায় এবং এর পক্ষে একটি বিশুদ্ধ হাদীসও বিদ্যমান রয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ الْيَهُوْدَ أَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى الْاَرْضَ يَوْمَ الْاَحَدِ وَالْاِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَمَا فِيْهِنَّ مِنَ الْمَنَافِعِ يَوْمَ الثُّلَثَاءِ وَخَلَقَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ الشَّجَرَ وَالْمَاءَ وَالْمَدَائِنَ وَالْعِمْرَانَ وَالْخَرَابَ فَهٰذِهِ اَرْبَعَةٌ فَقَالَ تَعَالٰى اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِيْنَ وَخَلَقَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ السَّمَاءَ وَخَلَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ النُّجُوْمَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْمَلَائِكَةَ. (اخرجه ابْنُ جَرِيْرٍ وَغَيْرُهٗ وَصَحَّحُوْهُ، رُوْحُ الْمَعَانِى ١٠٥\٢٤)

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ইহুদি হুজুর (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আকাশ-পাতালের সৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন হুজুর (স) ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তায়ালা রবি ও সোমবারে জমিন সৃষ্টি করেছেন। পর্বতমালা ও তাতে অবস্থিত উপকারী জিনিসসমূহ মঙ্গলবারে সৃষ্টি করেছেন এবং গাছপালা, পানি, নগরী, আবাদী ও অনাবাদী স্থানসমূহ বুধবারে সৃষ্টি করেছেন। অতএব এখন পূর্ণ চার দিন হয়ে গেল। এ বর্ণনাকে আল্লাহ তায়ালা এভাবে পেশ করেছেন যে, তোমরা কি এমন সত্তার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যিনি ভূমণ্ডলকে দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন? তোমরা কি তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করছ? অথচ তিনি জগৎসমূহের পালনকর্তা এবং তিনি ভূমণ্ডলে পর্বতমালা সৃষ্টি করে তাতে বরকত অবতরণ করেছেন। এবং তাতে আহার্য সৃষ্টি করেছেন চার দিনে। এটাই প্রশ্নকারীর প্রশ্নের পূর্ণ জবাব। এভাবে আল্লাহ তায়ালা বৃহস্পতিবারে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং জুমাবারে নক্ষত্র, সূর্য, চাঁদ ও ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেছেন। (তাফসীরে রুহুল মাআনী : ২৪/১০৫)

সুতরাং এ রেওয়ায়াত দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা ভূমণ্ডলকে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করার পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপভাবে আরো একটি রেওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে–

إِنَّهُ خَلَقَ الْأَرْضَ فِيْ يَوْمِ الْأَحَدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالْآكَامَ فِيْ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ وَالْأَشْجَارَ فِيْ الْأَرْبِعَاءِ وَخَلَقَ السَّمَاءَ فِي الْخَمِيْسِ وَالْجُمُعَةِ. (رواه الحَاكِم مَرفُوعًا حَاشِيَة جَلالَيْن صـ ٤٨٩)

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা রবি ও সোমবারে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। মঙ্গলবারে পাহাড় ও পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন। বুধবারে বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেছেন এবং বৃহস্পতি ও জুমাবারে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। (হাশিয়ায়ে জালালাইন : পৃষ্ঠা ৪৮৯)

অনুরূপভাবে যুক্তির নিরিখেও একথা প্রমাণিত হয় যে, ভূমণ্ডল সৃষ্টির বিষয়টি পূর্বেই হবে। কেননা, ভূমণ্ডল হলো ভিত্তি বা ফাউন্ডেশনের পর্যায়ে। আর নভোমণ্ডল হলো ছাদ পর্যায়ে। এজন্যেই তো আল্লাহ তায়ালা– وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوْظًا বলেছেন। সুতরাং ভিত্তি বা ফাউন্ডেশন যেহেতু পূর্বেই হওয়া সকলের কাছে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, সেহেতু ভূমণ্ডল সৃষ্টি আগেই হবে এবং নভোমণ্ডল সৃষ্টি পরে হবে। এটাকেই অধিকাংশ তাফসীরবিদ পছন্দ করেছেন।

তবে উল্লিখিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী যদি ভূমণ্ডল সৃষ্টিকে অগ্রগামী বলে ধরে নেয়া যায়, তাহলে وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا-এর মধ্যে তাবীল করতে হবে। আর তা হলো এই যে, الْاَرْضَ শব্দের শুরুতে تَدَبَّر ,تَذَكَّر বা اُذْكُر ক্রিয়াপদ উহ্য মানতে হবে। এবং بَعْدَ ذٰلِكَ শব্দকে উহ্য ক্রিয়াপদের ظَرْف হিসেবে সাব্যস্ত করতে হবে, অতঃপর دَحٰهَا শব্দটি جُمْلَة مُسْتَانِفَة হবে। সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা এখন এটা উদ্দেশ্য হবে না যে, ভূমণ্ডল সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির পরে হয়েছে; বরং উদ্দেশ্য হবে, আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের বর্ণনা ও স্মরণ করিয়ে দেয়া। অতএব যখন নবীজী (স)-কে নভোমণ্ডল-বিষয়ক নেয়ামতসমূহের জ্ঞান দান করা হয়, তখন তিনি ভূমণ্ডল বিষয়ক নেয়ামতসমূহকেও স্মরণ করবেন এবং সেগুলোর মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করতে থাকবেন এজন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করে নদী-সাগর প্রবাহিত করেছিলেন এবং তার থেকে জলাধার ও প্রস্রবণ বের করে দিলেন। অতঃপর এ ভূমণ্ডলের পৃষ্ঠের ওপর অসংখ্য-অগণিত বৃক্ষ ও উদ্ভিদ জগৎ সৃষ্টি করলেন। এভাবে পর্বতমালা ও পাহাড়সমূহ জমিয়ে দিলেন। অথবা উল্লিখিত আয়াতে بَعْد শব্দের অর্থ হবে مَعَ যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত আছে। আর بَعْد অর্থ مَعَ যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে সূরা নাযিয়াতের আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সৃষ্টি হয় না।

২. প্রথমে আকাশ সৃষ্টি হয়েছে এ বিষয়ক আয়াতগুলো আসল বা মূল প্রকৃতির ওপর ভিত্তিশীল। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা প্রথমে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, যা– وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইমাম ওয়াহেদী 'আল বাসীত' নামক কিতাবে হযরত মুকাতিল থেকে এটাই বর্ণনা করেছেন এবং বহু মুহাক্কিক আলেমও এটা পছন্দ করেছেন। এর কারণ হলো, যেসব আয়াতে আকাশ ও জমিনের কথা আলোচনা হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশের মধ্যে سَمٰوَات-কে اَرْض-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ. اَلَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ، اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ.

সুতরাং অধিকাংশ আয়াতে যেহেতু سَمٰوٰت-কে اَرْض-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু বোঝা গেল যে, আকাশ সৃষ্টি জমিন সৃষ্টির পূর্বেই হয়েছে। তা ছাড়া যুক্তির নিরিখেও এটা বোঝা যায় যে, আকাশ হচ্ছে উত্তম বস্তু। আর জমিন হচ্ছে অনুত্তম বস্তু। যেমন– আকাশ সত্তাগত, গুণগত ও আয়তনের দিক দিয়ে জমিন থেকে উত্তম পন্থায় অগ্রগামী হয় এবং স্থানের দিক দিয়ে উঁচু ও বুলন্দ হয়। এজন্যে তার সৃষ্টি অনুত্তম বস্তু তথা জমিন সৃষ্টির পূর্বেই হওয়া যুক্তিযুক্ত ও সংগত হবে বলে দাবি করা যায়। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা গেল যে, আকাশ সৃষ্টি জমিন সৃষ্টির পূর্বেই হয়েছে; পরে নয়।

অবশ্য এখানে জমিন সৃষ্টি প্রথমে হয়েছে এ বিষয়ক আয়াতগুলোর মাঝে তাবীল করতে হবে। সুতরাং সে আয়াতগুলোতে ثُمَّ اسْتَوٰى শব্দের মধ্যে ثُمَّ অব্যয়টি وَاو অব্যয়ের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যা দুটি বস্তুকে কোনো হুকুমের মধ্যে একত্রে বর্ণনা করার জন্যে ব্যবহার হয়। সুতরাং আয়াতগুলোতে আকাশ-পাতালের সৃষ্টি একত্রে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হবে; ধারাবাহিকতা নয়। ফলে সে আয়াতগুলোতে تَقْدِيْم ও تَاخِيْر-এর ক্রমধারা বর্ণনা করা মোটেই উদ্দেশ্য নেয়া উচিত হবে না।

অথবা এ তাবীল করা যাবে যে, আয়াতগুলোতে خَلَقَ শব্দের প্রারম্ভে اَرَادَ ক্রিয়াপদ উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ–

هُوَ الَّذِىْ اَرَادَ اَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا. قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ اَرَادَ خَلَقَ الْاَرْضِ فِىْ يَوْمَيْنِ.

উদ্দেশ্য নেয়া যাবে। যেমন– اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا-এর মধ্যে اِذَا اَرَدْتُمُ الْقِيَامَ এবং فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآن-এর মধ্যে اِذَا اَرَدْتَ الْقِرَاءَةَ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

সুতরাং এ তাবীল অনুসারে আয়াতগুলোর সারমর্ম হবে, আল্লাহ তায়ালা আকাশের পূর্বে জমিন সৃষ্টি করেননি; বরং সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন যে, অচিরেই আল্লাহ জমিন ও তাতে অবস্থিত বস্তুসামগ্রী সৃষ্টি করবেন। অতএব প্রথমে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ভূমণ্ডল সৃষ্টির ইচ্ছার পূর্ণতা প্রকাশ করলেন, যা ৩ নং আয়াত وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসন হয়ে গেল।

৩. তৃতীয় পদ্ধতিতে উপর্যুক্ত তিনটি আয়াতের মাঝে সৃষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসন করতে হলে প্রত্যেকটি আয়াতকে আসল ও মূল প্রকৃতির ওপর রেখে এমন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে হবে, যার দরুন আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

নিরসন হয়ে যায়। উক্ত ব্যাখ্যা হলো, প্রত্যেকটি বস্তুর দুটি দিক হয়ে থাকে। একটি ধাতুগত আর অপরটি আকৃতিগত। ধাতুগত দিক দিয়ে জমিন সৃষ্টি প্রথমে হয়েছে এবং আকৃতিগত দিক দিয়ে আকাশ সৃষ্টি প্রথমে হয়েছে। ধাতুগত দিক দিয়ে জমিন সৃষ্টি প্রথমে হওয়ার কথা ১ ও ২ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর আকৃতিগত দিক দিয়ে আকাশ সৃষ্টি পূর্ববর্তী হওয়ার কথা শেষোক্ত আয়াত তথা وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে উল্লেখ করা হয়েছে–

خَلَقَ اَوَّلاً مَادَّةَ الْاَرْضِ ثُمَّ جَعَلَ مَادَّةً مَا فِى الْاَرْضِ مِنَ الرَّوَاسِىْ وَالْاَشْجَارِ وَالْاَنْهَارِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ خَلَقَ مَادَّةَ السَّمَاءِ الَّتِىْ هِىَ دُخَانٌ ثُمَّ خَلَقَ صُوَرَ السَّمٰوَاتِ فَبَنَاهَا وَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَبَعْدَ ذٰلِكَ دَحَى الْاَرْضَ وَبَسَطَهَا وَمَدَّهَا وَخَلَقَ فِيْهَا الْجِبَالَ وَالْاَنْهَارَ وَالْاَشْجَارَ وَغَيْرَهَا.

অর্থ : আল্লাহ তায়ালা প্রথমে ভূমণ্ডল সৃষ্টির ধাতু সৃষ্টি করলেন। অতঃপর ভূমণ্ডলে অবস্থিত পর্বতমালা, গাছপালা ও নদনদী সৃষ্টির পদার্থ সৃষ্টি করলেন। এরপর আকাশ সৃষ্টির পদার্থ ধুম্র সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আকাশের দেহ সৃষ্টি করে তাকে সাত স্তরে বিন্যস্ত করে সুউচ্চে স্থির করে দিলেন। অতঃপর জমিনের দেহ সৃষ্টি করে তাকে বিস্তৃত অবস্থায় বিছিয়ে দিলেন এবং তার পৃষ্ঠে পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ও নদী-সাগর সৃষ্টি করলেন।

অতএব এ ব্যাখ্যানুসারে উপরিউক্ত আয়াতসমূহে কোনো প্রকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয় না। পরস্পর সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। (রুহুল মাআনী)

(৪) কোনো কোনো মুহাক্কিক তাফসীরবিদ এ ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন যে, ধাতুগত দিক দিয়ে আকাশ সৃষ্টি পূর্বে হয়েছে। আর দৈহিক আকৃতির দিক দিয়ে জমিন সৃষ্টি পূর্বে হয়েছে। (তাফসীরে রুহুল মাআনী)

কাফেররা জাহান্নাম থেকে বের হবে কি?

١- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

٢- بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ فَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

٣- وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ.

٤- وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

٥- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

٦- وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

٧- إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ إِلٰى قَوْلِهٖ وَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

٨- وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا.

٩- يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ.

١٠- لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُوْنَ.

١١- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

١٢. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا.

١٣. وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا.

١٤. وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ إِلَى قَوْلِهِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

١٥. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ.

١٦. لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ.

١٧. إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

١٨. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ.

١٩. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ.

٢٠. ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ.

٢١. لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

٢٢. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا.

٢٣. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

٢٤. وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا.

٢٥. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. *

٢٦. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ.

অনুবাদ

১. আর যারা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামী। তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে। (সূরা বাকারা : আয়াত ৩৯)

২. হ্যাঁ, যেসব ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, তারাই দোযখের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারা : আয়াত ৮১)

৩. তারা জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার নয়। (সূরা বাকারা : ১৬৭)

৪. তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল নষ্ট হয়ে যাবে। তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। (সূরা বাকারা : আয়াত ২১৭)

৫. আর যারা কুফরী করে, তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী। চিরকাল তারা সেখানে থাকবে।
(সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৭)

৬. যারা এর পুনরাবৃত্তি করবে, তারাই দোযখবাসী। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাকারা : আয়াত ৭৫)

৭. নিশ্চয় যারা কুফরী করে, তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহর সামনে কখনো কাজে আসবে না। আর তারা হচ্ছে দোযখের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬)

৮. যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে, তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। (সূরা নিসা : আয়াত ১৪)

৯. তারা দোযখের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে, কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না। তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।
(সূরা মায়েদা : আয়াত ৩৭)

১০. তারা নিজেদের জন্যে যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আজাবে থাকবে। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৮০)

১১. যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে এবং তা থেকে অহংকার করবে, তারাই দোযখী এবং তারা তথায় চিরকাল থাকবে।
(সূরা আরাফ : আয়াত ৩৬)

১২. তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে যে মোকাবেলা করে, তার জন্যে নির্ধারিত রয়েছে দোযখ। তাতে সে সবসময় থাকবে। (সূরা তাওবা : আয়াত ৬৩)

১৩. আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে দোযখের আগুনের। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। (সূরা তাওবা : আয়াত ৬৮)

১৪. আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ, অসৎ কর্মের বদলায় সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। কেউ নেই তাদের বাঁচাতে পারে আল্লাহর হাত থেকে। তাদের মুখমণ্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আঁধার রাতের টুকরো দিয়ে। এরা হলো দোযখবাসী। এরা অনন্তকাল তাতে থাকবে। (সূরা ইউনুস : আয়াত ২৭)

১৫. অতএব জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ করো। এতেই অনন্তকাল বাস করো, আর অহংকারীদের আবাসস্থল কতই নিকৃষ্ট! (সূরা নাহাল্ : আয়াত ২৯)

১৬. এই মূর্তিরা যদি উপাস্য হতো, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করতো না। প্রত্যেকেই তাতে চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে থাকবে। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৯৯)

১৭. নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদের অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে। (সূরা আহযাব : আয়াত ৬৪-৬৫)

১৮. বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্যে। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল! (সূরা যুমার : আয়াত ৭২)

১৯. তোমরা প্রবেশ করো জাহান্নামের দরজা দিয়ে সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্যে। কত নিকৃষ্ট দাম্ভিকদের আবাসস্থল! (সূরা মুমিন : আয়াত ৭৬)

২০. এটা আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি জাহান্নাম। তাতে তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আবাস। (সূরা হা-মীম সাজদা : আয়াত ২৮)

২১. আল্লাহর কবল থেকে তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারা জাহান্নামের অধিবাসী। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা মুজাদালা : আয়াত ১৭)

২২. অতঃপর তাদের উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে। চিরকাল তথায় বসবাস করবে। (সূরা হাশর : আয়াত ১৭)

২৩. আর যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। তা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থল! (সূরা তাগাবুন : আয়াত ১০)

২৪. যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা জিন : আয়াত ২৩)

২৫. আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম। (সূরা বায়্যিনাহ : আয়াত ৬)

২৬. অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে। (সূরা সাফফাত : আয়াত ৬৮)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপরিউক্ত ১ নং থেকে ২৫ নং পর্যন্ত আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর সেখান থেকে তাদেরকে আর বের করা হবে না। এভাবে কোনো কোনো আয়াতে خُلُوْد ও وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ শব্দও প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অথচ ২৬ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কাফেরদেরকে উষ্ণ পানি পান করানোর জন্যে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। অতঃপর পুনরায় জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। কারণ, উক্ত আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে–

فَإِنَّهُمْ لَآكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ.

অর্থাৎ, তারা যাক্কুম ফল ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে। অতঃপর তাদেরকে ফুটন্ত উষ্ণ পানি প্রদান করা হবে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে–

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيْمِ.

অর্থাৎ, অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কাফেরদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে উষ্ণ পানি পান করানো হবে। অতঃপর আবার জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। সুতরাং এ আয়াতের সাথে পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : উষ্ণ পানি পান করানোর জন্যে কাফেরদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না; বরং জাহান্নাম যেহেতু প্রশস্ত ও বিস্তৃত স্থান, সেহেতু তাতে জাহান্নামীদের জন্যে বিভিন্ন স্তর ও ধাপ থাকবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে নির্দিষ্ট নিবাস বা ঠিকানা থাকবে। সেখান থেকে তাদেরকে বের করে অন্য স্তরে বা কক্ষে নিয়ে ফুটন্ত উষ্ণ পানি পান করানো হবে। অতঃপর পুনরায় স্ব স্ব নিবাসে ফিরে আসবে।

সুতরাং এবার বোধগম্য হয়ে গেল যে, مَاء حَمِيْم (উষ্ণ পানি) জাহান্নামের বাইরেও অবস্থিত নয় এবং তা পান করার জন্যে জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে বের হওয়াও অত্যাবশ্যক নয়। এভাবে رُجُوْعٌ إِلَى الْجَحِيْم দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– رُجُوْعٌ إِلَى دَرَكَاتِ الْجَحِيْم وَمُسْتَقَرَّاتِهِم অর্থাৎ, জাহান্নামের এক স্তর থেকে অপর স্তরে নিয়ে যাওয়া এবং সেখান থেকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করা। অতএব, এখন আর শেষোক্ত আয়াতের সাথে পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। (তাফসীরে রুহুল মাআনী, জুমাল)

পরকালে কেউ কারো থেকে

কোনো উপকার পাবে কী?

١- وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا.

٢- وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا.

٣- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا
مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا.

٤- يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.

٥- لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ.

٦- يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ. *

٧- جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ.

٨- رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ.

٩- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.

অনুবাদ

১. আর সেদিনকে ভয় করো যেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আঁসবে না।
(সূরা বাকারা : আয়াত ৪৮)

২. তোমরা ভয় করো সেদিনকে যেদিন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না। (সূরা বাকারা : আয়াত ১২৩)

৩. হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো এবং ভয় করো এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোনো কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোনো উপকার করতে পারবে না।
(সূরা লোকমান : আয়াত ৩৩)

৪. যেদিন কোনো বন্ধু কোনো বন্ধুর উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। (সূরা দুখান : আয়াত ৪১)

৫. মানুষ তা-ই পাবে, যা সে করে। (সূরা নাজম : আয়াত ৩৯)

৬. যেদিন কেউ কারো কোনো উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর। (সূরা ইনফিতার : আয়াত ১৯)

৭. তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। (সূরা রা'দ : আয়াত ২৩)

৮. হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে প্রবেশ করান চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদের দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকেও। (সূরা মুমিন : আয়াত ৮)

৯. যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব। (সূরা তূর : আয়াত ২১)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপর্যুক্ত ১ ও ২ নং আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, কেয়ামত দিবসে কেউ কারো থেকে কোনো উপকার লাভ করতে পারবে না। ৩ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, পিতা পুত্র থেকে এবং পুত্র পিতা থেকেও কোনো ফায়দা লাভ করতে পারবে না। ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, এক বন্ধু অপর বন্ধু থেকে কোনো উপকার অর্জন করতে সক্ষম হবে না। ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষের জন্যে নিজের চেষ্টাই ফলপ্রদ হবে। অপরের চেষ্টা ও আমল কোনো কাজে আসবে না। ৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, কেয়ামত দিবসে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জন্যে কোনো বিষয়ে কোনো কিছু করার মালিক হবে না।

পক্ষান্তরে ৭, ৮, ৯ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের অধিবাসীগণের মধ্যে যারা উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত, তারা নিজ নিজ পরিবারবর্গের সদস্যগণ তথা বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তানাদির উপকার সাধন করতে পারবেন। কারণ, আয়াত নং ৭ ও ৮-এর মধ্যে ইরশাদ হয়েছে, সৎকর্মশীল মুমিন বান্দাগণের জন্যে জান্নাতে বহু উঁচু আসন বরাদ্দ থাকবে। তাদের সাথে তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রীগণ ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা মুমিন তারাও উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হবেন, যদিও তারা আমলের দিক দিয়ে উঁচু স্তরের অধিকারী নন। কিন্তু সৎকর্মে অগ্রগামী খাঁটি মুমিনগণের সম্মানার্থে তাদের স্বজনদেরকেও উচ্চাসনে পৌঁছে দেয়া হয়েছে, যাতে এক নম্বরের খাঁটি ঈমানদারগণের চক্ষুদ্বয় শীতল হয়ে যায় এবং আনন্দময় জীবনযাপনে প্রগতির স্রোতধারা অব্যাহত থাকে। যেমন একটি রেওয়ায়াতে ৭ নং আয়াতের এক তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে–

عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اَيْنَ اُمِّىْ اَيْنَ وَلَدِىْ اَيْنَ زَوْجَتِىْ؟ فَيُقَالُ لَمْ يَعْمَلُوْا مِثْلَ عَمَلِكَ. يَقُوْلُ كُنْتُ اَعْمَلُ لِىْ وَلَهُمْ ثُمَّ قَرَأَ الاٰيَةَ. (رواه ابن ابى حاتم وابو الشيخ، روح المعانى ١٤٣/١٣)

অর্থ : হযরত ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মুমিন বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করা মাত্রই বলবে, আমার মাতা কোথায়? আমার পিতা কোথায়? আমার সন্তানাদি কোথায়? আমার স্ত্রী কোথায়? তখন বলা হবে, ওরা তো আপনার মতো আমল করেনি। মুমিন বান্দা বলবে, আমি তো সব আমল আমার জন্যেও করেছি এবং তাদের জন্যেও করেছি। তারপর হযরত ইবনে জুবাইর উপরিউক্ত ৭ নং আয়াত পাঠ করলেন।

এভাবে উপর্যুক্ত ৯ নং আয়াতে তো পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে- اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (তাদের সাথে তাদের সন্তানাদিকে আমি সংযুক্ত করে উচ্চাসনে পৌঁছে দেব)। এ আয়াতের তাফসীরও এভাবে হাদীস দ্বারা করা হয়েছে যে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ض) قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْفَعُ ذُرِّيَّةَ الْمُؤْمِنِ مَعَهُ فِىْ دَرَجَتِهِ فِى الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانُوْا دُوْنَهُ فِى الْعَمَلِ لِتَقَرَّ بِهِمْ عَيْنُهُ ثُمَّ قَرَأَ الْاٰيَةَ اخرَجَهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَهَنَّادُ وَابْنُ جَرِيْرٍ وَابْنُ مُنْذِرٍ وَابْنُ اَبِىْ حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِى فِىْ سُنَنِهِ. (روح المعانى ٢٢/٢٧)

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে মুমিন বান্দার সন্তানাদিকে তার সাথে তার স্তরে পৌঁছে দেবেন, যদিও আমলের দিক দিয়ে তাদের মর্তবা কম হয়, যাতে তাদের দরুন মুমিন বান্দার চক্ষুদ্বয় শীতল হয়ে যায়। অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন-

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.

তাফসীরে রুহুল মায়ানীর লেখক বলেছেন যে, বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সুস্পষ্টতার দরুন বোঝা যায়, মুমিন বান্দাগণের সাথে তাদের সন্তানাদি, মাতাপিতা ও স্ত্রীগণ তথা স্বজনদেরকে সবসময়ের জন্যে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত রাখা হবে। শুধু সাক্ষাতের জন্যে স্বজনদেরকে মুমিন বান্দাগণের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে এমনটা নয়।

সুতরাং উপর্যুক্ত ৭, ৮ ও ৯ নং আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, এক মানুষ দ্বারা অপর মানুষ পরজগতে উপকৃত হবে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত ছয় আয়াত দ্বারা এর উল্টো বোঝা যায়। অতএব, আয়াতগুলোর মাঝে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি হলো।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে ১ ও ২ নং আয়াতে উল্লিখিত প্রথম نَفْس দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুমিন লোক। আর দ্বিতীয় نَفْس দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফের ব্যক্তি। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হবে, কোনো মুমিন ব্যক্তি কোনো কাফের ব্যক্তির কোনো বিষয়ে উপকার সাধন করতে পারবে না। অর্থাৎ, যদি কোনো মুমিন লোকের নিকটাত্মীয় বা বন্ধু কাফের হয়, তাহলে উক্ত কাফেরকে মুমিন লোকের সম্মানার্থে ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে না।

এভাবে ৩ নং আয়াত لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ الـخ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো–

لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ مُؤْمِنٌ عَنْ وَلَدِهِ الْكَافِرِ وَلَا مَوْلُوْدٌ مُؤْمِنٌ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ الْكَافِرِ.

অর্থাৎ, কোনো মুমিন পিতা কাফের পুত্রের জন্যে এবং কোনো মুমিন পুত্র কাফের পিতার জন্যে কেয়ামত দিবসে কোনো বিষয়ে উপকার প্রদান করতে পারবে না।

অনুরূপভাবে ৪ নং আয়াতের মর্মার্থ হলো–

لَا يَغْنِىْ مَوْلًى مُؤْمِنٌ عَنْ مَوْلًى كَافِرٍ شَيْئًا.

৫ নং আয়াতে سَعْى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো سَعْىِ اِيْمَانِى অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষ নিজ ঈমানের মাধ্যমে চেষ্টা-সাধনা করে উপকার অর্জন করতে পারবে। অপরের ঈমান কোনো কাজে আসবে না। সুতরাং মুমিন লোকের ঈমান দ্বারা কাফের ব্যক্তি কোনো ফায়দা অর্জন করতে পারবে না।

এভাবে ৬ নং আয়াতেও দ্বিতীয়োক্ত نَفْس শব্দ দ্বারা কাফের ব্যক্তি উদ্দেশ্য।

অবশ্য শেষোক্ত তিন আয়াত মুমিনগণের ব্যাপারে প্রযোজ্য যে, একজন মুমিন লোক অপর মুমিন লোক থেকে ফায়দা অর্জন করতে সক্ষম হবে। কারণ, জান্নাতের অধিকারী তো একমাত্র মুমিনগণই হবে। এজন্যে একজন মুমিনের সৎকর্ম ও তাকওয়াপূর্ণ কাজের দরুন পরকালে তার মুমিন নিকটাত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণও জান্নাতের মধ্যে উচ্চাসনের অধিকারী হবে।

আয়াত নং ৭ ও ৮-এর মধ্যে وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ বলা হয়েছে। এখানে مَنْ صَلَحَ-এর তাফসীর হযরত ইবনে যুবাইর مَنْ اٰمَنَ দ্বারা করেছেন, যা হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত মুজাহিদ থেকেও বর্ণিত আছে।

আয়াত নং ৯-এর মধ্যে তো (وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ) ঈমান শব্দকে প্রকাশ্যভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ তিন আয়াতের সারাংশ হবে এই যে, পরকালে একজন মুমিন অপর মুমিন থেকে উপকার লাভ করতে পারবে এবং একে অপরকে ফায়দা পৌঁছাতেও সক্ষম হবে। অতএব এখন উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি নেই। (তাফসীরে রুহুল মাআনী, মাযহারী ও জুমাল)

কেয়ামত দিবসে
কারো সুপারিশ কবুল হবে কি?

١- وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

٢- وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ. *

٣- لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا.

٤- وَلَا يَشْفَعُوْنَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ.

٥- وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهٗ.

٦- وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

٧- وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ
يَّأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى.

অনুবাদ

১. এবং তার পক্ষ থেকে কোনো সুপারিশও কবুল করা হবে না; কারো কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং তারা কোনো রকম সাহায্যও পাবে না। (সূরা বাকারা : আয়াত ৪৮)

২. এবং তার কাছ থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, কারো সুপারিশ তার কাজে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (সূরা বাকারা : আয়াত ১২৩)

৩. যে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না। (সূরা মারইয়াম : আয়াত ৮৭)

৪. তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত ২৮)

৫. যার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে ব্যতীত আল্লাহর নিকট অন্য কারো ব্যাপারে সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। (সূরা সাবা : আয়াত ২৩)

৬. তিনি ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে, তারা সুপারিশের অধিকারী হবে না। তবে যারা সত্য স্বীকার করতো ও বিশ্বাস করতো। (সূরা যুখরুফ : আয়াত ৮৬)

৭. আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছেন। তাদের কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন। (সূরা নাজম : আয়াত ২৬)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ম দুই আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে কারো ব্যাপারে কোনো সুপারিশ কবুল করা যাবে না এবং কারো সুপারিশের মাধ্যমে কেউ উপকৃতও হতে পারবে না, যা মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মাযহাব।

অথচ শেষোক্ত পাঁচ আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, পরকালে কিছু লোক এমনও বিদ্যমান থাকবে, যাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা অপরের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন এবং তাদের সুপারিশ কবুলও হবে, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাব। সুতরাং প্রথমোক্ত দুই আয়াতের সাথে শেষোক্ত পাঁচ আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের মর্মার্থ إِخْتِلَافُ الْأَشْخَاص তথা মানবজাতির শ্রেণিভেদের ওপর ভিত্তিশীল। অর্থাৎ প্রথমোক্ত ২ আয়াত কাফেরদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। যদি কেউ কোনো কাফের ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করে, তাহলে তা কবুল হবে না– لَا تُقْبَلُ مِنَ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ شَفَاعَةٌ فِىْ حَقِّ الْكَافِرَةِ আর শেষোক্ত ৫ আয়াত মুমিনগণের ব্যাপারে প্রযোজ্য। হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম, ফেরেশতাগণ ও সৎকর্মশীল মুমিনগণ পাপী মুমিনদের পক্ষে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। আল্লাহ্ তায়ালা উক্ত সুপারিশ কবুলও করবেন। (হাশিয়ায়ে সাবী, মাদারিক)

২. আয়াতগুলোর সারমর্ম إِخْتِلَاف زَمَان তথা সময়ের তারতম্যের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, প্রথমোক্ত ২ আয়াতের মর্মার্থ আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের ওপর ভিত্তিশীল। আর শেষোক্ত ৫ আয়াতের সারমর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ার পরবর্তী সময়ের ওপর ভিত্তিশীল। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে নবীগণ, ফেরেশতাগণ ও খাঁটি মুমিন বান্দাগণ পাপী ও গুনাহগার ঈমানদারগণের জন্যে সুপারিশ করবেন এবং তা কবুলও হবে। (তাফসীরে রুহুল মাআনী)

কেয়ামত দিবসে কাফেরদের জন্যে
কোনো সুপারিশকারী হবে কি?

١. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ.

٢. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ.

٣. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. *

٤. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.

٥. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.

অনুবাদ

১. এবং তার পক্ষে কোনো সুপারিশ কবুল করা হবে না এবং তার থেকে ক্ষতিপূরণও গ্রহণ করা হবে না। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮)

২. এবং তার কাছ থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং কারো সুপারিশ তার কাজে আসবে না। (সূরা বাকারা : আয়াত ১২৩)

৩. পাপিষ্ঠদের জন্যে কোনো বন্ধু নেই এবং এমন কোনো সুপারিশকারীও নেই, যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (সূরা মুমিন : আয়াত ১৮)

৪. অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো কাজে আসবে না। (সূরা মুদ্দাছ্ছির : আয়াত ৪৮)

৫. অতএব আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই। (সূরা শুআরা : আয়াত ১০০)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ম আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কাফেরদের জন্যে তো সুপারিশকারী হবে, তবে সুপারিশকারীর সুপারিশ কবুল করা হবে না। কেননা, উক্ত আয়াতগুলোতে حَرْفُ النَّفْى (নাবোধক অব্যয়) দ্বারা শুধু সুপারিশ কবুল ও গ্রহণ করাকে বাতিল করা হয়েছে। সুপারিশকারী হওয়া বাতিল করা হয়নি। সুতরাং উক্ত আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে,

কেয়ামত দিবসে কাফেরদের পক্ষে সুপারিশকারী হবে, তবে উক্ত সুপারিশকারীর সুপারিশ কবুল হবে না।

আর শেষোক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের জন্যে কোনো সুপারিশকারীই হবে না। কেননা, উক্ত আয়াতে কাফেরদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা বলবে– فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ (আমাদের জন্যে কোনো সুপারিশকারী নেই)। সুতরাং এ আয়াতটি পূর্বোক্ত ৪ আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতগুলোর মাঝে সৃষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিরসনকল্পে এ জবাব প্রদান করা হয় যে, কাফেরদের জন্যে কেয়ামত দিবসে কোনো সুপারিশকারী হবে না। যেমনটা ৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْض (মেনে নেয়ার ভিত্তিতে) বলা হয় যে, কোনো সুপারিশকারী হবে, তাহলেও তার সুপারিশ কবুল ও মঞ্জুর হবে না। যেমনটা প্রথমোক্ত ৪ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং সমস্ত মানব-দানব একত্রে সম্মিলিত হয়েও যদি কোনো কাফেরের পক্ষে সুপারিশ করে, তাহলেও তা কবুল করা হবে না। অতএব, প্রথমোক্ত ৪ আয়াত عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْض (মেনে নেয়া)-এর ওপর ভিত্তিশীল। আর শেষোক্ত আয়াতটি عَلٰى سَبِيْلِ الْوَاقِع তথা বাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল। (তাফসীরে রুহুল মাআনী)

হযরত মুসা (আ)-কে তূর পাহাড়ে
কয় দিনের জন্যে ডাকা হয়েছিল?

١. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. *

٢. وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ.

অনুবাদ

১. আর যখন আমি মুসার সাথে ওয়াদা করেছিলাম চল্লিশ রাত্রির। (সূরা বাকারা : আয়াত ৫১)

২. আর আমি মুসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরো দশ দ্বারা। বস্তুত এভাবে তার প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে চল্লিশ রাত্র দ্বারা। (সূরা আরাফ : আয়াত ৪২)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি (আল্লাহ) মুসাকে তূর পাহাড়ে চল্লিশ দিবস অবস্থান করার জন্যে আহ্বান জানালাম, যাতে আমি তাকে তাওরাত কিতাব প্রদান করতে পারি।

আর ২য় আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি (আল্লাহ) মুসা থেকে ত্রিশ রাত (দিনসহ)-এর অঙ্গীকার নিয়েছি। অতঃপর অতিরিক্ত দশ রাত বাড়িয়ে চল্লিশ রাত (দিনসহ) পূর্ণ করে দিয়েছি। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের মাঝে শুধু إِجْمَال ও تَفْصِيْل-এর পার্থক্য রয়েছে। আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কারণ, প্রথমে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ) থেকে ত্রিশ দিন পর্যন্ত তূর পাহাড়ে অবস্থান করে ইবাদতে মশগুল থাকার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। ফলে হযরত মুসা সেখানে লাগাতার ইফতার করা ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্যন্ত রোযা রেখেছেন, যাকে صَوْمُ الْوِصَال বলা হয়। আর যখন হযরত মুসা (আ) ত্রিশতম দিবসে পৌঁছলেন তখন ইফতার করে ফেলেন, যার দরুন রোযা অবস্থায় তার মুখে যে দুর্গন্ধ ছিল, যা আল্লাহ তায়ালার কাছে মেশক ও কস্তুরীর চাইতেও উত্তম ও পছন্দনীয়, সে দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়ে গেল। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা আরো দশ দিন রোযা রাখার আহ্বান জানালেন, ফলে সর্বমোট চল্লিশ দিন সিয়াম সাধনা হয়ে গেল। সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াতে সংক্ষিপ্ত আকারে চল্লিশ দিন সিয়াম সাধনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর শেষোক্ত আয়াতে বিস্তারিতভাবে হযরত মুসা (আ) তূর পাহাড়ে চল্লিশ দিন সিয়াম সাধনা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, إِجْمَال ও تَفْصِيْل-এর মাঝে যেহেতু কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সেহেতু আয়াতদ্বয়ের মাঝে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বাকি নেই।

কবীরা গুনাহ্কারী কি
সর্বদা জাহান্নামে থাকবে?

١. بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّأَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

٢. وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا.

٣. وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا.

٤. وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَإِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا. *

٥. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ.

٦. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ.

অনুবাদ

১. হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে, তারাই দোযখের অদিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।
(সূরা বাকারা : আয়াত ৮১)

২. আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। (সূরা নিসা : আয়াত ১৪)

৩. যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম। তাতেই সে চিরকাল থাকবে। (সূরা নিসা : আয়াত ৯৩)

৪. যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা জিন : আয়াত ২৩)

৫. আল্লাহ্ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে এমন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ।
(সূরা তাওবা : আয়াত ৭২)

৬. অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখতে পাবে।
(সূরা যিলযাল : আয়াত ৭)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : প্রথমোক্ত ৪ আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কবীরা গুনাহকারী সবসময় জাহান্নামে থাকবে। কারণ, আল্লাহ্ ও রাসূল (স)-এর নাফরমানি করা, শরীয়তের সীমা অতিক্রম করা ও জেনেশুনে অন্যায়ভাবে কোনো মুমিন মানুষকে হত্যা করা এসব কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। যারা এসব কাজে লিপ্ত হবে, তারা সর্বদা জাহান্নামে বসবাস করবে।

আর শেষোক্ত ২ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ঈমানদার ব্যক্তি জান্নাতে অবশ্যই প্রবেশ করবে, যদিও সে ফাসেক বা ফাজের তথা গুনাহ্গার হয়। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে গুনাহের দরুন দীর্ঘকাল জাহান্নামের শাস্তিতে লিপ্ত রাখবেন, যদি তাকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছে করেন। অতঃপর ঈমানের বদৌলতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করবে। কারণ, ৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানদারকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন এবং ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে উক্ত সৎকর্মের বিনিময় পাবে। আর সৎকর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু হলো ঈমানদারের ঈমান, যদিও নাকি ঈমানদার আমলশূন্য হয়। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ঈমানদার কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নামে সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার পর জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করবে। অতএব, শেষোক্ত আয়াতদ্বয় প্রথমোক্ত ৪ আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : বাস্তবে তো সেটাই হবে, যা শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ঈমানদার ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও কবীরা গুনাহের পাপে পাপিষ্ঠ হয়। যেমন এর পক্ষে একটি হাদীসও পরিষ্কারভাবে নির্দেশনা প্রদান করে–

عَنْ اَبِى ذَرٍّ ﷺ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ اَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ثُمَّ فِى الرَّابِعَةِ عَلٰى رَغْمِ اَنْفِ اَبِى ذَرٍّ. (رواه البخارى ومسلم، النبراس شرح العقائد)

অর্থ : হযরত আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী আকরাম (স)-এর নিকট আগমন করলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় ঘুমাচ্ছেন। অতঃপর আমি নবীজী (স)-এর নিকট দ্বিতীয়বার আগমন করলে তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ

اَللّٰهُ পাঠ করবে এবং এ পবিত্রতম কালেমার ওপর মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি আরজ করলাম, যদি ব্যভিচার বা চুরি করে, হুজুর (স) ইরশাদ করলেন, যদিও ব্যভিচার বা চুরি করে। অতঃপর আমি আবার আরজ করলাম, যদি ব্যভিচার বা চুরি করে। হুজুর (স) এবারও ইরশাদ করলেন, যদিও ব্যভিচার বা চুরি করে। এরপর আমি আবার আরজ করলাম, যদি ব্যভিচার বা চুরি করে। এবারও হুজুর (স) ইরশাদ করেন, যদিও ব্যভিচার বা চুরি করে। অতঃপর চতুর্থবার হুজুর (স) বললেন, আবু যরের নাক ধুলো মিশ্রিত হোক। অর্থাৎ, আবু যর যতই অপছন্দ করুক না কেন উক্ত ব্যক্তি অবশ্যই জানাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

বাকি রইল এখন সেসব আয়াত যেগুলোতে কবীরা গুনাহগারকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলা হয়েছে। যেমন উপর্যুক্ত ১ থেকে ৪ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, কবীরা গুনাহগার চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। সুতরাং এ আয়াতগুলোতে তাবীল করা হবে, যাতে অন্যান্য আয়াতের সাথে বিরোধ মিটে যায়।

১ম আয়াতে নিম্নরূপ তাবীল করা হয়েছে যে– بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً-এর মধ্যে سَيِّئَةً শব্দটি দ্বারা গুনাহে কবীরা নয়; বরং শিরক উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ (র) থেকে অত্র আয়াতে سَيِّئَةً-এর তাফসীর শিরকের দ্বারা বর্ণিত আছে। এভাবে হযরত ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস ও আবু হোরায়রা (রা) থেকে এবং ইবনে জরীর হযরত আবু ওয়ায়েল, মুজাহিদ, কাতাদা, আতা ও রবী (র) থেকে سَيِّئَةً ও خَطِيْئَةً শব্দের তাফসীর কুফর ও শিরক বর্ণনা করেন। সুতরাং এ তাফসীর অনুসারে বোঝা গেল যে, এ আয়াত কাফেরদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। অর্থাৎ কাফেররা সর্বকালে জাহান্নামে বসবাস করবে। গুনাহগার মুমিন-মুসলমানগণ নয়।

(তাফসীরে রুহুল মাআনী, মাদারিক ও খাযেন)

২য় আয়াতে এরূপ তাবীল করা হয়েছে যে– وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَ-এর মধ্যে حُدُوْد শব্দ দ্বারা جَمِيْع حُدُوْد উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করবে এবং আল্লাহ তায়ালার সমস্ত সীমা অতিক্রম করবে, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর সমস্ত সীমারেখা লঙ্ঘন করবে, সে কাফের হবে। কেননা, আল্লাহর সমস্ত সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাওহীদ তথা একত্ববাদের সীমারেখা। যে ব্যক্তি তাওহীদের সীমানা অতিক্রম করে, সে মুসলমানের মধ্যে গণ্য হতে পারে না, ফলে সে কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যাবে।

(তাফসীরে রুহুল মাআনী, নিবরাস)

৩য় আয়াতে এ তাবীল করা যায় যে, উক্ত আয়াতের সারমর্ম হলো- وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا لِكَوْنِهٖ مُؤْمِنًا অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোনো মুমিন লোককে মুমিন হওয়ার কারণে হত্যা করবে, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। আর একথা সুস্পষ্ট হয়ে আছে যে, কোনো মুমিনকে মুমিন হওয়ার কারণে হত্যা করা কুফরি ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা, এ হত্যা ঈমানের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণের অন্যতম দলীল। সুতরাং ঈমানের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা কুফরি। আর যে ব্যক্তি কুফরিতে লিপ্ত হবে, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। অতএব, এ আয়াতও কাফেরদের চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার ওপর সংবাদ বহন করে; মুমিনগণ নয়। (নিবরাস)

অথবা উক্ত আয়াতের ব্যাপারে এ ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে যে, যদি কোনো ব্যক্তি হালাল মনে করে কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তাহলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। কেননা, কোনো মুমিনকে হত্যা করা কবীরা গুনাহ্। আর কবীরা গুনাহকে হালাল মনে করা কুফরি। সুতরাং যে ব্যক্তি কুফরিতে লিপ্ত হয়ে দুনিয়া ত্যাগ করবে, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

(তাফসীরে রুহুল মাআনী, খাযেন ও জালালাইন শরীফ)

৪র্থ আয়াতে এ তাবীল ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় যে- وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ (আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (স)-এর নাফরমানি) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওহীদ ও রিসালাতের ক্ষেত্রে নাফরমানি করা। কারণ, এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে তাওহীদ (একত্ববাদ) সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হবে এটাই যে- مَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِالتَّوْحِيْدِ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদকে বিশ্বাস করবে না, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। সুতরাং এ আয়াতও কাফেরদের ব্যাপারে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার সংবাদ বহন করে। অতএব, এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর আলোচিত আয়াতসমূহের মাঝে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশিষ্ট নেই।

আল কুরআনের আয়াতে
পরিবর্তন সাধিত হয় কি?

١. مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا.

٢. وَإِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ. *

٣. لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ.

٤. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ.

অনুবাদ

১. আমি কোনো আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। (সূরা বাকারা : আয়াত ১০৬)

২. এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভালো জানেন; তখন তারা বলে, আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন। (সূরা নাহাল : আয়াত ১০২)

৩. আল্লাহর কথার কখনো পরিবর্তন হয় না। (সূরা ইউনুস : আয়াত ৬৪)

৪. আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই। (সূরা কাফ : আয়াত ২৯)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপর্যুক্ত ১ ও ২ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা কুরআনের কোনো কোনো আয়াত পরিবর্তন বা রহিত করে সে স্থলে তার সমকক্ষ বা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট আরেকটি আয়াত অবতরণ করেন।

পক্ষান্তরে ৩ ও ৪ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহর বাণীতে কোনো রূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না। সুতরাং আয়াতগুলোতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে আল্লাহর কালিমাত ও আকওয়াল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সে ফয়সালা, যা তাঁর ইলমে আযলে নির্ধারিত ও প্রস্তাবিত রয়েছে। তা অবশ্যই পুরা হবে। তাতে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হবে না। কেননা, সেগুলোর মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হওয়াও আল্লাহর ফয়সালার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মহান আল্লাহই ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, অমুক সময় পর্যন্ত অমুক বিধান প্রচলিত থাকবে। তারপর তা রহিত হয়ে যাবে। এ ফয়সালার মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হবে না। অর্থাৎ, এমন হবে না যে, পরিবর্তনের সময় এসেছে অথচ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। সুতরাং সময় মতো পরিবর্তন বা রহিত হওয়া শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ের হুবহু অনুকূল হয়ে গেছে; প্রতিদ্বন্দ্বী হয়নি।

সবচেয়ে বড় জালেম কে?

١۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. *

٢۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللهِ. *

٣۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ.

٤۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ.

٥۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

٦۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا.

٧۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ.

٨۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ.

٩۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ.

١٠۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا.

١١۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ.

١٢۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ.

অনুবাদ

১. যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয়, তার চাইতে বড় জালেম আর কে? (সূরা বাকারা : আয়াত ১১৪)

২. তার চাইতে বড় অত্যাচারী আর কে? যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্য গোপন করে। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৪০)

৩. আর যে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অথবা তাঁর নির্দেশনাবলিকে মিথ্যা বলে, তার চাইতে বড় জালেম আর কে? (সূরা আনয়াম : আয়াত ২১)

৪. ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম কে? যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে, আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা আনয়াম : আয়াত ৯৩)

৫. অতএব সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করে, যাতে করে মানুষকে বিনা প্রমাণে পথভ্রষ্ট করতে পারে। (সূরা আনয়াম : আয়াত ১৪৪)

৬. অতঃপর সে ব্যক্তির চাইতে বড় অত্যাচারী কে হবে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে এবং তা থেকে বিরত থাকে। (সূরা আনয়াম : আয়াত ১৫৭)

৭. অতঃপর ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে? যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অথবা তার নির্দেশনাবলিকে মিথ্যা বলে। (সূরা আরাফ : আয়াত ৩৭)

৮. অতঃপর তার চেয়ে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে, অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছে। নিশ্চয় পাপিষ্ঠ সম্প্রদায় কস্মিনকালেও সফলকাম হবে না। (সূরা ইউনুস : আয়াত ১৭)

৯. আর তাদের চেয়ে বড় জালেম কে হতে পারে, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। এসব লোককে তাদের পালনকর্তার সম্মুখীন করা হবে। (সূরা হূদ : আয়াত ৮)

১০. যাকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে জালেম আর কে? (সূরা সাজদা : আয়াত ২২)

১১. যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য আগমন করার পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে? (সূরা যুমার : আয়াত ৩২)

১২. যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তার চাইতে বড় জালেম আর কে? (সূরা আস-সাফ : আয়াত ৭)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের মধ্যে ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, সবচেয়ে বড় জালেম সে ব্যক্তি, যে লোকদেরকে আল্লাহর ঘরে জিকির করা থেকে বাধা প্রদান করে। ২ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, সবচেয়ে বড় অত্যাচারী সে ব্যক্তি, যে নিজের কাছে সাক্ষ্য গোপন রাখে।

পক্ষান্তরে বাকি সব আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সবচেয়ে বড় অত্যাচারী সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যারোপ করে এবং আল্লাহর নির্দেশনাবলিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তা থেকে বিমুখ হতে চায়। সুতরাং উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে বিভিন্ন শ্রেণির লোকদেরকে أَظْلَم তথা বড় জালেম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে অথচ أَظْلَم তথা বড় জালেম তো একজন

ব্যক্তি হবে। অতএব, উল্লিখিত আয়াতগুলো বড় জালেমের বর্ণনা দিতে গিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

ক. উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর মর্মার্থ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন ১ নং আয়াতের সারমর্ম হলো– لَا اَحَدٌ مِنَ الْمَانِعِيْنَ اَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ الخ

অর্থাৎ, সৎকর্মসমূহ থেকে বাধা প্রদানকারী লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জালেম সে ব্যক্তি, যে লোকদেরকে আল্লাহর ঘরে জিকির করা থেকে বাধা প্রদান করে।

২ নং আয়াতের সারমর্ম হলো–

لَا اَحَدٌ مِنَ الْكَاتِمِيْنَ اَظْلَمَ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, কোনো কিছু গোপনকারী লোকদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় জালেম হলো সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণিত সাক্ষ্য গোপন করে। এভাবে বাকি আয়াতগুলোর মর্মার্থ হবে এটাই যে–

لَا اَحَدٌ مِنَ الْمُفْتَرِيْنَ اَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا.

অর্থাৎ, মিথ্যা অপবাদদাতা লোকদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় জালেম সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ করতে চায় এবং

لَا اَحَدٌ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ اَظْلَمَ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَلَا اَحَدٌ مِنَ الْكَذَّابِيْنَ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى اللّٰهِ وَلَا اَحَدٌ مِنَ الْمُعْرِضِيْنَ اَظْلَمَ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيَاتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا.

অর্থ : মিথ্যা অভিহিতকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জালেম সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে এবং উপেক্ষাকারী ও পরিহারকারী লোকদের মধ্যে বড় জালেম সে ব্যক্তি, যে স্বীয় পালনকর্তার আয়াতসমূহকে উপেক্ষা করে ও এড়িয়ে চলে।

অতএব, এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের সারমর্মের মধ্যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয় না। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তি اَظْلَم হওয়ার প্রকার সম্পূর্ণ ভিন্ন।

২. উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের মধ্যে জিকির থেকে বাধা প্রদানকারী, সাক্ষ্য গোপনকারী, আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপকারী সমাজকে বড় জালেম বলা হয়েছে। এতে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়নি। কেননা, একাধিক সংখ্যক লোক اَظْلَمِيَّت তথা বড় জালেম হওয়ার ক্ষেত্রে সমান হতে পারে। যেমন বলা হয়– لَا اَحَدٌ اَفْقَهَ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَخَالِدٍ (যায়েদ, আমর ও খালেদের চেয়ে বড় ফকীহ কেউ নেই)। অর্থাৎ, এরা তিনজন সবচেয়ে বড় ফকীহ। পরিভাষায় এ কথার সারমর্ম হয় এটাই যে, এরা তিন ব্যক্তি বড় ফকীহ হওয়ার ক্ষেত্রে সমান সমান এবং বাকি সব লোক তাদের তুলনায় নিচু স্তরের। (তাফসীরে রুহুল মাআনী)

মাশরিক ও মাগরিব তথা
পূর্ব-পশ্চিমের সংখ্যা কত?

١. وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ.

٢. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.

٣. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا. *

٤. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ.

٥. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ. *

٦. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.

অনুবাদ

১. পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। অতএব, তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহ বিরাজমান। (সূরা বাকারা : আয়াত ১১৫)

২. তিনি পূর্ব ও পশ্চিম এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বোঝ। (সূরা শুআরা : আয়াত ২৮)

৩. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। অতএব, কর্মবিধায়করূপে তাঁকেই গ্রহণ করুন। (সূরা মুযযাম্মিল : আয়াত ৯)

৪. তিনি আসমানসমূহ, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, এবং পালনকর্তা উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের। (সূরা সাফফাত : আয়াত ৫)

৫. আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার। (সূরা মাআরিজ : আয়াত ৪০)

৬. তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। (সূরা আর-রহমান : আয়াত ১৭)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : প্রথমোক্ত তিন আয়াতে মাশরিক ও মাগরিবকে صِيْغَةُ الْمُفْرِدِ। অর্থাৎ, একবচনের শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মাশরিক ও মাগরিবের সংখ্যা একটি।

পক্ষান্তরে ৪ ও ৫ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, মাশরিক ও মাগরিব দুটি দুটি। কারণ, উক্ত আয়াতে শব্দদ্বয়কে দ্বিবচনের শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : প্রথমোক্ত তিন আয়াতে مَشْرِق ও مَغْرِب দ্বারা جِنْس مَغْرِب ও جِنْس مَشْرِق তথা পূর্ব ও পশ্চিম দিক উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে, যা কম ও বেশ সব সংখ্যা বোঝায়। অর্থাৎ, মাশরিক ও মাগরিবের সবকটি সংখ্যা বোঝাবে। আয়াত নং ৪ ও ৫-এর মধ্যে প্রত্যেক দিবসের মাশরিক ও মাগরিব বোঝানো হয়েছে। এজন্যে বহুবচনের রূপ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, প্রতিদিন দৈনিক মাশরিক ও মাগরিব তথা উদয়াচল ও অস্তাচল পরিবর্তিত হয়ে থাকে। বছরের দিনসমূহের সংখ্যা মোতাবেক তিনশত ষাটটি মাশরিক এবং তিনশত ষাটটি মাগরিব হয়।

অথবা আয়াতদ্বয়ে উল্লিখিত মাশরিক ও মাগরিব থেকে তারকারাজির উদয় ও অস্ত বোঝানো হয়েছে। এজন্যে বহুবচনের রূপ ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে আয়াত নং ৬-এর মধ্যে গ্রীষ্ম ও শীতকালীন মাশরিক ও মাগরিবের কথা বলা হয়েছে। এজন্যে সেখানে দ্বিবচনের রূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

অথবা চন্দ্র ও সূর্যের মাশরিক ও মাগরিবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্যে দ্বিবচনের রূপ ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং এখন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই।

নামাযে কিবলামুখী হওয়া জরুরি কি না?

١. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ. *

٢. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ.

অনুবাদ

১. অতএব তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহ বিরাজমান।
(সূরা বাকারা : আয়াত ১১৫)

২. তোমরা যেখানেই থাক, সে দিকে মুখ করো। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৪৪-১৫০)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও, সেদিকেই মহান আল্লাহর সত্তা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, মুসল্লির জন্যে নামাযরত অবস্থায় কিবলামুখী হওয়া অত্যাবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করা জরুরি। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব দেয়া হলো।

১. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ এ নির্দেশ সেসব লোকের জন্যে, যারা কিবলা নির্ণয়ে সংকটে লিপ্ত হয়। আর এ ধরনের লোক চিন্তাভাবনা করে যে কোনো একদিকে ফিরে নামায আদায় করলে তা বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে উক্ত দিকটি কিবলার দিকের পরিপন্থি হয়।

হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক যুদ্ধে লোকেরা কিবলার দিক নির্ণয় করতে অক্ষম হয়ে গেলেন। ফলে তারা দক্ষিণ ও উত্তর দিকে ফিরে নামায আদায় করলেন। অতঃপর যখন সকাল হলো তখন প্রকাশ পেল যে, কিবলা পরিপন্থি দিকে মুখ করে নামায আদায় করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতরণ করেন–

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ أَيْ إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْكُمُ الْقِبْلَةُ وَإِذَا لَمْ تَشْتَبِهِ الْقِبْلَةُ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. (রুহুল মাআনী)

২. উপর্যুক্ত ১ নং আয়াত ২ নং আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে কোনো দিকে মুখ করে নামায আদায় করা বৈধ ছিল। অতঃপর তা রহিত হয়ে যায় এবং নতুন বিধান প্রচলিত হয় যে, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, নামাযরত অবস্থায় বাইতুল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (আল-ইতকান)

সৃষ্ট জগতের সাথে
আল্লাহর সাদৃশ্য আছে কি না?

١. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ.

٢. ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ.

٣. تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

٤. وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

٥. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلٰى.

٦. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ.

٧. فَسُبْحَانَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ.

٨. يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ.

٩. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ.

١٠. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ.

١١. تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

١٢. أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ.

١٣. أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا.

١٤. وَقَدِمْنَا إِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا.

١٥. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.

١٦. ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ.

١٧. ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ.

١٨. الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى.

١٩. ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمٰنُ فَاسْأَلْ بِهٖ خَبِيْرًا. *

٢٠. لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ.

অনুবাদ

১. অতএব তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সেখানেই আল্লাহ্ বিরাজমান। (সূরা বাকারা : আয়াত ১১৫)

২. এটা তাদের জন্যে উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। (সূরা রূম : আয়াত ৩৮)

৩. তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা কর। তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। (সূরা রূম : আয়াত ৩৯)

৪. একমাত্র আপনার মহিমাময় মহানুভব পালনকর্তার সত্তা বাকি থাকবে। (সূরা আর-রহমান : আয়াত ২৭)

৫. একমাত্র তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত (প্রতিদানযোগ্য কোনো অনুগ্রহ থাকে না)। (সূরা নাহাল : আয়াত ২০)

৬. বরং তার উভয় হস্ত উন্মুক্ত। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৬৪)

৭. অতএব, তিনি পবিত্র, যাঁর হাতে সবকিছুর রাজত্ব। (সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৮৩)

৮. আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর রয়েছে। (সূরা ফাতহ : আয়াত ১০)

৯. আসমানসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে। (সূরা যুমার : আয়াত ৬৭)

১০. দয়া আল্লাহরই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। (সূরা হাদীদ : আয়াত ২৯)

১১. মহিমান্বিত সেই সত্তা! যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। (সূরা মুলক : আয়াত ১)

১২. কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন, অথবা আপনার পালনকর্তার কোনো নিদর্শন আসবে। (সূরা আনয়াম : আয়াত ১৫৮)

১৩. তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সঙ্কুচিত করে আনছি। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৪৪)

১৪. আর আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপ করে দেব। (সূরা ফুরকান : আয়াত ২৩)

১৫. এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন।
(সূরা ফজর : আয়াত ২২)

১৬. অতঃপর তিনি আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। (সূরা আরাফ : আয়াত ৪৪)

১৭. অতঃপর তিনি আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি কার্য পরিচালনা করেন। (সূরা ইউনুস : আয়াত ৩)

১৮. দয়াময় আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। (সূরা তোয়াহা : আয়াত ৫)

১৯. অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। তাঁর সম্পর্কে যে অবগত, তাকে জিজ্ঞাসা কর। (সূরা ফুরকান : আয়াত ৫৯)

২০. তাঁর অনুরূপ কোনো বস্তু নেই। (সূরা শূরা : আয়াত ১১)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের মধ্যে ১ থেকে ৫ নং পর্যন্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালার মুখমণ্ডল হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়।
৬ থেকে ১১ পর্যন্ত আয়াতে আল্লাহর হস্ত হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়।
১২ থেকে ১৫ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহর আগমন ঘটার আলোচনা পাওয়া যায়। ১৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত আয়াতসমূহে إِسْتِوَاء عَلَى الْعَرْش অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর উপবেশন করার কথা পাওয়া যায়।
সুতরাং উল্লিখিত আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, সৃষ্টিজগতের মতো আল্লাহ তায়ালারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে। আর মাখলুকের মতো তিনিও আসা-যাওয়া ও উপবেশন করেন। অথচ শেষোক্ত ২০ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালাকে কোনো বস্তুর সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা যায় না। কেননা, তাঁর সমকক্ষ কোনো জিনিসই বিদ্যমান নেই এবং বিদ্যমান হবেও না। এজন্যে তিনি দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সৃষ্টবস্তুর সদৃশ হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পূতপবিত্র। অতএব, এ শেষোক্ত আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : প্রথমে এ কথা বুঝতে হবে যে, যেসব আয়াতে আল্লাহ তায়ালাকে কোনো বস্তুর সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা হয়েছে, সেসব আয়াতকে 'আয়াতে মুতাশাবিহাত' বলা হয়। এসব আয়াতের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে দুটি মাসলাক (মত) রয়েছে।

১. مَسْلَك تَفْوِيْض, ২. مَسْلَك تَاوِيْل

'মাসলাকে তাফভীজ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই যে, এসব আয়াতের সারমর্ম আল্লাহ তায়ালার ইলমের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, এটা বলা হবে যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এসব আয়াতের তাৎপর্য ও উদ্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে

অবগত আছেন। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে সেগুলোর কোনো তাবীল ও তাফসীর করতে সক্ষম নই। কেননা, আমাদের মেধা ও বুদ্ধিমত্তা অসম্পূর্ণ ও সীমিত। সুতরাং যদি আমরা স্ব স্ব বুদ্ধিমত্তা ও রায় মোতাবেক সেসব আয়াতের কোনো তাফসীর বা তাবীল করি, তাহলে হতে পারে সেটি আল্লাহর উদ্দিষ্ট বস্তুর পরিপন্থি হয়ে যাবে। এজন্যে আয়াতগুলোর তাফসীর ও ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকা সমীচীন হবে। এ মাসলাক অবলম্বন করেছেন হযরত ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম শাফেয়ী, মুহাম্মদ ইবনে হাসান, সাঈদ ইবনে মুয়ায মারওয়াযী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, আবু মুয়ায খালেদ ইবনে সোলায়মান, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, আবু ঈসা তিরমিযী, আবু দাউদ সিজিস্তানী ও কাজী আবুল আলাসহ আরো অনেকে।

সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ কিতাবুল ইতেকাদে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন–

لَا يَنْبَغِى لِاَحَدٍ اَنْ يَنْطِقَ فِى اللّٰهِ تَعَالٰى بِشَيْءٍ مِنْ ذَاتِهٖ وَلٰكِنْ يَصِيْغُهُ بِمَا وَصَفَ سُبْحَانَهُ بِهٖ نَفْسَهُ وَلَا يَقُوْلُ فِيْهِ بِرَأْيِهٖ شَيْئًا وَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ .

অর্থ : আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে কিছু বলা কোনো ব্যক্তির জন্যে উচিত হবে না। এভাবে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, রাসূল (স) তাঁর পরবর্তী যে তিনটি প্রজন্মকে خَيْرُ الْقُرُوْنِ বলেছেন, সে তিন প্রজন্মের সকল আলেম প্রথম মাসলাকের ব্যাপারে একমত। শেখ আবুল মাআলী আব্দুল মালিক ইবনে আব্দুল্লাহ রিসালায়ে নিজামিয়ায় এ মাসলাকের কথাই উল্লেখ করেছেন। বিশেষজ্ঞ সুফীগণও এ মতকে পছন্দ করেছেন।

দ্বিতীয় মাসলাক হলো মাসলাকে তাবীল। আর তাবীল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আয়াতে মোতাশাবিহাতের (রূপকার্থবিশিষ্ট আয়াতসমূহের) এমন সারমর্ম ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বর্ণনা করা, যা আল্লাহ তায়ালার শান ও বড়ত্বের অনুকূলে হয়ে যায়। যার দ্বারা আল্লাহকে সৃষ্টিজগতের সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা বা তুলনা দেয়া অত্যাবশ্যক হয় না। এ মাসলাক পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন। ইমামুল হারামাইন শেখ আবুল মাআলী আব্দুল মালিক ইবনে আবদিল্লাহ স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল ইরশাদ'-এ মাসলাকে তাবীলকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সেদিকে ধাবিত হয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা পরবর্তীকালের আলেমগণের হৃদয়ে রূপকার্থবিশিষ্ট আয়াত বা শব্দাবলির

এমন তাৎপর্যপূর্ণ অর্থের বিকাশ ঘটালেন, যা মহান আল্লাহর বড়ত্বের হুবহু উপযোগী হয়ে যায় এবং সৃষ্টিজগতের সাথে সাদৃশ্য থেকে তিনি মুক্ত হয়ে যান। অতএব, উপরোল্লিখিত রূপকার্থসম্পন্ন আয়াতসমূহের মধ্যে এ পদ্ধতিতে তাবীল বা ব্যাখ্যা করা যায় যে, প্রথমোক্ত ৫ আয়াতে আল্লাহর চেহারা থেকে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সত্তা। অনুরূপভাবে চেহারা বলে সত্তা উদ্দেশ্য নেয়ার বহু দৃষ্টান্ত পরিভাষায় রয়েছে। যেমন– কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ওপর রাগান্বিত হয়ে বলল যে, আজ থেকে তুমি আমাকে তোমার চেহারা দেখাবে না। এ কথার সারমর্ম এ নয় যে, চেহারা ব্যতীত শরীরের বাকি অংশ দেখাতে পারবে; বরং উক্ত কথা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তুমি আমার থেকে দূরে চলে যাও, অদৃশ্য হয়ে যাও, আমার ধারে–কাছেও আসবে না। সুতরাং এ আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে وَجْه (চেহারা) শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর ذَات (সত্তা)

এভাবে উপর্যুক্ত ৬ থেকে ১১ পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহর হাত হওয়ার কথা আলোচিত হয়। এখানে يَد ও يَمِيْن শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য সাহায্য ও সামর্থ্য। সুতরাং يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ-এর সারমর্ম হলো– قُوَّةُ اللّٰهِ وَنُصْرَتِهٖ এবং مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ-এর মধ্যে يَمِيْن শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য فَوْقَ قُوَّتِهِمْ وَنُصْرَتِهِمْ قُدْرَة (শক্তি)। অর্থাৎ, আকাশ আল্লাহর কুদরতে গুটিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَان-এর মধ্যে بَسْط يَدَيْن দ্বারা উদ্দেশ্য হলো سَخَاوت (উদারতা বা দানশীলতা)। যেমন দানশীল লোক সম্পর্কে বলা হয় যে, তার উভয় হাত উন্মুক্ত। অর্থাৎ, সে দানশীল। অথবা يَد দ্বারা উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর নেয়ামত। তখন يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَان দ্বারা উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর উভয় নেয়ামত। অর্থাৎ, ইহকালীন ও পরকালীন নেয়ামতসমূহ বিস্তৃত ও ব্যাপক। অথবা এটা উদ্দেশ্য হবে যে, আল্লাহর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ বিশাল ও প্রাচুর্যবহ।

এভাবে আয়াত নং ১২ ও ১৫-এর মধ্যে جَاءَ رَبُّكَ ও يَأْتِيْ رَبُّكَ শব্দদ্বয়ের رَبّك শব্দের পূর্বে اَمْر শব্দটি مُضَاف হিসেবে উহ্য আছে। সুতরাং এখানে আগমন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর নির্দেশের আগমন। অনুরূপভাবে ১৩ নং আয়াতেও اَلْاَرْض শব্দের প্রারম্ভে اَمْر শব্দটি مُضَاف হিসেবে উহ্য আছে এবং ১৪ নং আয়াতে قَدِمْنَا শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য قَصَدْنَا অর্থাৎ,

قَصَدْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ-এর তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত আছে। এভাবে ১৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে اِسْتِوَاء শব্দের মর্মার্থ হলো اِسْتِيْلَاء ও غَلَبَه (নিয়ন্ত্রণ করা ও কর্তৃত্ব চালানো।) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালা আরশের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব চালিয়ে থাকেন। কেউ তাঁকে পরাজিত করার কোনো ক্ষমতা রাখে না। তিনি সবসময় বিজয়ী থাকেন। অথবা اِسْتِوَاء শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য مِلْكِيَّة তথা মালিকানা। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালা হলেন আরশের মালিক। এটাকে اِسْتِوَاء ও جُلُوْس শব্দ দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন আল্লামা যামাখশরীও এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে যদি কেউ বলেন- فُلَانٌ اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْش (অমুক ব্যক্তি রাজসিংহাসনে বসেছেন), তখন এ বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হবে, অমুক ব্যক্তি রাজসিংহাসনের মালিক হয়েছেন। এর দ্বারা কেউ একথা উদ্দেশ্য নেয় না যে, অমুক ব্যক্তি রাজসিংহাসনে বসে আছেন। কারণ, এ কথা সে সময়ও বলা যায় যখন রাজা রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন না; বরং অন্যত্র ভ্রমণে চলে যান। সুতরাং এবার বোঝে আসল যে, جُلُوْس ও اِسْتِوَاء দ্বারা উপবেশন উদ্দেশ্য নয়; বরং মালিক হওয়াই উদ্দেশ্য। অথবা اِسْتَوٰى শব্দের অর্থ عَلَا গ্রহণ করা যাবে। অর্থাৎ, عَلَا عَلَى الْعَرْش তখনও উক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা আরশের উপর উপবেশন করা সাব্যস্ত হবে না।

অতএব, উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের পর আল্লাহ্ তায়ালার দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তিনি সৃষ্টিজগতের সদৃশ হওয়া রহিত হয়ে যায়। ফলে পূর্বোক্ত উনিশটি আয়াত ২০ নং আয়াতের সাথে কোনো রূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয় না। (তাফসীরে রুহুল মাআনী)

কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি

মুমিন না কাফের?

١. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى.

٢. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا.

٣. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا. *

٤. وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ.

٥. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

٦. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا.

অনুবাদ

১. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৭৮)

২. যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাতে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। (সূরা হুজুরাত : আয়াত ৯)

৩. হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা করো, আন্তরিক তওবা। (সূরা তাহরীম : আয়াত ৮)

৪. ঐসব লোক যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৪)

৫. এরপরও যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই ফাসেক। (সূরা নূর : আয়াত ৫৫)

৬. ঈমানদার ব্যক্তি কি ফাসিকের অনুরূপ? (সূরা সাজদা : আয়াত ১৮)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : প্রথমোক্ত ৩ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত মানুষ মুমিনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, উক্ত আয়াতগুলোতে কবীরা গুনাহগারকে আল্লাহ তায়ালা মুমিন বলে সম্বোধন করেছেন।

পক্ষান্তরে শেষোক্ত ৩ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, তারা মুমিন নয়; বরং কাফেরদের দলভুক্ত।

কেননা, ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালার অবতীর্ণ বিধি মোতাবেক বিচারকার্য সম্পাদন করবে না, তারা কাফের।

এভাবে ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যারা কুফরি করবে, তারা ফাসিক। ৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, মুমিন ব্যক্তি ফাসিক ব্যক্তির মতো হতে পারে কি? তার জবাবে বলা যাবে, কখনো হতে পারে না। এভাবে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে ফাসিক শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফের। সুতরাং পূর্বোক্ত তিন আয়াত ও শেষোক্ত তিন আয়াতের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর মাঝে সৃষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনকল্পে এ জবাব প্রদান করা হয় যে, বাস্তবিকভাবে কবীরা গুনাহের অধিকারী লোকেরা মুমিনগণের অন্তর্ভুক্ত। যা প্রথমোক্ত ৩ আয়াত দ্বারা অনুমান করা যায়।

তবে শেষোক্ত ৩ আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, কবীরা গুনাহগার কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত– সেগুলোকে তাবীল বা ব্যাখ্যা করা যাবে। যাতে পূর্বোক্ত ৩ আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায় এবং পরস্পর বিরোধ মিটে যায়।

সুতরাং আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে ৪ নং আয়াত অর্থাৎ– وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ-এর মধ্যে নিম্নোক্ত তাবীল বা ব্যাখ্যা করা যাবে যে– وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِهَانَةِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করে আল্লাহর বিধি মোতাবেক বিচারকার্য সম্পাদন করবে না, সে কাফের হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে এ কথাও দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিধানাবলিকে তাচ্ছিল্যের সাথে দেখা, এটাও অন্যতম কুফরি। সুতরাং এ ব্যক্তি কুফরিতে লিপ্ত হওয়ার দরুনই কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে নয়। (নিবরাস, তাফসীরে আবুস সঊদ)

অথবা এ ব্যাখ্যা প্রদান করা যাবে যে, উক্ত আয়াত বিশেষভাবে ইহুদিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যে, ইহুদিরা আল্লাহ তায়ালার নাজিলকৃত বিধানসমূহে বিকৃতি সাধান করেছে এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত কিতাবের বিধি মোতাবেক বিচারকার্য সম্পাদন করেনি। এজন্যে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ

তায়ালা ইরশাদ করলেন যে, তারা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে এ তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (র) থেকেও বর্ণিত আছে। (তাফসীরে খাযেন, রুহুল মাআনী) এভাবে ৫ নং আয়াতে এ ব্যাখ্যা করা যাবে যে, উক্ত আয়াতে فِسْق দ্বারা উদ্দেশ্য হলো فِسق كَامِل আর 'ফিসকে কামিল' (পূর্ণাঙ্গরূপে শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম করা) কুফরকেই বলা হয়। সুতরাং এখন উক্ত আয়াতের সারমর্ম হবে, মুমিনগণের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের অঙ্গীকার করার পর মুরতাদ হয়ে যাবে, সে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জনকারী হয়ে যাবে। যাকে كَامِل فِى الْفِسْق বলা হয়। আর كَامِل فِى الْفِسْق ও مُرْتَد-কে কাফের বলে গণ্য করা হয়। এ ব্যাপারে কারো কোনো মতানৈক্য নেই। (তাফসীরে রুহুল মাআনী)

এবং ৬ নং আয়াতের মধ্যে এ তাবীল ও ব্যাখ্যা করা যাবে যে, উক্ত আয়াতে ফাসিক শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি নয়; বরং তা দ্বারা কাফেরই উদ্দেশ্য। সুতরাং এখন উক্ত আয়াতের সারমর্ম হবে- اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ كَافِرًا অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুমিন সে কি কাফেরের মতো হতে পারে? এ আয়াতে ফাসিক শব্দ দ্বারা কাফের উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে নিম্নোল্লিখিত ঘটনাও ইঙ্গিত বহন করে। একদা হযরত আলী (রা) ও ওয়ালীদ ইবনে উকবার মাঝে তর্কবিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এক পর্যায়ে ওয়ালীদ হযরত আলী (রা)-কে বলল- اُسْكُتْ فَاِنَّكَ صَبِيٌّ وَأَنَا شَيْخٌ (তুমি চুপ হয়ে যাও। কারণ, তুমি ছেলে মানুষ। আর আমি বৃদ্ধ লোক)। উত্তরে হযরত আলী (রা) বললেন- اُسْكُتْ فَاِنَّكَ فَاسِقٌ (তুমি চুপ হও। কারণ, তুমি ফাসিক)। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ কথা অবহিত করা যে, মুমিন লোক কাফের লোকের মতো হতে পারে না। সুতরাং এ আয়াত দ্বারাও কবীরা গুনাহগার কাফের হওয়া সাব্যস্ত হয় না। ফলে আয়াতগুলোর মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সৃষ্টি হয় না। (তাফসীরে খাযেন, মাদারিক ও নিবরাস)

রমযানের রাতে ঘুমানোর পর
খানাপিনা ও স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ কি না?

١. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ. *

٢. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ اِلَى قَوْلِهِ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.

অনুবাদ

১. তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৩)

২. রোযার রাতের বেলায় তোমাদের জন্যে স্ত্রীসহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ আর তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।
আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণার স্বীকার হচ্ছিলে। তাই তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস করো এবং যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্যে দান করেছেন, তা আহরণ করো। আর পানাহার করো কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্ররেখা পৃথক হওয়া পর্যন্ত। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৭)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপর্যুক্ত ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, যে পদ্ধতিতে পূর্বেকার উম্মতগণের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে, সে পদ্ধতি ও অবস্থার ওপর প্রিয় নবীজী (স)-এর উম্মতগণের ওপরও রোযা ফরয করা হয়েছে। অবশ্য পূর্ববর্তী উম্মতগণের রোযার পদ্ধতি এটা ছিল যে, তারা রাত্রে শোয়ার পূর্বে খানাপিনা ও স্ত্রীসহবাসের মধ্যে লিপ্ত হতে পারত, কিন্তু শোয়ার পর উক্ত

কর্মসমূহে লিপ্ত হওয়া তাদের জন্যে সম্পূর্ণরূপে হারাম ছিল। যার দরুন যদি কোনো ব্যক্তি ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে রাত্রি অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হতো, তখন তার জন্যে খানাপিনা ও স্ত্রীসহবাস করা বৈধ বলে গণ্য হতো না। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে كَمَا كُتِبَ শব্দ দ্বারা বোঝা যায় যে, এ পদ্ধতি উম্মতে মুহাম্মদিয়ার রোযার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যে, মাহে রমযানের রাতে তাদের জন্যেও নিদ্রাচ্ছন্ন হওয়ার পর খানাপিনা ও স্ত্রীসম্ভোগ সম্পূর্ণরূপে হারাম। অথচ ২ নং আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাহে রমযানের রাতে ফজর উদয় হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত খানাপিনা ও স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ। এ সময়ের মধ্যে রোযাদার নিদ্রাচ্ছন্ন হোক বা না হোক। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১ নং আয়াতের হুকুম ২ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, ইসলামের সূচনাকালে প্রথমোক্ত আয়াতের হুকুম বহাল ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে–

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ الخ .

আয়াতটি নাজিল হয় এবং ফজর উদয় হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত খানাপিনা ও স্ত্রীসম্ভোগের অনুমতি পাওয়া যায়। (আর-রাওজুন নাজীর)

রমযানের রোযা রাখা জরুরি
না ফিদিয়াও দেয়া যায়?

١. وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ. *

٢. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ.

অনুবাদ

১. আর যারা সক্ষম হবে না, তারা মিসকিনকে খাদ্য দান করবে। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৪)

২. অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে যে রমযান মাসে উপস্থিত হয়, সে যেন রোযা পালন করে। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৫)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, যারা রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে অথচ রোযা রাখতে চায় না, তাদের জন্যে অনুমতি আছে যে, তারা এক রোযার পরিবর্তে একজন মিসকিন বা দরিদ্র লোককে খানা খাইয়ে ফিদিয়া আদায় করবে।

পক্ষান্তরে ২ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, মাহে রমযানে একমাত্র রোযা পালন করাই ফরয। রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় করলে চলবে না এবং বান্দাকে ফিদিয়া প্রদানের স্বাধীনতাও দেয়া হয়নি। অতএব, আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১ নং আয়াত ২ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। যেহেতু ইসলামের শুরুলগ্নে লোকজন রোযা পালনে অভ্যস্ত ছিলেন না এবং রোযা রাখতে কষ্ট অনুভব করতে লাগলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা সহজকরণার্থে ইরশাদ করলেন যে, রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া প্রদান করলে চলবে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে রোযা রাখবে, আর যার ইচ্ছা সে ফিদিয়া দেবে। অতঃপর যখন লোকসমাজ ক্রমান্বয়ে রোযা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন, তখন ১ নং আয়াতের হুকুম রহিত করে শেষোক্ত আয়াতের নির্দেশ অত্যাবশ্যক করে দিলেন এবং ফিদিয়া দেয়ার অধিকার বিলুপ্ত করে দিলেন। যেমন একটি হাদীসের মাধ্যমে উপর্যুক্ত কথার দৃঢ়তা বোঝা যায়।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ (رضـ) قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ كَانَ مَنْ شَاءَ مِنَّا صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَيَفْتَدِىْ فَعَلَ ذٰلِكَ حَتّٰى نَزَلَ الْآيَةُ الَّتِىْ بَعْدَهَا فَنَسَخَهَا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ. (رواه الطبرانى وغيرهم، روح المعانى ٥٨/٢)

অর্থ : হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন এ আয়াত– وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ অবতীর্ণ হলো, তখন আমাদের মধ্য থেকে যার ইচ্ছা সে রোযা রাখত এবং যার ইচ্ছা সে রোযা ভঙ্গ করে ফিদিয়া দিয়ে দিত। আমরা ফিদিয়া দেয়ার কাজে লিপ্ত রয়েছি এমতাবস্থায় তার পরবর্তী আয়াত– فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ অবতরণ হয়, যা প্রথমোক্ত আয়াতকে রহিত করে দেয়। সুতরাং রহিতকরণের পর আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। (তাফসীরে রুহুল মাআনী : ২/৫৮)

২. وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ-এর মধ্যে لَا (নাবোধক) অব্যয়টি উহ্য আছে অর্থাৎ, وَعَلَى الَّذِيْنَ لَا يُطِيْقُوْنَهُ হযরত হাফসা (রা)-এর কেরাতের মধ্যে يُطِيْقُوْنَه শব্দটি لَا অব্যয়সহ ব্যবহার হয়েছে। যেমন তাফসীরে রুহুল মায়ানীর মধ্যে উল্লেখ আছে যে, এ আয়াত অতি বৃদ্ধ লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যে বয়োবৃদ্ধ লোক বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে সমর্থ নয়, সে রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া প্রদান করবে। আর ২ নং আয়াত যুবক ও সামর্থ্যবান বৃদ্ধ মানুষের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং উভয় আয়াতের মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। (তাফসীরে রুহুল মাআনী)

৩. يُطِيْقُوْنَه শব্দটি إِطَاقَة (ক্রিয়ামূল) مَصْدَر এর-بَاب إِفْعَال শব্দ থেকে নির্গত। بَاب إِفْعَال-এর-هَمْزَه-টি কোনো কোনো সময় سَلْب مَأْخَذ অর্থাৎ, ধাতুগত অর্থকে বিদূরিত করার জন্যে ব্যবহার হয়। যেমন– أَفْلَسَ الرَّجُلُ অর্থাৎ, লোকটি পয়সাহীন হয়ে গেল (দরিদ্র হয়ে গেল)। এখানে বাক্যটির মধ্যে أَفْلَسَ ক্রিয়াপদের মূলধাতু হলো فَلس যার অর্থ হলো পয়সা এবং যার শুরুতে بَاب افْعَال-এর هَمْزَه যুক্ত হওয়ার কারণে তার মধ্যে سَلْب مَأْخَذ-এর বৈশিষ্ট্য এসে গেল। এজন্যে إِفْلَاس শব্দের অর্থ হলো– পয়সাহীন হওয়া, দরিদ্র হওয়া।

সুতরাং এ বিশ্লেষণ অনুসারে وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ-এর অর্থ হলো, যারা রোযা রাখতে সামর্থ্যবান নয়, তারা রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া প্রদান করতে পারবে। এখানেও إِطَاقَة শব্দটি سَلْبُ الْمَأْخَذ-এর বৈশিষ্ট্য কবুল করেছে। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই।

কুরআন লাইলাতুল কদরে নাজিল হয়েছে
নাকি লাইলাতুল বারাআতে?

١. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ. *

٢. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ. *

٣. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

অনুবাদ

১. রমযান মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৫)

২. আমি একে নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। (সূরা দুখান : আয়াত ৩)

৩. নিশ্চয় আমি তা নাজিল করেছি কদরের রাত্রিতে। (সূরা কদর : আয়াত ১)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহাগ্রন্থ আল কুরআন মাহে রমযানে অবতীর্ণ হয়েছে। ২ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, শাবান মাসের পনেরোতম রাত্রি লাইলাতুল বারাআতে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, হযরত ইকরিমা (রা) উক্ত আয়াতে 'লাইলাতুন মুবারাকাহ' শব্দের তাফসীর করেছেন– لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ শব্দের মাধ্যমে। অর্থাৎ, শাবান মাসের পনেরোতম রাত, যাকে লাইলাতুল বারাআত বলা হয়। ৩ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল কুরআন লাইলাতুল কদরে নাজিল হয়েছে। সুতরাং আয়াতগুলোতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ শব্দ থেকে لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ উদ্দেশ্য নয়; বরং লাইলাতুল কদরই উদ্দেশ্য, যা অধিকাংশ তাফসীরবিদের রায়। যেমন তাফসীরে রুহুল মায়ানীর মধ্যে উল্লেখ হয়েছে–

هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عَلٰى مَارُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ وَابْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَابْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِيْنَ .

তাফসীরে মাদারিকে এসেছে–

فِىْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اَىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اَوْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَقِيْلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اَرْبَعُوْنَ لَيْلَةً وَالْجُمْهُوْرُ عَلَى الْاَوَّلِ.

তাফসীরে মাদারিকে এসেছে–

اِخْتَلَفُوْا فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ فَقَالَ الْاَكْثَرُوْنَ اِنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.

এভাবে বয়ানুল কুরআন ও মাআরেফুল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, অধিকাংশ তাফসীরবিদ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, উক্ত রাত হলো লাইলাতুল কদর।

لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ-এর তাফসীর বা উদ্দেশ্য লাইলাতুল কদর হওয়া প্রসঙ্গে নিম্নে কয়েকটি দলীল পেশ করা হলো।

১. সূরা দুখানের আয়াতে কুরআন শরীফ নাজিলের রাতকে বরকতময় রজনী বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে, অথচ বর্ণনা দেয়া হয়নি যে, এটি কি কদরের রজনী হবে না বারাআতের রজনী হবে? তবে সূরা দুখানের আয়াতের ব্যাখ্যা বা তাফসীরস্বরূপ সূরা কদরের আয়াত– اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ। নাজিল হয়েছে। কেননা, তাফসীরশাস্ত্রের নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত আছে যে– اَلْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا (কুরআনের একাংশ অপরাংশের তাফসীরকারক)। সুতরাং এ নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা গেল যে, সূরা দুখানের আয়াতের তাফসীরকারক হিসেবে সূরা কদরের আয়াত নাজিল হয়েছে।

২. সূরা দুখানে বলা হয়েছে যে, আল কুরআন لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ তথা বরকতময় রজনীতে নাজিল হয়েছে। আর সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাহে রমযানে কুরআন শরীফ নাজিল হয়েছে। তাহলে বোঝা যায়, বরকতময় রজনী মাহে রমযানে সংঘটিত হয়। যাকে কুরআন ও হাদীসের ভাষায় লাইলাতুল কদর হিসেবে চেনা যায় এবং উক্ত রজনী লাইলাতুল বারাআত হতে পারে না। কেননা, সেটিতো শাবান মাসে সংঘটিত হয়। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত রাত হলো লাইলাতুল কদর।

৩. মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে হযরত কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন–

نَزَلَتْ صُحُفُ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ اَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَالتَّوْرَاةُ لِسِتٍّ لَيَالٍ مِنْهُ وَالزَّبُوْرُ لِاثْنَتَىْ عَشَرَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْهُ وَالْاِنْجِيْلُ لِثَمَانِىْ عَشَرَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْهُ وَالْقُرْآنُ لِاَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَاللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ هِىَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ . (التفسير الكبير)

অর্থ : হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাসমূহ মাহে রমযানের প্রথম রাত্রে নাজিল হয়। তাওরাত মাহে রমযানের ষষ্ঠ রাত্রে, যবুর বারোতম রাত্রে, ইঞ্জিল আঠারোতম রাত্রে ও মহাগ্রন্থ আল কুরআন চব্বিশতম রাত্রে অবতীর্ণ হয়। আর বরকতময় রজনী হলো লাইলাতুল কদর। (তাফসীরে কাবীর)

অবশ্য তাফসীরে কুরতুবীতে এ রেওয়ায়াত হযরত ওয়াসেলা থেকে বর্ণিত আছে। অতএব, উপরোল্লিখিত তিনটি দলীল দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল যে, বরকমতয় রজনী দ্বারা উদ্দেশ্য কদরের রাত্রি; বারাআতের রাত্রি নয়। তবে হযরত ইকরিমার উক্তি অর্থাৎ বরকতময় রজনী দ্বারা বারাআতের রাত্রি উদ্দেশ্য– এটাকে ওলামায়ে কেরাম অগ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। যেমন হযরত ইমাম রাযী (র) তাফসীরে কাবীরে বলেন–

وَاَمَّا الْقَائِلُوْنَ بِاَنَّ الْمُرَادَ مِنَ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِىْ هٰذِهِ الْآيَةِ هِىَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَمَا رَأَيْتُ لَهُمْ فِيْهِ دَلِيْلاً يُعَوَّلُ عَلَيْهِ.

অর্থ : যারা এ কথা বলেন যে, সূরা দুখানে উল্লিখিত আয়াতে বরকতময় রজনী দ্বারা উদ্দেশ্য শাবান মাসের পনেরোতম রাত্রি, আমি এ কথার পক্ষে তাঁদের কোনো গ্রহণযোগ্য ও যথাযথ দলীল দেখতে পাইনি।

এভাবে তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ আছে–

وَمَا قِيْلَ اِنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ

অর্থ : বরকতময় রজনী শাবানের পনেরো তারিখ হওয়া প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, তার কোনো ভিত্তি নেই।

অতএব, উপর্যুক্ত বর্ণনার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, বরকতময় রজনী দ্বারা উদ্দেশ্য কদরের রাত্রি। ফলে আলোচিত আয়াতসমূহের মধ্য থেকে ২ ও ৩ নং আয়াতের মাঝে সৃষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসন হয়ে গেছে।

তবে এখন বাকি রইল ১ নং আয়াত অর্থাৎ, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ الخ
অবশ্য এ আয়াতও শেষোক্ত ২ ও ৩ নং আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। কেননা, বিশুদ্ধ মারফূ রেওয়ায়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, লাইলাতুল কদর মাহে রমযানেই সংঘটিত হয়।

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِىْ الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ . (رواد البخارى ومسلم واحمد والترمذى، روح المعانى)

অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেন, কদর রাত্রি তোমরা মাহে রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতে তালাশ করো। (তাফসীরে রুহুল মাআনী)

এছাড়াও আরো বহু বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লাইলাতুল কদর মাহে রমযানেই সংঘটিত হয়। তবে শুধু হযরত ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে যে, লাইলাতুল কদর শাবান মাসের পনেরোতম রাত্রে সংঘটিত হয়। এ সম্পর্কে তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে উল্লেখ আছে– وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ غَرِيْبٌ অর্থাৎ, এটি ব্যতিক্রমী ও দুর্বোধ্য কথা।

অতএব, এ কথা প্রমাণ হয়ে গেল যে, লাইলাতুল কদর মাহে রমযানেই সংঘটিত হয়। সুতরাং আলোচিত ১ নং আয়াত ২ ও ৩ নং আয়াতদ্বয়ের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়নি; বরং আয়াতগুলোর মাঝে পরস্পর সামঞ্জস্য বিধান হয়ে গেল।

কাফেরদের সাথে মুসলমানদের
যুদ্ধ শুরু করা বৈধ না অবৈধ?

١. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. *

٢. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ.

٣. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.

٤. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا.

٥. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوهُمْ.

٦. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً.

অনুবাদ

১. আর লড়াই করো আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। আর সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৯০)

২. আর তাদের যেখানে পাও, সেখানেই হত্যা করো। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৯১)

৩. তাদের যেখানে পাও হত্যা করো। তাদের কাউকে বন্ধুরূপে বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করিও না। (সূরা নিসা : আয়াত ৮৯)

৪. তোমরা তাদের পাকড়াও করো এবং যেখানে পাও হত্যা করো। আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের প্রকাশ্য যুক্তি-প্রমাণ দান করেছি। (সূরা নিসা : আয়াত ৯১)

৫. অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হবে, তখন তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও, সেখানেই হত্যা করো। (সূরা তাওবা : আয়াত ৫)

৬. আর মুশরিকদের সাথে তোমরা সমবেতভাবে যুদ্ধ করো। (সূরা তাওবা : আয়াত ৩৬)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : আলোচিত ১ নং আয়াতে নির্দেশ প্রদান করা হলো যে, আল্লাহর রাহে ওদের সাথে জিহাদে লিপ্ত হও, যারা তোমাদের সাথে লিপ্ত হয় এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। অর্থাৎ, যুদ্ধকার্য প্রথমে তোমরা আরম্ভ করো না। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, মুশরিকরা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের সাথে মুসলমানগণ প্রথমে জিহাদের সূচনা করা বৈধ হবে না। হ্যাঁ, যদি তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে আক্রমণ চালাতে থাকে, তাহলে তাদের আক্রমণের জবাব হিসেবে মুসলমানদের জন্যে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বৈধ হবে।

পক্ষান্তরে শেষোক্ত পাঁচটি আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, মুসলমানরা কাফেরদের সাথে প্রথমেই যুদ্ধাভিযানে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। চাই তারা যুদ্ধের সূচনা করুক বা না করুক। কেননা, উক্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো। সুতরাং ১ নং আয়াত বাকি আয়াতসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : প্রথমোক্ত আয়াত শেষোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। অর্থাৎ, ইসলামের সূচনাকালে اِبْتِدَاء بِالْقِتَال তথা মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা করা নিষিদ্ধ ছিল। কারণ, তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। এজন্যে নম্রতা অবলম্বন করার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর যখন ইসলামের বিজয় সাধিত হলো, মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেল, রিসালাত ও নবুওয়তের মুজিযা বার বার প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও মুশরিকরা শিরকের ওপর অটল থাকল এবং তাদের ব্যাপারে ইসলাম গ্রহণের আশা বিফল হতে লাগল, তখন আল্লাহ তায়ালা বিনা শর্তে নির্দেশ দিয়ে দিলেন–

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَقَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً.

অর্থ : তোমরা যেখানে পাও মুশরিকদের হত্যা করো এবং তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। অনুরূপভাবে হযরত রবী ইবনে আনাস বলেন যে–

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ.

এ আয়াত জিহাদের ব্যাপারে প্রথম অবতীর্ণ আয়াত, যার মধ্যে মুসলমানদের প্রথমে যুদ্ধের সূচনা করা থেকে বারণ করা হলো। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ও فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً বলে সমস্ত কাফেরের সাথে বিনা শর্তে জিহাদে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। চাই তারা প্রথমে যুদ্ধের সূচনা করুক বা নাই করুক। সুতরাং তোমরা এখন প্রথমেই যুদ্ধের সূচনা করার অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে গেছ। অতএব, আয়াতগুলোর মাঝে এখন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি নেই। (তাফসীরে জালালাইন, মাযহারী)

নিষিদ্ধ বা সম্মানিত মাসে
যুদ্ধবিগ্রহ বৈধ না অবৈধ?

١. يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ.

٢. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ. *

٣. وَقَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً.

অনুবাদ

১. সম্মানিত মাসে যুদ্ধ সম্পর্কে তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে। আপনি বলুন, এতে যুদ্ধ করা বড় অন্যায়। (সূরা বাকারা : আয়াত ২১৭)

২. হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলি এবং সম্মানিত মাসসমূহকে হালাল মনে করো না। (সূরা মায়েদা : আয়াত ২)

৩. তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করো, যেমনিভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে। (সূরা তাওবা : আয়াত ৩৬)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথমোক্ত দুটি আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ মাসে (শাওয়াল, যিলকদ, যিলহজ্জ ও রজব মাস) যুদ্ধবিগ্রহের নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়। কেননা, ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ (নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা মহাপাপ) এবং ২ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহর নিদর্শনসমূহ ও নিষিদ্ধ মাসের অবমাননা করো না। যেহেতু নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বাধা প্রদান করা গেল, সেহেতু তাতে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়াই হচ্ছে তার অবমাননা করা। সুতরাং উক্ত আয়াতের সারাংশ হলো, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তার অবমাননা না করা। অথচ উপর্যুক্ত ৩ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়া হারাম নয়। কেননা, তাতে ইরশাদ হয়েছে, মুশরিকদের সাথে লড়াই করো যেমনিভাবে তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো এই যে, মুশরিকদের সাথে সর্বকালে সব মাসে যুদ্ধ-জিহাদ হতে পারে

যেমনিভাবে তারা সর্বকালে সব মাসে তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়; চাই তা নিষিদ্ধ মাসে হোক কিংবা অনিষিদ্ধ মাসে। আল্লামা সুয়ূতী (র) জালালাইন কিতাবে এ তাফসীরই বর্ণনা করেছেন। যেমন–

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً اَىْ جَمِيْعًا فِىْ جَمِيْعِ الشُّهُوْرِ كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً .

আর উক্ত তাফসীরটি একটি নীতিমালার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালাটি এই যে, ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপকতা স্থান, কাল ও অবস্থার ব্যাপকতা দাবি করে। সুতরাং যখন এ আয়াতে সমস্ত মুশরিকের সাথে যুদ্ধবিগ্রহের নির্দেশ প্রদান করা হলো, তাহলে উক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে তার মর্মার্থ দাঁড়াবে এই যে–

اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ جَمِيْعًا فِىْ اَىِّ حَالٍ فِىْ اَىِّ زَمَانٍ فِىْ اَىِّ مَكَانٍ.

অর্থ : তোমরা যে অবস্থায়, যে কালে ও যে স্থানে মুশরিকদের পাও, তাদের সাথে যুদ্ধ করো। (জুমাল) অতএব, উল্লিখিত বর্ণনার সারাংশ হলো এই যে, প্রথম ২টি আয়াতে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা বৈধ নয়; কিন্তু ৩ নং আয়াতটি বৈধ হওয়ার অনুমতি প্রদান করে। সুতরাং প্রথম ২টি আয়াত ও ৩ নং আয়াতের মাঝে বাহ্যিক দিক দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতগুলোর মাঝে পরস্পর বিরোধ মিটানোর উদ্দেশ্যে নিম্নে দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. প্রথম ২টি আয়াত ৩ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, ইসলামের সূচনালগ্নে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ অবৈধ ছিল। পরবর্তীকালে–

   وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً.

   উক্ত আয়াত অবতরণ করে অবৈধতা রহিত করা হয়েছে। সুতরাং নিষিদ্ধ ও অনিষিদ্ধ সব মাসে জিহাদের অনুমতি রয়েছে। এখন কোনো মাসে তা অবৈধ নয়। হযরত আতা খোরাসানী, কাতাদা, সুফিয়ান সাওরী ও ইবনে শিহাব যুহরী প্রমুখের এ উক্তি। ফিকহবিদগণের বৃহত্তম দলও উক্ত মত প্রকাশ করেন। তাফসীরে রুহুল মায়ানীর লেখক ও কাজী বায়যাবীও যুদ্ধ নিষিদ্ধতা রহিত হওয়ার ওপর উম্মতের ঐকমত্য প্রকাশ করেন। তবে রহিতকারী আয়াত নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন– قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً এ আয়াতটি রহিতকারী (নাসেখ)। আবার কেউ বলেন– فَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ

উক্ত আয়াতটি নাসেখ। এভাবে যে, এ আয়াতে حَيْثُ শব্দকে কালের অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যেকালেই পাও, তোমরা মুশরিকদের হত্যা করো। সুতরাং রহিত হওয়ার অবস্থার ওপর জ্ঞাত হলে কোনোক্রমেই আয়াতগুলোর মাঝে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি থাকতে পারে না। (তাফসীরে মাযহারী, খাযেন ও রুহুল মাআনী)

২. হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, প্রথম ২টি আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ অবৈধ হওয়া বোধগম্য হয় না; বরং আয়াতদ্বয় তার বৈধতার ওপর ইঙ্গিত বহন করে, যা পুরো আয়াতের বিষয়বস্তু দ্বারা বোঝা যায়। পুরো আয়াতটি হলো–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ، قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ .

উক্ত আয়াতের মর্মার্থ এই যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা যদিও গুনাহের কাজ, কিন্তু লোক সমাজকে আল্লাহর রাহে বাধা প্রদান করা, ইসলাম অস্বীকার করা, মসজিদে হারামের যিয়ারত থেকে লোক সকলকে প্রতিরোধ করা ও মক্কাবাসীকে মক্কা নগরী থেকে তাড়িয়ে দেয়া এসব কিছু উক্ত নিষিদ্ধ ও সম্মানিত মাসে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়া থেকেও জঘন্যতম পাপ। আর কাফেররা এ মহাপাপ বিরামহীনভাবে করছিল। সুতরাং সারাংশ এই হয় যে, নিষিদ্ধ মাসে অকারণে ও অন্যায়ভাবে লড়াই করাতো অবশ্যই কঠিন গুনাহ, কিন্তু যারা উক্ত মাসে কুফরির বিস্তৃতি ঘটায়, বড় বড় ও জঘন্যতম ফেতনা সৃষ্টি করে, তাদের সাথে লড়াই করা অবশ্যই বিধিসম্মত; বরং তাদের অবিচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে জিহাদ করা বৈধ। কারণ, অধিকতর হালকা গুনাহের বিপরীতে তীব্রতর গুনাহের প্রতিরোধ করা অপরিহার্য। অতএব, উক্ত বিশ্লেষণ মোতাবেক যেহেতু প্রথম ২টি আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধবিগ্রহের অবৈধতা প্রমাণিত নয়, সেহেতু ৩ নং আয়াতের সাথে কোনো রকমের বৈপরীত্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সৃষ্টি হয় না।

(আল-ফাওযুল কাবীর এবং তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ আর-রওজুন নাজীর)

স্বামীহারা স্ত্রীর ইদ্দত
চার মাস দশ দিন না কি এক বছর?

١. وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا. *

٢. وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ.

অনুবাদ

১. আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের ছেড়ে যায়, তখন সে স্ত্রীগণ নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন অপেক্ষমাণ রাখবে।
(সূরা বাকারা : আয়াত ২৩৪)

২. আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং স্ত্রীদের রেখে যায় স্ত্রীদের ঘর থেকে বের করে না দিয়ে– এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে অসিয়ত করে যাবে। (সূরা বাকারা : আয়াত ২৪০)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, স্বামীহারা স্ত্রীদের ইদ্দত পালন চার মাস দশ দিন। আর ২ নং আয়াতে রয়েছে, এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষমাণ থেকে ইদ্দত পালন করার কথা। আর তখন তার ভরণপোষণ সম্পূর্ণ স্বামীর দায়িত্বে থাকবে। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায়, ইদ্দত পালন পূর্ণ এক বছর। তাহলে তো আয়াতদ্বয়ের মাঝে বাহ্যিক দিক দিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : বিরোধ নিরসনকল্পে নিম্নে দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের মাঝে ১ নং আয়াত দ্বারা ২ নং আয়াতটি রহিত করা হয়েছে। যদিও তেলাওয়াতের দিক দিয়ে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অবতরণের দিক দিয়ে আয়াতটি পশ্চাৎগামী। ইসলামের প্রাথমিক যুগে পূর্ণ এক বছর ইদ্দত পালনের নির্দেশ বিধিসম্মত ছিল।

অতঃপর চার মাস দশ দিনের আদেশ প্রদানের মাধ্যমে তা রহিত করা হয়। মুফাসসিরগণের বৃহত্তম দল উক্ত মতই গ্রহণ করেন।

(জালালাইন, আল-ফাওযুল কাবীর)

২. ইদ্দত পালন ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই চার মাস দশ দিন ছিল। কিন্তু মিরাসের বিধান অবতরণ হওয়ার পূর্বে স্বামীহারা স্ত্রীদের ব্যাপারে এতটুকু লক্ষ রাখা হতো যে, যদি ওরা স্বীয় স্বামীর রেখে যাওয়া বসবাসের ঘরে থাকতে চায়, তাহলে এক বছর যাবৎ বসবাস করার অনুমতি রয়েছে এবং স্বামীর ঘরে বসবাসকালে ভরণপোষণও স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে প্রদান করা হবে। এজন্যেই স্বামীদেরকে তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে এমন অসিয়ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর যেহেতু উল্লিখিত সুযোগ ভোগ করা একমাত্র স্ত্রীদেরই অধিকারভুক্ত এবং অধিকার ভোগ করা না করার অধিকারী ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাই উত্তরাধিকারীদের জন্যে স্বামীহারা স্ত্রীদেরকে ঘর থেকে বের করা সম্পূর্ণ অবৈধ। হ্যাঁ, যদি স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করে স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে যায় এবং স্বীয় অধিকার ওয়ারিশদের ছেড়ে দেয়, তাহলে তাও বিধিসম্মত। অতএব, যখন মিরাসের বিধান অবতরণ হয়, তখন উপরিউক্ত হুকুমটি রহিত হয়ে যায়। কারণ, এখন স্বামীর রেখে যাওয়া ঘর ও সম্পদের মধ্যে স্ত্রীর মিরাস পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সুতরাং স্ত্রী তার প্রাপ্ত অংশ থেকে বসবাস ও ভরণপোষণের কার্য সম্পাদন করবে। এ অবস্থায় আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো বিরোধ বাকি থাকে না। (বয়ানুল কুরআন)

একটি নেকীর প্রতিদান তার
সমকক্ষ না বহুগুণ? বহুগুণ হলে কত?

١. مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهٗ لَهٗٓ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً.

٢. مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ أَجْرٌ كَرِيْمٌ.

٣. إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ
وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ.

٤. إِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ الخ. *

٥. مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْۢبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

٦. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. *

٧. لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى.

অনুবাদ

১. এমন কে আছ, যে আল্লাহকে কর্জ দেবে– উত্তম কর্জ। অতঃপর আল্লাহ তাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। (সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৫)

২. কে সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ধার দেবে? এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার। (সূরা হাদীদ : আয়াত ১১)

৩. নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীল নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদের দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। (সূরা হাদীদ : আয়াত ১৮)

৪. যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দেবেন। (সূরা তাগাবুন : আয়াত ১৭)

৫. যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধনসম্পদ দান করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা : আয়াত ২৬১)

৬. যে ব্যক্তি একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশ গুণ প্রতিদান পাবে। (সূরা আনয়াম : আয়াত ১৬০)

৭. মানুষ তা-ই পাবে, যা সে চেষ্টা করে। (সূরা নাজম : আয়াত ৩৯)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোর মাঝে দুই পদ্ধতিতে পরস্পর বিরোধিতার সৃষ্টি হয়।

১. প্রথম ৪টি আয়াত দ্বারা জানা যায়, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে উত্তম কর্জ দান করবে। অর্থাৎ, আল্লাহর রাহে স্বীয় সম্পদ খরচ করবে, আল্লাহ তার প্রতিদান বহুগুণ বাড়িয়ে তাকে প্রদান করবেন। এর দ্বারা জানা যায় যে, একটি নেকীর প্রতিদান অনেক অনেক গুণ বেড়ে যাবে। দশ গুণ বা সাত শত গুণের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই; বরং আল্লাহ তার চেয়েও বেশি দান করতে পারেন।

আয়াত নং ৫-এ ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিজ মাল ব্যয় করবে, তার উপমা একটি শস্যবীজের মতো, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে। প্রত্যেক শীষে একশত শষ্যদানা রয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, একটি নেকীর প্রতিদান সাত শত গুণ বেড়ে যায় এবং উক্ত আয়াতের শেষাংশে রয়েছে– وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ, যদি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হয়, তাহলে সাত শত গুণ থেকেও বেড়ে যায়। তাহলে এ আয়াতের সারাংশ প্রথমোক্ত ৪টি আয়াতের সমার্থবোধক হয়ে যায়।

আর আয়াত নং ৬-এ উল্লেখ আছে যে, একটি নেকীর প্রতিদান দশ গুণ প্রদান করা হবে। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে পরস্পর বিরোধিতা এভাবে হয় যে, প্রথম ৪টি আয়াতে প্রতিটি নেকীকে অনির্দিষ্টভাবে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া যাবে। আয়াত নং ৫-এ বলা হয়েছে, সাত শত গুণ এবং আয়াত নং ৬-এ বলা হয়েছে, দশ গুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে।

২. উল্লিখিত প্রথম ৬টি আয়াত ও সপ্তম আয়াতের মাঝে এ পদ্ধতিতে বিরোধ সৃষ্টি হয় যে, প্রথম ৬টি আয়াত প্রতিটি নেকীর প্রতিদান বহুগুণ হওয়া বোঝায়। আর আয়াত নং ৭ দ্বারা জানা যায় যে, মানুষ তা-ই পাবে, যা সে করবে। অর্থাৎ, একটি নেকীর প্রতিদান একটিই হবে। দশ গুণ, সাত শত গুণ বা বহুগুণ হবে না। সুতরাং প্রথমোক্ত ৬টি আয়াত ও ৭ নং আয়াতের মাঝে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার প্রথম পদ্ধতির নিরসনে তিনটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. দশ গুণ, সাত শত গুণ বা তার চেয়েও বেশি প্রতিদান পাওয়ার তারতম্যটি ইখলাস ও সাধনার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি নেকী অর্জনে নিম্নশ্রেণির ইখলাস ও সাধনাসম্পন্ন হয়, সে প্রতিটি নেকীর বিনিময়েদশ গুণ প্রতিদান পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মধ্যম শ্রেণির ইখলাস ও সাধনার মাধ্যমে নেকী অর্জন করে, তার জন্যে উক্ত নেকী সাত শত গুণ বেড়ে যায়। আর যার ইখলাস ও সাধনা উচ্চ শ্রেণির হয়, সে প্রতিটি নেকীর বিনিময়ে সাত লক্ষ গুণ বা তার চেয়েও অধিক প্রতিদান লাভ করে। যেমন নিম্নের হাদীস দ্বারা অনুমান করা যাবে–

عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىْ قَالَ بَلَغَنِىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهٗ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَكْتُبُ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ اَلْفَ اَلْفَ حَسَنَةٍ فَحَجَجْتُ ذٰلِكَ الْعَامَ وَلَمْ اَكُنْ اُرِيْدُ اَنْ اَحُجَّ اِلَّا لِلِقَائِهٖ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَلَقِيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهٗ فَقَالَ لَيْسَ هٰذَا قُلْتُ وَلَمْ يَحْفَظْ الَّذِىْ حَدَّثَكَ اِنَّمَا قُلْتُ اِنَّ اللّٰهَ يُعْطِى الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ اَلْفَىْ اَلْفَ حَسَنَةٍ ثُمَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَوَ لَيْسَ تَجِدُوْنَ هٰذَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً فَالْكَثِيْرَةُ عِنْدَهٗ تَعَالٰى اَكْثَرَ مِنْ اَلْفَىْ اَلْفَ وَاَلْفَىْ اَلْفٍ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَةَ اَلْفَىْ اَلْفَىْ حَسَنَةٍ. (رواه احمد وابن المنذر وابن ابى حاتم، روح المعانى ١٤٣/٢)

অর্থ : হযরত আবু ওসমান নাহদী বলেন, আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মুমিন বান্দার প্রতিটি নেকীর বিনিময়ে দশ লক্ষ গুণ নেকী প্রদান করবেন। (ওসমান নাহদী বলেন,) আমি সে বছর হজ পালন করলাম এ উদ্দেশ্যে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করে উক্ত হাদীস সম্পর্কে অবগত হব। ফলে আমি হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করি এবং তার সাথে উক্ত হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করি। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, আমি এ হাদীস বলিনি। যিনি আপনাকে হাদীস শুনিয়েছেন তিনি আমার বর্ণিত হাদীস আয়ত্ত রাখতে পারেননি। আমি হাদীস বর্ণনা করেছিলাম যে, আল্লাহ

তায়ালা মুমিন বান্দাকে একটি নেকীর প্রতিদান বিশ লক্ষ প্রদান করেন। অতঃপর আবু হোরায়রা (রা) বললেন যে, তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের মধ্যে পাওনি– مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا (যে আল্লাহকে উত্তম কর্জ দান করবে অর্থাৎ, আল্লাহর রাহে খরচ করবে, আল্লাহ তার প্রতিদান বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন। বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়ার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা উক্ত নেকীকে বিশ লাখ বা তদপেক্ষাও বেশি প্রদান করে থাকেন। শপথ সে সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, রাসূল (স) থেকে আমি শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা একটি নেকীকে চল্লিশ লাখ নেকীতে পরিণত করে দেন।

২. নিজ গৃহে অবস্থান করে নেকী অর্জন করলে প্রতিটি নেকীর প্রতিদান সাত শত গুণ বেড়ে যায়। আর জিহাদে অংশগ্রহণ করে নেকী অর্জন করলে সাত লক্ষ গুণ বেড়ে যায়। যা নিম্নলিখিত হাদীস দ্বারা অনুমান করা যাবে– عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَرْسَلَ بِنَفْقَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَقَامَ فِىْ بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِاَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَنْفَقَ فِىْ وَجْهِ ذٰلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِاَةِ اَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ {مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ}. (اخرجه ابن ماجه وابن ابى حاتم ، روح المعانى)

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে ঘরে অবস্থানরত অবস্থায়, সে ব্যক্তি প্রতিটি দিরহামের বিপরীতে সাত শত দিরহাম খরচ করার সাওয়াব পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে অবস্থান করে আল্লাহর রাহে খরচ করবে, সে কেয়ামত দিবসে প্রতিটি দিরহামের পরিবর্তে সাত লক্ষ গুণ সাওয়াবের মালিক হবে। অতঃপর নবীজী (স) তেলাওয়াত করলেন– مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ

৩. দশ গুণ বা সাত শত গুণ বলার দ্বারা উদ্দেশ্য পরিমাণ নির্ধারণ করা নয়; বরং সাওয়াবের প্রাচুর্য বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা একটি নেকীর প্রতিদান বহুগুণ প্রদান করতে পারেন, যদি তাঁর ইচ্ছা হয়। এ বিশ্লেষণ হিসেবে উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোর মর্মার্থ এক হয়ে যায় এবং এগুলোর মাঝে কোনো বিরোধই বাকি থাকে না। (তাফসীরে রুহুল মাআনী)

দ্বিতীয় পদ্ধতির বিরোধ নিরসনেও তিনটি জবাব নিম্নে প্রদান করা হলো

১. لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى এ আয়াতের মধ্যে একটি নেকীর প্রতিদান একটি হওয়ার কথা বিশ্লেষণ নেই। পক্ষান্তরে পাপের বিষয়ে অবতীর্ণ আয়াতে একটি পাপের বিপরীতে একটি প্রতিদান হওয়ার কথা প্রকাশ্যভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا (যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে, তাকে তার অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হবে)। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে মানুষের কষ্ট ও সাধনার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, মানুষ নিজ সাধনার প্রতিদানই পাবে; অপরের সাধনার প্রতিদান নয়। তবে প্রতিদান কত পাবে, তা উক্ত আয়াতে বিশ্লেষিত হয়নি; বরং বাকি ছয়টি আয়াতে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুতরাং এ আলোচনার পর আয়াতগুলোর মাঝে কোনো বিরোধই নেই।

২. যদি নেকী ও তার প্রতিদানের মাঝে সমকক্ষতা উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তাহলে জবাব এটা হবে যে, উক্ত আয়াতটি ইনসাফের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রথমোক্ত ছয়টি আয়াত আল্লাহ তায়ালার ফজল ও করুণার ওপর ভিত্তিশীল। অর্থাৎ, ইনসাফের চাহিদা ছিল এটাই যে, একটি নেকীর প্রতিদান হবে মাত্র একটি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আপন ফজল ও করুণা প্রদর্শনের মাধ্যমে তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন।

খোরাসানের শাসক আব্দুল্লাহ ইবনে তাহের হযরত হোসাইন ইবনে ফজলকে এ আয়াত ও وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ-এর মাঝে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিশ্লেষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন হযরত হোসাইন ইবনে ফজল উত্তরে বললেন– لَيْسَ لَهُ بِالْعَدْلِ اِلَّا مَا سَعٰى وَلَهُ بِالْفَضْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ (আল্লাহ তায়ালা যদি ইনসাফ প্রদর্শন করতেন, তাহলে কষ্ট ও সাধনা মোতাবেক প্রতিদান প্রদান করতেন, অথচ আল্লাহ তায়ালা ফজল ও করুণা প্রদর্শনকরণার্থে প্রতিটি নেকীকে বহুগুণ বাড়িয়ে ফেরেশতা কর্তৃক আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দেন)। এ উত্তর শুনে খোরাসানের শাসক হযরত হোসাইন ইবনে ফজলের মস্তক চুম্বন করতে থাকেন। (তাফসীরে রুহুল মাআনী)

৩. প্রতিটি নেকীর প্রতিদান বহুগুণ বেড়ে যাবে সে সময়, যখন বান্দা এ নিয়তে ও এ আশায় নেকী করবে যে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিদান বহুগুণ বাড়িয়ে প্রদান করবেন।

মৃত্যুর পর
পুনর্জীবনের প্রকৃতি কী হবে?

١. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. *

٢. كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ.

অনুবাদ

১. স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। (আল্লাহ) বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? সে (ইবরাহীম) বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু অন্তরের প্রশান্তি লাভ করার জন্যে (দেখতে চাইছি)। (আল্লাহ) বললেন, চারটি পাখি ধরো। অতঃপর সেগুলোকে তোমার কাছে পোষ মানিয়ে নাও। অতঃপর বিভিন্ন পাহাড়ের ওপর সেগুলোর একেকটি অংশ রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাকো। তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা : আয়াত ২৬০)

২. যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত। আমি তা পূর্ণ করবই।

(সূরা আম্বিয়া : আয়াত ১০৪)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রকৃতি হবে এটা যে, বিক্ষিপ্ত অঙ্গগুলোকে একত্র করে তার দেহ তৈরি করে তাতে রূহ প্রদান করা হবে। কেননা, হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ

তায়ালার নিকট মৃতদের জীবিতকরণ পদ্ধতি প্রসঙ্গে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, তুমি ৪টি পাখি ধরে তা পোষ মানিয়ে নাও। অতঃপর সেগুলোকে জবাই করে গোশত, পালক ও হাড়গুলো ছোট ছোট টুকরো করে পাহাড়ের চূড়ায় রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাকো। তাহলে দেখবে যে, সেগুলো জীবিত হয়ে দৌড়ে তোমার কাছে চলে আসছে। অনুরূপভাবে হযরত ইবরাহীম (আ) এমনটা করলেন যে, ৪টি পাখি (মোরগ, ময়ূর, শকুন ও বক) নিয়ে সেগুলোকে পোষ মানিয়ে জবাই করলেন। অতঃপর সেগুলোর গোশত, পালক ও হাড়গুলো টুকরো টুকরো করে পাহাড়ের চূড়ায় রেখে দিলেন। তারপর ডাক দেয়া মাত্রই সবগুলো টুকরো হাড়ের সাথে হাড়, পালকের সাথে পালক, রক্তের সাথে রক্ত ও গোশতের সাথে গোশত সম্পৃক্ত হয়ে পূর্বাকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবিতাবস্থায় তার কাছে এসে উপস্থিত হলো। অতএব, আল্লাহ তায়ালা এ দৃশ্য দেখিয়ে স্পষ্ট করে দেন যে, আমি কেয়ামত দিবসে এমনভাবেই মৃতদের জীবিত করব যে, সমস্ত সৃষ্টি, প্রাণিজগৎ এর পচা-বিনষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যা টুকরো টুকরো হয়ে সারা দুনিয়াতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে, সেগুলোকে আমার পক্ষ থেকে একজন আহ্বায়ক আহ্বান করবে–

أَيَّتُهَا الْعِظَامُ الْبَالِيَةُ وَالْجُلُوْدُ الْمُتَمَزِّقَةُ وَاللُّحُوْمُ الْمُتَفَرِّقَةُ هَلُمُّوْا اِلٰى عَرْضِ الرَّحْمٰنِ .

অর্থ : হে পচা ও বিনষ্ট হাড়সমূহ, বিক্ষিপ্ত চামড়া ও গোশতের টুকরোসমূহ চলো দয়ালু আল্লাহর সমীপে। এভাবে পচা হাড় ও বিক্ষিপ্ত চামড়া ও গোশতগুলো দেহাবয়বে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা দেহে রূহ প্রদান করে জীবিত করবেন।

দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন পদ্ধতির প্রকৃতি হবে অস্তিত্বহীন করার পর পুনরাবৃত্তি করা। এজন্যেই তো দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে– كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ (যেভাবে আমি প্রত্যেক জিনিসকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, সেভাবেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব।) যেহেতু প্রত্যেকটি বস্তু প্রথমবার অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু দ্বিতীয়বারও অনস্তিত্ব থেকেই তা সৃষ্টি হবে। সুতরাং বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয় আয়াতের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে যায়।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতদ্বয়ের মাঝে বিরোধ নিরসনকল্পে চারটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. মৃত্যুর পর পুনর্জীবন পদ্ধতি সেটাই হবে যা ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে অর্থাৎ, جَمْعُ بَعْدِ التَّفْرِيْقِ; আর দ্বিতীয় আয়াতে তথা كَمَا بَدَأْنَا الخ-এর মাঝে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রদানকে প্রথম সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা হয়েছে এ মর্মে যে, আল্লাহ তায়ালা যেমনিভাবে সহজ পদ্ধতিতে প্রথমবার মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে মৃত্যুর পরও পুনরায় সহজভাবেই সৃষ্টজগৎকে জীবনদান করে অস্তিত্বসম্পন্ন করতে সক্ষম। তা মহান আল্লাহর জন্যে কঠিন ও জটিল ব্যাপার নয়। যেমনটা হযরত থানভী (র) বয়ানুল কুরআনের টীকাতে উল্লেখ করেছেন।

২. ২ নং আয়াতের মধ্যে মূল সৃষ্টির ব্যাপারে সাদৃশ্য প্রদান করা হয়েছে। সৃষ্টির অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না। অর্থাৎ, আমি আল্লাহ প্রাথমিক পর্যায়ে যেমনিভাবে মাখলুক সৃষ্টি করলাম, ঠিক তেমনিভাবে দ্বিতীয় পর্যায়েও সৃষ্টি করতে সক্ষম। বাকি রইল সৃষ্টির অবস্থা ও পদ্ধতি। আর তা হলো সেটা, যা প্রথমোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে আর কোনো বিরোধ বাকি নেই।

৩. কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের পদ্ধতি দুটি, যা আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, কিছু মৃতদেহ এমন রয়েছে, যা একেবারেই অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। সে মৃতদেহকে নতুন করেই সৃষ্টি করা হয়। যা ২ নং আয়াতের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কিছু মৃতদেহ এমন রয়েছে যেগুলো সমূলে বিনাশ হয় না; বরং বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। সেগুলোকে একত্র করে কেয়ামত দিবসে পুনর্জীবন দান করা হবে। যা ১ নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এ বিশ্লেষণ অনুসারে আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো বিরোধ ও বৈপরীত্ব বাকি থাকে না।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, কোনো কোনো লোকের মৃতদেহ সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত থাকে। যেমন– নবীগণের মৃতদেহ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাদের দেহকে মাটির জন্যে হারাম করে দেয়া হয়েছে। যেখানেই থাকুক না কেন, সংরক্ষিত থাকবে। নষ্টও হবে না এবং অস্তিত্বহীনও হবে না। এভাবে ইখলাসের সাথে আযানদাতা ও কুরআনে কারীমের বহনকারী হাফেয ও আলেমগণের মৃতদেহ হেফাজত থাকা সম্পর্কেও হাদীসের কিতাবগুলোতে উল্লেখ রয়েছে। (তাবারানী, রুহুল মাআনী : ১৭/১০২)

৪. ২ নং আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অবস্থানগত ও গুণগতভাবে পুনরুত্থানকে প্রথম সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা। অর্থাৎ, যে অবস্থা ও পদ্ধতির ওপর প্রথমবার সৃষ্টি করা হলো যেমন– পাদুকাহীন, বস্ত্রহীন ও খাতনাবিহীন, ঠিক সে অবস্থা ও পদ্ধতির ওপর কেয়ামত দিবসেও পুনরুত্থান করা হবে। এ কথার সমর্থনে নবীজী (স)-এর বাণীও পাওয়া যায়। যা নিম্নে প্রদান করা হলো–

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ . (ابن كثير ٢٣٢/٣)

অর্থ : হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুজুর (স) আমাদের সামনে বক্তৃতা রাখার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করলেন, আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তোমাদেরকে কেয়ামত দিবসে পাদুকাহীন, বস্ত্রহীন ও খাতনাবিহীন অবস্থায় পুনরুত্থান করা হবে। (আল্লাহ তায়ালা বলেন,) যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করলাম, সেভাবেই পুনসৃষ্টির কার্য সম্পাদন করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত। আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।

সুতরাং উক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা গেল যে– كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ দ্বারা উদ্দেশ্য অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়ার পর নতুন সৃষ্টি করা নয়; বরং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের অবস্থা ও গুণাগুণ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। আর এর পদ্ধতি হলো সেটাই যা প্রথমোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এখন আয়াতদ্বয়ের মাঝে আর কোনো বিরোধই অবশিষ্ট রইল না।

মনের অনিচ্ছাধীন
কুমন্ত্রণার ওপর পাকড়াও করা হবে কি না?

١. وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ. *

٢. لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

অনুবাদ

১. যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। (সূরা বাকারা : আয়াত ২৮৪)

২. আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না। (সূরা বাকারা : আয়াত ২৮৬)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন যে, তোমাদের অন্তঃকরণে যে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়, তা যদি তোমরা কথাবার্তা বা কাজ-কারবারে প্রকাশ কর, অথবা স্বীয় অন্তঃকরণে গোপন করে রাখ– উভয় অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তার হিসাব-নিকাশ তোমাদের থেকে গ্রহণ করেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করবেন। সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, অন্তরের কুমন্ত্রণা চাই ইচ্ছাধীন হোক কিংবা অনিচ্ছাধীন হোক, তার জন্যে বান্দাকে আল্লাহর নিকট পাকড়াও হতে হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াত থেকে জানা যায় যে, বান্দা সেসব কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না, যা তার সাধ্যানুকূলে নেই। সাধ্যাতীত কর্ম বান্দা দ্বারা সম্পাদিত হোক বা না হোক, তার জন্যে পাকড়াও হতে হবে না।

অতএব, ১ নং আয়াত ও ২ নং আয়াতের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয় এ মর্মে যে, ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সব আত্মিক কুমন্ত্রণার জন্যে আল্লাহর কাছে বান্দা পাকড়াও হবে। আর ২ নং আয়াতের মর্মার্থ হয় এই যে, অনিচ্ছাকৃত কুমন্ত্রণার কোনো জবাবদিহিতা নেই।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতদ্বয়ের মাঝে বিরোধ নিরসনকল্পে নিম্নে তিনটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. প্রথম আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইচ্ছাধীন কুমন্ত্রণা, আর দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অনিচ্ছাধীন কুমন্ত্রণা। অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃত কুমন্ত্রণার জন্যে অবশ্যই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতা রয়েছে। আর অনিচ্ছাধীন আত্মিক কুমন্ত্রণার জন্যে কোনো পাকড়াও নেই। (বয়ানুল কুরআন)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) থেকে জানা গেল, আত্মিক কুমন্ত্রণার দরুন বান্দাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে– যদি তা দৃঢ় সংকল্পের সাথে হয়। (তাফসীরে খাযেন)

২. প্রথম আয়াতে যে জবাবদিহিতার কথা বলা হয়েছে, তা দুনিয়াতেই শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় আয়াতে যে পাকড়াওকে নিষেধ করা হয়েছে, তা হচ্ছে পরকালীন পাকড়াও। অর্থাৎ, সাধ্যাতীত বস্তুর জন্যে পরকালে কোনো পাকড়াও নেই। সুতরাং যারা অন্তরে অন্তরে পাপের কুচিন্তা করে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তার দরুন দুনিয়াতেই বিভিন্ন পেরেশানি ও বিষণ্নতার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করে ফেলেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নে আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি রেওয়ায়াতের উদ্ধৃতি প্রদান করা হলো–

رَوَى الضَّحَّاكُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ اَنَّهَا قَالَتْ مَا اَحْدَثَ الْعَبْدُ بِهٖ نَفْسَهٗ مِنْ شَرٍّ كَانَتْ مُحَاسَبَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ بِغَمٍّ يَبْتَلِيْهِ بِهٖ فِى الدُّنْيَا اَوْ حُزْنٍ اَوْ اَذًى فَاِذَا جَائَتِ الْآخِرَةُ لَمْ يَسْئَلْ عَنْهُ وَلَمْ يُعَاقِبْ عَلَيْهِ وَرَوَتْ اَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ فَاَجَابَهَا بِمَا هٰذَا مَعْنَاهُ. (التفسير الكبير صـ ١٣٤/٧)

অর্থ : আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেন, বান্দার অন্তরে যেসব মন্দ কর্মের সংকল্প হয়, তার হিসাব-নিকাশ অর্থাৎ পাকড়াও দুনিয়াতেই হয়ে যায়। এভাবে যে, তাকে কোনো না কোনো পেরেশানি ও বিষণ্নতার মধ্যে লিপ্ত করা হয়। ফলে পরকালে অন্তরে কল্পিত কুমন্ত্রণার দরুন সে জিজ্ঞাসিতও হবে না এবং শাস্তিপ্রাপ্তও হবে না। হযরত আয়েশা (রা) ইরশাদ করেন, তিনি নবীজী (স)-কে উপর্যুক্ত প্রথম আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে প্রিয় নবী (স) উল্লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। (তাফসীরে কাবীর : ৭/১৩৪)

৩. প্রথমোক্ত আয়াতে যে জবাবদিহিতার কথা বলা হয়েছে, তা সে ব্যক্তির জন্যে, যে অন্তরের কুমন্ত্রণাকে ভালো মনে করে এবং অন্তরে অসৎ কল্পনা-জল্পনার দরুন স্বাদ অনুভব করে। আর দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে যে জবাবদিহিতা রহিত করা হয়েছে তা সে ব্যক্তির ব্যাপারে, যে অন্তরের অসৎ খেয়ালকে মন্দ ও গর্হিত বলে প্রবল ধারণা করে এবং তাকে অপছন্দ করে তার থেকে বেঁচে থাকতে চায়। অতএব, এ বিশ্লেষণ মোতাবেক আয়াতদ্বয়ের মাঝে আর কোনো বিরোধ বাকি থাকতে পারে না। (তাফসীরে কাবীর : ৭/১৩৫)

বান্দা সাধ্যাতীত কর্ম সম্পাদনে বাধ্য কি না?

١. لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

٢. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. *

٣. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ.

অনুবাদ

১. আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না।

(সূরা বাকারা : আয়াত ২৮৬)

২. আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেই না।

(সূরা আনয়াম : আয়াত ১৫২)

৩. হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের ওপর এমন কিছু চাপিয়ে দেবেন না, যা আমাদের সাধ্যের বাইরে। (সূরা বাকারা : আয়াত ২৮৬)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : আয়াত নং ১ ও ২ দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা কোনো বান্দাকে এমন কাজের দায়িত্ব প্রদান করেন না, যা বান্দার সাধ্যের বাইরে। আর আয়াত নং ৩ দ্বারা জানা যায় যে, বান্দাকে সাধ্যাতীত কর্মে বাধ্য করা হয়। কারণ, তাতে আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাকে এ দোয়া করার ওপর উদ্বুদ্ধ করেছেন যে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের ওপর ঐ বোঝা আরোপ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। এমন দোয়া সে সময় হতে পারে যখন আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাকে সাধ্যাতীত কাজে বাধ্য করেন। আর যদি তা না হয়, তাহলে উক্ত দোয়া বান্দার জন্যে অনর্থক হয়ে যাবে।

অতএব, এ বিশ্লেষণ অনুসারে উপযুক্ত ১ ও ২ নং আয়াত এবং ৩ নং আয়াতের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর মাঝে বাহ্যিক দিক দিয়ে পরস্পর যে বিরোধ বোঝা যায়, তা নিরসনে নিম্নে দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. আয়াত নং ১ ও ২-এর মধ্যে تَكْلِيْف (তাকলীফ) রহিত করা হয়েছে। আর আয়াত নং ৩-এর মধ্যে تَحْمِيْل (তাহমীল) সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাকলীফ ও তাহমীলের মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। তাকলীফের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন বস্তু অত্যাবশ্যক করে দেয়া, যার মধ্যে কষ্ট ও পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়। যেমন– ফরয ও ওয়াজিব ইবাদতগুলো। যেগুলো সম্পাদন করতে কষ্ট ও সাধনার প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে তাহমীল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট অবতরণ করা, যা থেকে মুক্তি তালাশ করার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা বর্ণিত ৩ নং আয়াতে বান্দাকে পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন।

অতএব পূর্বোক্ত দুটি আয়াতের মর্মার্থ হলো এই যে, আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার ওপর এমন বস্তু ফরয, ওয়াজিব এবং বাধ্যতামূলক করেন না যা সম্পাদনের সাধ্য বান্দার কাছে নেই। আর তৃতীয় আয়াতের মর্মার্থ হলো এই যে, বান্দা সহ্য করতে পারে না এমন বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত হতে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।

অতএব, আয়াত নং ১ ও ২ দ্বারা যা রহিত করা হয়েছে, ৩ নং আয়াত দ্বারা তা সাব্যস্ত করা হয়নি; বরং ৩ নং আয়াত দ্বারা এমন বস্তু সাব্যস্ত করা হয়েছে যা উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয়ের বিষয়বস্তুর বাইরে।

(রুহুল মায়ানী : ৩/৬৯-৭০)

২. তাকলীফ ও তাহমীল উভয় শব্দকে যদি সমার্থবোধক মনে করা হয়, তাহলে জবাব এটা হবে যে, প্রথমোক্ত দুটি আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সাধ্যাতীত কর্মের দায়িত্বভার প্রাপ্ত হওয়া থেকে বান্দা মুক্তি লাভ করা। আর ৩ নং আয়াতের মর্মার্থ হবে এই যে, সাধ্যের বাইরেও বান্দাকে দায়িত্ব প্রদান করা সম্ভব ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ্ বান্দার ওপর বিশেষ করুণা প্রদর্শনার্থে এমনটা করেননি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শ অনুসারে تَكْلِيْف مَا لَا يُطَاق অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালা ইচ্ছা করলে বান্দাকে অসাধ্য কর্মের দায়িত্বভারও প্রদান করতে পারতেন এবং তা আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে সম্ভবও ছিল, যদিও তা বাহ্যিক দিক দিয়ে সংঘটিত হয় না।

অতএব, উল্লিখিত বিশ্লেষণ অনুপাতে আয়াতগুলোর মাঝে আর কোনো বিরোধ থাকে না।

পূর্ণ কুরআন সুস্পষ্ট না রূপক?
না কিছু আয়াত রূপক আর কিছু সুস্পষ্ট?

١. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. *

٢. الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. *

٣. نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ.

অনুবাদ

১. তিনিই আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট। সেগুলোই কিতাবের মূল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক।
(সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৭)

২. আলিফ-লাম-রা। এটি এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত, অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত এক মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে।
(সূরা হূদ : আয়াত ১)

৩. আল্লাহ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃপুন পঠিত। (সূরা যুমার : আয়াত ২৩)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, কুরআনে কারীমের কিছু আয়াত সুস্পষ্ট এবং কিছু আয়াত রূপক। ২ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, সবগুলো সুস্পষ্ট এবং ৩ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, সবগুলো রূপক। সুতরাং বাহ্যিক দিক দিয়ে আয়াতগুলোর মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১ নং আয়াতের মধ্যে مُحْكَم ও مُتَشَابِه-এর পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। ২ নং ও ৩ নং আয়াতে مُحْكَم ও مُتَشَابِه-এর আভিধানিক অর্থের বিবেচনা করা হয়েছে।

مُحْكَم-এর আভিধানিক অর্থ : মজবুত, সুদৃঢ়, যথাযথ। এটা اَحْكَام শব্দ থেকে নির্গত। আর مُتَشَابِه-এর আভিধানিক অর্থ হলো, সে বস্তু যার একাংশ অপরাংশের সদৃশ হয়।

পরিভাষায় مُحْكَم বলা হয়– وَاضِحُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ অর্থাৎ, সে শব্দ যা উদ্দিষ্ট বস্তুর ওপর সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। আর مُتَشَابِه বলা হয়– خَفِيُّ الدَّلَالَةُ عَلَى الْمُرَاد অর্থাৎ, সে শব্দ যা উদ্দিষ্ট বস্তুর ওপর অস্পষ্ট ও গোপনীয়তার সাথে নির্দেশনা প্রদান করে।

অতএব, আয়াতগুলোর মাঝে বিরোধ নিরসনের সারমর্ম হলো এই যে, ১ নং আয়াতে কুরআনে কারীমের কিছু অংশকে مُحْكَم এবং কিছু অংশকে مُتَشَابِه বলা হয়েছে পারিভাষিক অর্থের ভিত্তিতে। অর্থাৎ, কুরআনের কিছু আয়াত এমন রয়েছে যে, সেগুলো উদ্দিষ্ট বস্তুর ওপর সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে। যেমন– বিধিবিধান, ওয়াদা-অঙ্গীকার ও শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত আয়াতসমূহ।

পক্ষান্তরে কিছু আয়াত এমন রয়েছে যেগুলোর উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়; বরং অস্পষ্ট। যেমন– সূরাসমূহের প্রারম্ভে اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَات অর্থাৎ, বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলোর সমন্বয়ে যেসব আয়াত গঠিত। যেমন– حٰمٓ - طٰسٓمٓ - طٰسٓ الٓمٓ - الٓرٰ - الٓمٓرٰ - الٓمٓصٓ ইত্যাদি।

আর ২ নং আয়াতে পূর্ণ কুরআনের আয়াতসমূহকে আভিধানিক অর্থে বিবেচনা করে مُحْكَم (সুস্পষ্ট) বলা হয়েছে। অর্থাৎ, কুরআনের সবগুলো আয়াত মজবুত ও সুদৃঢ়। তাতে গোলমাল, দোষক্রটি ও ঘাটতির বিন্দুমাত্রও নেই। পরস্পর বৈরিতা পোষণ, অর্থগত অমিল ও অসামঞ্জস্যসহ সকল ক্রটি থেকে আল্লাহ তায়ালার বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন পবিত্র। যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন– اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ অর্থ : নিশ্চয় আমি আল্লাহ কুরআন অবতরণ করলাম এবং তার হেফাজতের দায়িত্বভারও গ্রহণ করলাম। এবং ৩ নং আয়াতেও আভিধানিক দিক লক্ষ করে বলা হয়েছে, কুরআনের সমস্ত আয়াত مُتَشَابِه অর্থাৎ, ভাষালংকার শাস্ত্র– ফাসাহাত ও বালাগাত-এর সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে কুরআনের কিছু অংশ অপরাংশের সদৃশ হয়। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, পূর্ণ কুরআনের আয়াতগুলো রূপকার্থবিশিষ্ট ও অর্থের ওপর অস্পষ্ট নির্দেশক।

(জালালাইন, রুহুল মাআনী, সাবী)

বদর যুদ্ধে কাফেররা
মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখেছিল না তদপেক্ষা কম?

১. وَأُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. *

২. وَيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا.

অনুবাদ

১. আর অপর দল ছিল কাফেরদের। এরা স্বচক্ষে তাদের দ্বিগুণ দেখছিল।
(সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৩)

২. আর তোমাদের দেখালেন তাদের চোখে অল্প, যাতে আল্লাহ সে কাজ করে নিতে পারেন, যা ছিল নির্ধারিত। (সূরা আনফাল : আয়াত ৪৪)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : প্রথম আয়াতে বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ .

অর্থাৎ, যখন মুসলমান ও কাফের উভয় দল তুমুল লড়াইয়ে লিপ্ত হলো, তখন মুসলমানদের কাফেররা দ্বিগুণ অবস্থায় দেখছিল। অথচ কাফেরদের সংখ্যা ছিল হাজারের কাছাকাছি, আর মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল তিন শত তেরো জন। কাফেররা মুসলমানদের দ্বিগুণ প্রত্যক্ষ করার মর্মার্থ এভাবে বর্ণনা করা হয় যে, উল্লিখিত প্রথম আয়াতে يَرَوْنَهُمْ-এর ফায়েলের সর্বনাম দ্বারা কাফের যোদ্ধাদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়। আর هم সর্বনাম দ্বারা মুসলিম সেনাদল ও مِثْلَيْهِم-এর সর্বনাম দ্বারা কাফের যোদ্ধা উদ্দেশ্য নেয়া হয়। এ মর্মার্থ হযরত শাইখুল হিন্দ (র) বর্ণনা করেন। যদিও এ আয়াতে আরো বহু তাফসীরের সম্ভাবনা রয়েছে।

আর ২ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ أَعْيُنِهِمْ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে (মুসলমান) কাফেরদের সম্মুখে সংখ্যালঘু করে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ, কাফেররা তোমাদেরকে সংখ্যায় কম দেখছিল। অনুরূপভাবে মুসলমানদের সংখ্যাও বাস্তব ক্ষেত্রে সে যুদ্ধে কম ছিল। আল্লাহ তায়ালা বদর যুদ্ধে মুসলমানদেরকে সংখ্যায় হ্রাস করে কাফেরদেকে প্রত্যক্ষ করানো সম্পর্কে একটি বর্ণনা এমনও পাওয়া যায় যে, আবু জেহেল মুসলমান

সেনাদলকে দেখে নিজ সৈন্যদলকে সম্বোধন করে বলল, তাদের সংখ্যা তো এতটুকু দেখা যাচ্ছে যে, যাদের খোরাক লাগবে মাত্র একটি উট। অর্থাৎ, আরববাসীদের মধ্যে একটি উট এক শত লোকের খোরাক হতো। এ বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, বদর যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদগণের সংখ্যা ছিল ১০০-এর মতো। সুতরাং উভয় আয়াতের মাঝে পরস্পর বিরোধ হয়ে যায়।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতদ্বয়ের মাঝে পরস্পর বিরোধ নিরসনে দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. উল্লিখিত আয়াতদ্বয় সময়ের ব্যবধানের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের চোখে মুসলমানদেরকে স্বল্প করে দেখালেন। এর হেকমতপূর্ণ কারণ হলো এই যে, যদি মুসলমানদেরকে শুরুতেই কাফেরদের নিকট সংখ্যাধিক্যের সাথে আল্লাহ তায়ালা দেখাতেন, তাহলে কাফেররা হয়তো ভয়ে কম্পমান হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে যেত এবং যুদ্ধাভিযান বন্ধ হয়ে যেত। অথচ আল্লাহ তায়ালা এ যুদ্ধাভিযানের মাধ্যমে কাফের ও মুশরিকদের ধ্বংস ও পরাজিত করার ফয়সালা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন। অতঃপর যখন লড়াই জমে উঠল তখন কাফেররা মুসলমানদের দ্বিগুণ অবস্থায় দেখতে পেয়ে আন্তরিক সাহস হারিয়ে ফেলে। ফলে কাফেরদের ওপর মুসলমানদের অভিযান চালাতে বহু সহজ হয়ে যায় এবং আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের নজরে কাফেরদের সংখ্যাও কমিয়ে দেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ইরশাদ করেন, আমাদের দৃষ্টিতে কাফেরদের সংখ্যা ৯০ জন ছিল। অতএব, উভয় আয়াতের মাঝে সামঞ্জস্য এভাবে রক্ষা করা যায় যে, উল্লিখিত প্রথম আয়াতটি যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের ওপর ভিত্তিশীল। আর দ্বিতীয় আয়াতটি যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরবর্তী সময়ের ওপর ভিত্তিশীল। (জালালাইন, তাফসীরে আবুস সঊদ)

২. প্রথম আয়াতের মধ্যে يَرَوْنَهُمْ-এর فَاعِل ও مَفْعُوْل-এর উভয় সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য কাফের সম্প্রদায় এবং مِثْلَيْهِم-এর সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য মুসলিম মুজাহিদ। তখন আয়াতের মর্মার্থ হবে, কাফেররা নিজেদেরকে মুসলিম মুজাহিদদের থেকে বহুগুণ বেশি দেখেছিল। যা হযরত থানভী (র) বয়ানুল কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আর উল্লিখিত আয়াতে مِثْلَيْهِم শব্দের প্রথমাংশ যদিও দ্বিবচন হয়, কিন্তু তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বহুবচন। এখানে নির্দিষ্টকরণ উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে সংখ্যাধিক্য বোঝানো। কেননা, বদর যুদ্ধে তো কাফেররা ছিল মুসলমানদের তুলনায় তিন গুণ বেশি। অতএব, এ বিশ্লেষণ অনুসারেও আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো বিরোধ থাকে না।

ঈমান ও ইসলাম এক নাকি ভিন্ন?

١. إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ.

٢. وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ.

٣. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ.*

٤. قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا أَسْلَمْنَا

অনুবাদ

১. নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দীন হচ্ছে একমাত্র ইসলাম।
(সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯)

২. যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৮৫)

৩. অতঃপর সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদের উদ্ধার করলাম এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোনো মুসলমান আমি পাইনি।
(সূরা যারিয়াত : আয়াত ৩৫)

৪. মরুবাসীরা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুন, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি; বরং বলো, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। (সূরা হুজুরাত : আয়াত ১৪)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : প্রথম তিনটি আয়াত দ্বারা জানা যায়, ঈমান ও ইসলাম এক বস্তু। আর ৪ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালা প্রথমোক্ত আয়াতে ইরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট মনোনীত একমাত্র ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম আল্লাহর কাছে বাতিল বলে গণ্য। এর দ্বারা বোঝা যায়, ঈমান ও ইসলাম এক ও অভিন্ন জিনিস। কেননা, যদি ঈমান ইসলাম ব্যতীত অপর কিছু হয়, তাহলে তো তা আল্লাহর মনোনীত হতে পারে না। আর যা আল্লাহর মনোনীত নয় তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

এভাবে ২ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন, ইসলাম ব্যতীত অপর ধর্ম তালাশ করো না। করলে তা গৃহীত হবে না। এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, ঈমান হচ্ছে ইসলাম। কারণ, অনৈসলামতো ঈমান হতে পারে না। আর হলেও তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

অনুরূপভাবে ৩ নং আয়াত দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, হযরত লূত (আ) এবং তাঁর অনুসারীদের প্রথমে মুমিন ও পরে মুসলিম বলে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতদ্বয় দ্বারা ঈমান ও ইসলাম এক ও অভিন্ন হওয়া সাব্যস্ত হয়। অতএব, উল্লিখিত ও আলোচিত আয়াতগুলো ঈমান ও ইসলাম এক জিনিস হওয়ার ব্যাপারে সমার্থবোধক। কিন্তু ৪ নং আয়াতটি এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশনা দেয় যে, ঈমান ও ইসলাম উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। কেননা, আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনু আসাদ গোত্রের কিছু লোক রাসূল (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করল- آمَنَّا অর্থাৎ, আমরা ঈমান আনয়ন করেছি। আল্লাহ তায়ালা উত্তরে ইরশাদ করলেন, হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা এখনো ঈমান আনয়ন করনি। সুতরাং তোমরা آمَنَّا (ঈমান আনয়ন করেছি) বলো না, হ্যাঁ তবে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছ সেজন্যে أَسْلَمْنَا (আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম) এ কথা বলতে পার। অতএব এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, ঈমান ও ইসলামের মাঝে সম্পর্ক বিপরীতমুখী।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতগুলোর মাঝের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনে এ জবাব প্রদান করা হয় যে, ইসলাম আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে উভয়টির মর্মার্থ এক ও অভিন্ন। কারণ, অভিধানে ইসলাম বলা হয় প্রকাশ্যভাবে বশ্যতা স্বীকার করাকে, যদিও আত্মিক বিশ্বাস অর্জিত না হয়। আর পারিভাষিক অর্থে ইসলাম বলা হয়-

اَلتَّصْدِيْقُ الْقَلْبِيُّ بِشَرْطِ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ .

অর্থাৎ, মুখে আল্লাহর একত্ববাদ ও নবীজী (স)-এর রিসালাতের কথা স্বীকার করে অন্তরে দৃঢ় ও মজবুতভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা, যা ঈমানেরও মর্মার্থ। সুতরাং প্রথমোক্ত তিনটি আয়াত দ্বারা ঈমান ও ইসলামের পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য, যা পরস্পর এক ও অভিন্ন। আর ৪ নং আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমান ও ইসলামের আভিধানিক অর্থ, যা পরস্পর ভিন্ন ও বিপরীতমুখী। অতএব, শেষোক্ত আয়াতের মর্মার্থ এই যে, নবী (স)-এর দরবারে আগন্তুক বনু আসাদ গোত্রের লোকেরা বাহ্যিক দিক দিয়ে আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করলেও আন্তরিকভাবে তখনো তারা বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল না। এজন্যে মহান আল্লাহ ইরশাদ করলেন যে, তোমরা বাহ্যিকভাবে ইসলামকে প্রকাশ করেছ, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করনি। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা আভিধানিকভাবে ইসলাম ও ঈমানের মাঝে বৈপরীত্ব প্রমাণিত হয়। তবে পারিভাষিক ইসলাম ও পারিভাষিক ঈমানের মাঝে কোনো বিরোধ ও বৈপরীত্ব নেই। (জুমাল)

কাফেরদের সাথে সর্বাবস্থায়
বন্ধুত্ব করা অবৈধ না শুধু ক্ষতির আশঙ্কা হলে?

١. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ
ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً. *

٢. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

٣. يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهٗ مِنْهُمْ.

٤. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ
الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ.

٥. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ.

অনুবাদ

১. মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোনো কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে অনিষ্টের আশঙ্কা কর। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ২৮)

২. হে মুমিনগণ, তোমরা মুমিনদের পরিবর্তে কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (সূরা নিসা : আয়াত ১৪৪)

৩. হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৫১)

৪. হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে ও অন্যান্য কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৫৭)

৫. হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও। (সূরা মুমতাহিনা : আয়াত ১)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা না হলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা বৈধ। কিন্তু শেষোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কাফেরদের সাথে কোনো অবস্থাতেই বন্ধুত্ব স্থাপন করা বৈধ নয়; চাই তাদের পক্ষ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা থাকুক বা নাই থাকুক।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

ক. ১ নং আয়াত দ্বারা রূপক বন্ধুত্ব স্থাপন করা, আর অন্যান্য আয়াতগুলো দ্বারা বাস্তবিক বন্ধুত্ব স্থাপন না করা উদ্দেশ্য। কারণ, বাস্তবিক বন্ধুত্বের স্থান হলো অন্তর। আর অন্তর দিয়ে কাফেরদের ভালোবাসা কোনোকালেই বৈধ নয়। রূপক বন্ধুত্ব বলা হয় মৌখিক কোমল আচরণকে, যা বিভিন্ন আচার-আচরণ ও কাজ-কারবারে তাদের সাথে হয়ে থাকে। সেটা অবৈধ নয়। আর যদি কাফেরদের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলেও তাদের সাথে তোষামোদপূর্ণ আচরণ করা বিধিসম্মত। ফলে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ক্ষতি সাধন করা থেকে বিরত থাকবে। আর যদি কোনো কাফের হেদায়াতের পথে পরিচালিত হওয়ার আশা করা যায়, তাহলেও তার সাথে কোমল আচরণ বৈধ।

খ. ১নং আয়াতটি ইসলামের সূচনাকালের ওপর ভিত্তিশীল। আর শেষোক্ত আয়াতগুলো ইসলামের বিজয়কালের ওপর ভিত্তিশীল। অর্থাৎ, ইসলাম যখন দুর্বল ছিল তখন কাফেরদের ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন শরীয়ত পরিপন্থি ছিল না। কিন্তু যখন ইসলাম ও মুসলমানরা শক্তিশালী হয়ে গেলেন, তখন তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন আর বৈধ থাকল না। বর্তমানেও যদি কোনো অঞ্চলে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু হন এবং কাফেরদের পক্ষ থেকে ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা থাকে, তাহলে সেখানে তাদের সাথে কোমল ও তোষামোদপূর্ণ আচরণ করা বৈধ; অন্যথায় সর্বাবস্থায়ই তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা অবৈধ হয়ে আছে। (জালালাইন)

হযরত যাকারিয়া (আ)-এর সন্তান লাভের নিদর্শন তিন দিন কথা না বলা নাকি তিন রাত?

١. قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا.

٢. قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا.

অনুবাদ

১. তিনি বললেন, হে পালনকর্তা! আমার জন্যে কিছু নিদর্শন দিন। তিনি বললেন, তোমার জন্যে নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারো সাথে কথা বলবে না, তবে ইশারা-ইঙ্গিতে বলতে পারবে। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৪১)

২. সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন রাত মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না। (সূরা মারইয়াম : আয়াত ১০)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত যাকারিয়া (আ)-কে বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর সন্তান লাভের সুসংবাদ প্রদান করলেন, তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট আবেদন করলেন, হে আল্লাহ! আমি তো বার্ধক্যে উপনীত হয়ে গেছি এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। তাহলে আমার স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার নিদর্শন কি হবে একটু বলুন। যাতে আমি বুঝতে পারি যে, আমার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করলেন, তার নিদর্শন হচ্ছে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত লোক সমাজের সাথে কথাবার্তা থেকে বিরত থাকবে। অতএব, আল্লাহ তায়ালা উক্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে ১ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন, তিন দিন কথোপকথন থেকে বিরত থাকবে। আর ২ নং আয়াতে বলেছেন, তিন রাত কথোপকথন থেকে বিরত থাকবে। তাহলে তো উভয় আয়াতে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি হয়।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতদ্বয়ের মাঝে বিরোধ নিরসনকল্পে এ জবাব প্রদান করা হয় যে, এক্ষেত্রে উভয় আয়াতের সমন্বিত অর্থ উদ্দিষ্ট। অর্থাৎ, তিন দিন ও তিন রাত কথোপকথন থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে সন্তান লাভের নিদর্শন। সুতরাং ১ নং আয়াত দ্বারা রাতসহ তিন দিন এবং ২ নং আয়াত দ্বারা দিনসহ রাত উদ্দেশ্য নেয়া যাবে। অবশ্য সূরা আলে ইমরানে দিনের কথা ও সূরা মারইয়ামে রাতের কথা বলার হেকমত হলো, রাত দিনের ওপর অগ্রগামী আর সূরা মারইয়ামও মক্কী হওয়ার কারণে সূরা আলে ইমরানের ওপর অগ্রগামী। অতএব, অগ্রবর্তী সূরাতে অগ্রবর্তী জিনিস রাতকে এবং পশ্চাৎবর্তী সূরাতে পশ্চাৎবর্তী বস্তু দিনকে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এখন আয়াতদ্বয়ের মাঝে আর কোনো বিরোধ নেই। (সাবী)

স্রষ্টা কী শুধু আল্লাহ্ তায়ালা নাকি বান্দাও?

١. أَنِّىٓ أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيْهِ.

٢. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ.

٣. فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

٤. أَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ. *

٥. بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ.

٦. قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

অনুবাদ

১. আমি তোমাদের জন্যে মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরি করে দিই। অতঃপর তাতে ফুৎকার প্রদান করি। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৪৯)

২. আর যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখির প্রতিকৃতির মতো প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে। (সূরা মায়েদা : আয়াত ১১০)

৩. নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়! (সূরা মুমিনূন : আয়াত ১৪)

৪. তোমরা কি বা'ল দেবতার উপাসনা করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে? (সূরা সাফফাত : আয়াত ১২৫)

৫. তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি স্রষ্টা। কীরূপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে, অথচ তাঁর কোনো সঙ্গিনী নেই? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। তিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। আর তিনি সবকিছুর অভিভাবক। (সূরা আনয়াম : ১০২)

৬. বলুন, আল্লাহ্ই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা। আর তিনি একক, পরাক্রমশালী। (সূরা রা'দ : আয়াত ১৬)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : প্রথমোক্ত ৪টি আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, বান্দাও কিছু কিছু বস্তু সৃষ্টি করতে পারে, যেমনিভাবে মুতাযিলা সম্প্রদায় উক্ত মত পোষণ করে।

কারণ, প্রথম দুটি আয়াতে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি মাটি দিয়ে পাখি সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির সম্বোধন হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতিই করা হয়েছে, যিনি আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে একজন। আর ৩ ও ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে– اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে সর্বোত্তম। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ ব্যতীত আরও আছে, তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে সর্বোত্তম। এভাবে ৫ ও ৬ নং আয়াতদ্বয় দ্বারা জানা যায় যে, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, যেমনিভাবে এ মত পোষণ করেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। অতএব, শেষোক্ত আয়াতদ্বয় ও প্রথমোক্ত চারটি আয়াতের মাঝে বাহ্যিক দিক দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে خَلَق শব্দ এসেছে, যার অর্থ اِيْجَاد ও تَكْوِيْن ও হয়। অর্থাৎ, কোনো বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বসম্পন্ন করা। অনুরূপভাবে تَسْوِيَة ও تَصْوِيْر- تَقْدِيْر অর্থেও خَلق শব্দটি ব্যবহার হয়। অর্থাৎ, কোনো বস্তুকে অপর কোনো বস্তুর সদৃশ করে তৈরি করা। প্রথমোক্ত অর্থে خَلق তথা সৃষ্টিকার্য সম্পাদন একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ পারেন না। তবে দ্বিতীয়োক্ত অর্থে বান্দাও বিভিন্ন ধাতু ও উপসর্গের মাধ্যমে কিছু কিছু বস্তুর আকৃতি ও সুরত তৈরি করতে পারেন। সুতরাং প্রথমোক্ত চারটি আয়াত خَلق-এর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর তা এভাবে অনুমান করা যায় যে, সৃষ্টিতো মূলধাতু ও উপসর্গবিহীন হয়, যা আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত কারো সাধ্যের ভিতর নেই। তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি বস্তুসমূহকে কোনো ধাতু ও উপসর্গ ব্যতীত অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের দিকে নিয়ে আসেন। পক্ষান্তরে সুরত বা আকৃতি তৈরি করতে হলে ধাতু ও উপসর্গের প্রতি মুখাপেক্ষী হতে হয়। যেমন হযরত ঈসা (আ) মাটিকে মূলধাতু ও মাধ্যম বানিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করেছেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাতে রূহ বা প্রাণ দান করে বাস্তব পাখিতে রূপান্তরিত করে দেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তায়ালাও ইরশাদ করেন– كَهَيْئَةِ الطَّيْر অর্থাৎ, ঈসা (আ) মূল পাখি সৃষ্টি করতে পারেননি, তবে পাখির আকৃতি তৈরি করেছেন। তারপর ইরশাদ হয়– فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে তাতে রূহ্ প্রদান করে বাস্তব পাখিতে পরিণত করে দেন। আয়াত নং ৩ ও ৪-এর মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ বলেছেন, যার মর্মার্থ اَحْسَنُ الْمُصَوِّرِيْنَ وَالْمُقَدِّرِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আকৃতি ও সুরত তৈরিকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট। আর শেষোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো خَلق-এর দ্বিতীয় অর্থ। অর্থাৎ, اِيْجَاد ও تَكْوِيْن যার মর্মার্থ এই হয় যে, প্রত্যেক বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসার একমাত্র অধিকার রাখেন আল্লাহ্ তায়ালা। উক্ত মহান কাজে কারো কোনো অংশিদারত্ব নেই। অতএব এখন আয়াতগুলোর মাঝে পারস্পরিক বিরোধ মিটে যায়। (রুহুল মাআনী, তাফসীরে খাযেন, মাযহারী ও ইবনে কাসীর)

হযরত আদম (আ) কীসের দ্বারা সৃষ্ট?

١. إِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهٗ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

٢. قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ.

٣. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ.

٤. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ. *

٥. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ. *

٦. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ.

٧. قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ.

٨. قَالَ لَمْ أَكُنْ لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ. *

٩. إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ. *

١٠. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.

অনুবাদ

১. নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাঁকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এবং তারপর তাঁকে বলে ছিলেন, হয়ে যাও। সাথে সাথে হয়ে গেলেন। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৫৯)

২. সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। (সূরা আরাফ : আয়াত ১২)

৩. আর তিনি কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।
(সূরা সাজদা : আয়াত ৭)

৪. যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। (সূরা সোয়াদ : আয়াত ৭১)

৫. আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। (সূরা মুমিনূন : আয়াত ১২)

৬. আমি মানুষকে পচা কর্দম দ্বারা তৈরি বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (সূরা হিজর : আয়াত ২৬)

৭. আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদের বললেন, আমি পচা কর্দম থেকে তৈরি শুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানবজাতির পত্তন করব। (সূরা হিজর : আয়াত ২৮)

৮. সে বলল, আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সেজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরি ঠনঠনে শুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (সূরা হিজর : আয়াত ৩৩)

৯. আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এঁটেল মাটি থেকে। (সূরা সাফফাত : আয়াত ১১)

১০. তিনি মানুষকে পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আর রহমান : আয়াত ১৪)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি কোন বস্তু দ্বারা হয়েছে, এ ব্যাপারে প্রথমোক্ত চারটি আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম (আ)-কে সাধারণ মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

আয়াত নং ৫-এ বলা হয়েছে, মাটির সারাংশ থেকে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আর আয়াত নং ৬, ৭ ও ৮-এ আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরি বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।

আয়াত নং ৯-এ বলেন, আঠালো মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছি এবং আয়াত নং ১০-এ বলেন, পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে পারস্পরিক বিরোধিতার সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতগুলোর মাঝে পারস্পরিক বিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিরসন এভাবে করা যায় যে, উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয় যে, হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি বিভিন্ন দফায় হয়েছিল। সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তায়ালা ভূমণ্ডল থেকে মাটি নিলেন, অতঃপর মাটির সারাংশ ও উত্তমাংশ বের

করে তাতে পানি দিয়ে খামির তৈরি করলেন, ফলে সেটি গন্ধযুক্ত কর্দমে রূপান্তরিত হয়ে গেল। অতঃপর কিছুক্ষণ রেখে দিলে তার বর্ণ ও গন্ধে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। ঠিক তেমনিভাবে হযরত আদম (আ)-এর খামিরকেও কিছুকাল ফেলে রাখা হয়। ফলে সেটি শুষ্ক ঠনঠনে হয়ে যায়। অতঃপর তার দ্বারা হযরত আদম (আ)-এর দেহাবয়ব তৈরি করা হয়। যেমন কোনো মাটির পাত্র বানাবার পূর্বে মাটিগুলোকে পানি দিয়ে নরম করে তা বাতাসে ও বাষ্পে শুষ্ক করা হয়, যার ফলে সেটা শক্ত ও ঠনঠনে হয়ে যায়। অতঃপর আগুনে পোড়ে তাকে মজবুত ও দৃঢ় করা হয়। ঠিক সেভাবেই হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির উপাদানসমূহ অর্থাৎ মাটিকে পানি দিয়ে নরম করে তাকে বাতাসে শুকিয়ে আগুনের তাপ লাগিয়ে মজবুত করা হয়েছে। এজন্যেই বলা হয় যে, মানব সৃষ্টির মূল উপাদান চরটি। আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস। তবে মাটির অংশ বেশি ও তা প্রধান উপাদান হওয়ার কারণে বলা হয় যে, মানবজাতি মাটির দ্বারা তৈরি। যেমনিভাবে মাটির পাত্রকেও চারটি উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়। আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস। মাটিতে পানি মিশিয়ে তা নরম করা হয়, অতঃপর পাত্র বানিয়ে তা বাতাসে শুকিয়ে আগুনে পোড়ে মজবুত করা হয়। কিন্তু উক্ত পাত্রে মাটির অংশ বেশি হওয়ার দরুন তাকে মাটির পাত্রই বলা হয়। আগুন, পানি ও বাতাসের পাত্র বলা হয় না। সুতরাং উপরিউক্ত বর্ণনার সারমর্ম হলো এই যে, আদম (আ)-এর সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রথমোক্ত আয়াতে প্রাথমিক স্তর ও অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ৫ থেকে ৯ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে মধ্যবর্তী স্তরের কথা এবং ১০ নং আয়াতে শেষ স্তরের কথা আলোচিত হয়েছে। অতএব, এখন আয়াতগুলোর মাঝে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। (সাবী, জুমাল)

কাফেরের তওবা কবুল হয় কি না?

١. لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. *

٢. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ.

٣. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْاٰنَ.

অনুবাদ

১. তাদের আজাব হালকাও করা হবে না এবং তারা এতে অবকাশও পাবে না। কিন্তু যারা অতঃপর তওবা করে নেবে এবং সৎকাজ করবে, তারা ব্যতীত। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৮৮-৮৯)

২. যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকৃতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে, কস্মিনকালেও তাদের তওবা কবুল করা হবে না।

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৯০)

৩. আর এমন লোকদের জন্যে ক্ষমা নেই, যারা মন্দকাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার ওপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে, আমি এখন তওবা করছি। (সূরা নিসা : আয়াত ১৮)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেরদের তওবা কবুল হবে। কেননা, আয়াতের মধ্যে তাদের শাস্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা আয়াতের শেষাংশে إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا বলেছেন। অর্থাৎ, যারা

তওবা করে নিজেদের আমল সংশোধন করে নেবে, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।

আয়াত নং ২ ও ৩-এ বলা হয়েছে– لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ অর্থাৎ, কাফেরদের তওবা কখনো কবুল হবে না। অতএব, বাহ্যিক দিক দিয়ে আয়াতগুলোর মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিরসনে নিম্নে দুটি জবাব প্রদান করা হলো–

১. প্রথম আয়াতটি সে সময়ের ওপর ভিত্তিশীল যখন কাফেররা মৃত্যুযন্ত্রণায় পতিত না হয়। অর্থাৎ, কাফেররা মৃত্যুযন্ত্রণায় পতিত হয়ে তওবা করলে তা কবুল হবে না। তবে সে সময়ের পূর্বে তওবা করলে তা কবুল হবে। আর ২ ও ৩ নং আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যখন মৃত্যুকাল এসে যায়, মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয় এবং পরকালের বিভিন্ন জিনিস নজরে আসে। তখন যদি কাফেররা তওবা করে, তাহলে তা কবুল হবে না। যেমন ৩ নং আয়াতে তা প্রকাশ্যভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২. যদি কাফেররা কুফর থেকে তওবা করে এবং ইসলাম কবুল করে, তাহলে তাদের তওবা কবুল হবে। অবশ্য যদি কুফরের ওপর বিদ্যমান থেকে নিজ নিজ কৃত গুনাহসমূহের জন্যে তওবা করে, তাহলে তা কবুল হবে না। কারণ, গুনাহ থেকে তওবা করার জন্যে পূর্বশর্ত হলো ঈমান আনয়ন করা, যা কাফেরদের কাছে নেই। অতএব, ১ নং আয়াত কুফর থেকে তওবা করার ওপর ভিত্তিশীল আর ২ ও ৩ নং আয়াত গুনাহ থেকে তওবা করার ওপর ভিত্তিশীল। (বয়ানুল কুরআন)

আল্লাহ্ তায়ালাকে কতটুকু ভয় করা উচিত?

١۔ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ. *

٢۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا.

অনুবাদ

১. হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্কে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০২)

২. অতএব, তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্কে ভয় করো, শুনো এবং আনুগত্য করো। (সূরা তাগাবুন : আয়াত ১৬)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তায়ালাকে এ পরিমাণ ভয় করো, যে পরিমাণ ভয় করা উচিত। অর্থাৎ, আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য অনুযায়ী তাকে ভয় করতে হবে।

আর ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা তাকওয়া অর্জন করো তোমাদের সাধ্য মোতাবেক। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল। কেননা, ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ্র শান-মান ও বড়ত্ব অনুযায়ী তাকওয়া অর্জন করতে হবে। আর ২ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সাধ্যমতো তাকওয়া হাসিল করতে হবে।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর তিনটি জবাব দেয়া হলো।

ক. ১ নং আয়াতটি ২ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তায়ালা সর্বপ্রথম তাঁর মাহাত্ম্য মোতাবেক তাঁকে ভয় করার আদেশ প্রদান করেছেন। কিন্তু যখন এ নির্দেশ লোকদের ওপর কঠিন ও জটিল অনুভব হতে লাগল তখন আল্লাহ্ তায়ালা তা রহিত করেছেন। সুতরাং আল্লাহকে তাঁর শান অনুযায়ী ভয় করার মর্মার্থ হলো এই যে, বান্দা প্রতিটি মুহূর্তে

আল্লাহর আনুগত্যশীল হতে হবে। নাফরমানিতে লিপ্ত হওয়া বান্দার জন্যে কোনো মুহূর্তেই উচিত নয়। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা পোষণ, জিকির-আজকার ও প্রতিটি কাজে ইনসাফভিত্তিক চালচলন বান্দার জন্যে অপরিহার্য; চাই সেটি পিতা ও পুত্রের মাঝে সংঘটিত হোক না কেন। তবুও নবভী যুগের সাহাবীগণ তাকওয়ার হক আদায় করার জন্যে এমনভাবে ইবাদতে লিপ্ত হয়ে গেলেন যে, নামাযে দাঁড়িয়ে পুরো রাত কেটে যেত। লম্বা কেরাত পড়ার দরুন পা ফুলে যেত। শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটত। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা অবতরণ করলেন– فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের সাধ্য মোতাবেক তাকওয়া অর্জন করো। এ আয়াতটি পূর্বোক্ত আয়াতকে রহিত করার ওপর হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা)-এর একটি বর্ণনাও পাওয়া যায়–

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اِشْتَدَّ عَلَى الْقَوْمِ الْعَمَلُ فَقَامُوْا حَتّٰى وَرِمَتْ عَرَاقِيْبُهُمْ وَتَقَرَّحَتْ جِبَاهُهُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى تَخْفِيْفًا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَنَسِخَتِ الْاٰيَةُ الْاُوْلٰى

(رواه ابن حاتم، روح المعانى)

অর্থ : হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয়, তখন লোকদের ওপর আমল করা ভারী হয়ে গেল। লোকসকল এমনভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করতেন যে, তাদের রগগুলো ফুলে যেত এবং কপাল ক্ষতগ্রস্ত হয়ে যেত। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের ওপর সহজকরণার্থে فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُمْ এ আয়াতটি অবতরণ করেন। যা দ্বারা পূর্বোক্ত আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। (রুহুল মাআনী)

খ. حَقَّ تُقَاتِهٖ-এর মধ্যে حَق শব্দটি ثُبُوْت ও وَجُوْب অর্থে ব্যবহার হয়েছে এবং حَق শব্দটিকে تُقَاتِه-এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে صِفَت (সিফাত)-কে مَوْصُوْف (মাওসূফ)-এর দিকে সম্বন্ধ করার পদ্ধতিতে। অতএব, اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ এ অংশটি মূলত اِتَّقُوا اللّٰه اِتِّقَاءً حَقًّا اَىْ ثَابِتًا وَاجِبًا ছিল। অর্থাৎ, আল্লাহকে এ পরিমাণ ভয় করো, যে পরিমাণ ভয় করা তোমাদের ওপর কর্তব্য ও অপরিহার্য। আর ২ নং আয়াতটি ১ নং

আয়াতের বয়ান তথা বিশ্লেষণকারী হয়। আর বিশ্লেষণকারী ও বিশ্লেষণকৃত বস্তুর মাঝে কোনোরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয় না। (রুহুল মাআনী)

গ. ১ নং আয়াতটি কুফর, শিরক ও আকিদাগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। আর ২ নং আয়াতটি আমলগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং ১ নং আয়াতের মর্মার্থ হলো– কুফর, শিরক ও আকিদাগত বিষয়ে আল্লাহকে এতটুকু ভয় করতে হবে যতটুকু ভয় করা কর্তব্য। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সত্তাকে এক এবং গুণাবলিকে একক বলে সর্বদা বিশ্বাস রাখা। তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে কাউকে শরীক না করা এবং তিনি সমস্ত ত্রুটি ও দোষ থেকে পূত-পবিত্র বলে একিন তথা দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

আর ২ নং আয়াতের মর্মার্থ হলো এই যে, আমলগত বিষয়ে যতটুকু সাধ্যের ভিতর ঠিক ততটুকু আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করা অপরিহার্য। যেমন– যদি কোনো ব্যক্তির অযু করার সাধ্য না থাকে, তাহলে সে তায়াম্মুম করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হবে। আর নামাযে দাঁড়াবার ক্ষমতা না রাখলে বসে নামায আদায় করবে। এ বিশ্লেষণ ও বর্ণনা হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) 'আল-ফাওযুল কাবীর'-এ উল্লেখ করেছেন। (আর-রাওজুন নাজীর শরহে আল ফাওযুল কাবীর)

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে
কতজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়েছেন?

١. إِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِيْنَ. *

٢. يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ. *

٣. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ.

অনুবাদ

১. আপনি যখন মুমিনদের বলতে লাগলেন, তোমাদের জন্যে কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন।

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১২৪)

২. তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার ওপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১২৫)

৩. অতঃপর তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে।

(সূরা আনফাল : আয়াত ৯)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল কম, আর মুশরিকদের সংখ্যা ছিল বেশি। সেজন্যে আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদেরকে ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য করলেন। তবে কতজন ফেরেশতা অবতরণ করে সাহায্য করলেন, সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ১ নং আয়াতে তিন হাজার, ২ নং আয়াতে পাঁচ হাজার ও ৩ নং আয়াতে এক হাজার ফেরেশতা অবতরণের কথা উল্লেখ রয়েছে।

সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনকল্পে এ জবাব প্রদান করা হয় যে, প্রথমত আল্লাহ্ তায়ালা এক হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করার ওয়াদা করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে ফেরেশতাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেন। হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর পাক (স) যখন দেখলেন যে, মুশরিকদের সংখ্যা এক হাজার, আর সাহাবায়ে কেরাম (রা) শুধু তিন শত তেরো জন। তখন তিনি কিবলামুখী হয়ে দোয়া করার জন্যে হাত উত্তোলন করলেন এবং এই দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে যে সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করে দিন। হে আল্লাহ, মুসলমানদের এ জামাত যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ভূপৃষ্ঠে আপনার ইবাদতগুজার বান্দা থাকবে না। অত্যন্ত অনুনয়-বিনয়ের সাথে নবীজী এ দোয়া করেছেন, এমনকি দোয়াকালে তাঁর চাদর মোবারক দেহ থেকে নীচে পড়ে যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) চাদরখানা উঠিয়ে ধরে আরজ করেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করাই যথেষ্ট হয়ে গেছে। আপনি অধিক চিন্তায় নিমগ্ন হবেন না। এখনই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করবেন। অনুরূপভাবে দোয়া কবুল হয় এবং এক হাজার ফেরেশতা পরপর অবতরণ হতে থাকে। এটাই সূরা আনফালের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে–

فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ.

অর্থাৎ, হযরত জিবরাইল (আ) পাঁচ শত ফেরেশতা নিয়ে অবতরণ করে মুসলিম সৈন্যদের ডান পাশে হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে শরীক হয়ে লড়াই করেন এবং পাঁচ শত ফেরেশতা হযরত মিকাঈল (আ)-এর সাথে অবতরণ করে মুসলিম সৈন্যদের বাম পাশে হযরত আলী (রা)-এর সাথে শামিল হয়ে যুদ্ধকার্য পরিচালনা করেন। অতঃপর মুসলমানদের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, মুশরিকদের সাহায্যের জন্যে আরো লোক আসছে। যেমন ইবনে আবী শাইবা ও ইবনে মুনযির হযরত ইমাম শাবী থেকে বর্ণনা করেন, মুসলমানদের নিকট বদর যুদ্ধে এ খবর পৌঁছল যে, কিরয ইবনে জাবের যোদ্ধা মুশরিক সেনাদলের সাহায্য করার ইচ্ছা করেছে। ফলে মুসলমান সৈন্যগণ অস্থির হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় অবতরণ হয়– اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে তিন হাজার ফেরেশতা অবতরণ করার পুনরায়

ওয়াদা করেছেন। সুতরাং মুসলিম সেনাদল হীনবল হওয়ার কোনো কারণ নেই। অনুরূপভাবে আল্লাহর ওয়াদাও পূর্ণ হলো। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, হে মুসলমানগণ! যদি তোমরা কাফেরদের হামলা ও আক্রমণকালে ধৈর্য ও তাকওয়ার ওপর অটল থাকতে পার, তাহলে বিশেষ ইউনিফর্মের সাথে আরো পাঁচ হাজর ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা সাদা পাগড়িবিশিষ্ট পাঁচ হাজার ফেরেশতা মুসলিম সেনাদলের সাহায্যের জন্যে অবতরণ করেন।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার সারাংশ এই হলো যে, প্রথমত এক হাজার ফেরেশতা অবতরণ হয়। তার পর তিন হাজার, তারপর পাঁচ হাজার অবতরণ হয়। সুতরাং সর্বমোট নয় হাজার ফেরেশতার সাহায্য পাওয়া যায়। তবে হযরত হাসান বসরী (র)-এর রেওয়ায়াত অনুসারে সর্বমোট ফেরেশতা অবতরণ হয় পাঁচ হাজার।

প্রথমে ১ হাজার, তারপর দু'হাজার, অতঃপর তৃতীয় দফায় আবার ২ হাজার। আর যদি এ সাহায্যকে উহুদ যুদ্ধের ঘটনার ওপর ভিত্তি করা হয়, তাহলে ফেরেশতা অবতরণের সংখ্যা হবে আট হাজার। কেননা, উহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে শেষোক্ত আয়াত অর্থাৎ, এক হাজার ফেরেশতা কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্তির আয়াতটি প্রযোজ্য নয়। যেমন তাফসীরে খাযেন ও রুহুল মায়ানীতেও উল্লেখ রয়েছে যে, উহুদ যুদ্ধে সর্বমোট আট হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে মুসলিম সেনাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। অতএব, উল্লিখিত বিশ্লেষণ অনুসারে উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারে না।

(রুহুল মাআনী, খাযেন, সাবী, তাফসীরে আবুস সউদ ও বয়ানুল কুরআন)

সব পাপ ক্ষমা হবে না কিছু পাপ?

١. وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ.

٢. إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ.

٣. يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ.

٤. يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

٥. يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ.

٦. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ. *

٧. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অনুবাদ

১. আর যা কিছু আসমানে ও জমিনে রয়েছে, সে সবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১২৯)

২. নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তার সাথে কাউকে শরীক করে। এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সূরা নিসা : আয়াত ১১৬)

৩. তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। (সূরা মায়েদা : আয়াত ১৮)

৪. তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ প্রতিটি বস্তুতে ক্ষমতাবান। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৪০)

৫. তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করেন। তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা আনকাবূত : আয়াত ২১)

৬. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। (সূরা ফাতহ : আয়াত ১৪)

৭. বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা যুমার : আয়াত ৫৩)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং থেকে ৬ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা শিরক ব্যতীত অন্য পাপসমূহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। আর যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে পাপের দরুন পাপীকে শাস্তিও প্রদান করতে পারেন। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা গেল যে, সব পাপের মাগফিরাত অপরিহার্য নয়; বরং কিছু পাপ আল্লাহর ইচ্ছার ওপর মওকুফ আছে। ফলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তার দরুন পাপীকে শাস্তি দিতে পারেন।

আর আয়াত নং ৭ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন। কোনো পাপের কারণে বান্দাকে শাস্তি দেবেন না। কেননা, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, হে আমার সীমালঙ্ঘনকারী বান্দারা! আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. প্রথমোক্ত ছয়টি আয়াত قَبْلَ التَّوْبَةِ-এর ওপর ভিত্তিশীল। আর শেষোক্ত আয়াতটি بَعْدَ التَّوْبَةِ-এর ওপর ভিত্তিশীল। অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তি পাপ থেকে তওবা করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে এবং সে মুশরিক হয়, তাহলে তার জন্যে কোনো ক্ষমা নেই। আর যদি পাপী ঈমানদার হয়, তাহলে তার পাপের ব্যাপারটি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার ওপর মওকুফ থাকবে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তাহলে ক্ষমা করতে পারেন। আর যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে শাস্তিও দিতে পারেন। সুতরাং কাফের ও মুশরিক স্বীয় কুফর ও শিরক থেকে তওবা করে যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে কাফের ও মুশরিক অবস্থায় যে পাপ করেছে, তা সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেয়া হয়। কারণ, إِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ আর পাপী ঈমানদারও যদি কৃত সমস্ত পাপ থেকে তওবা করে এবং তার তওবা শর্ত মোতাবেক হয়, তাহলে আল্লাহ তার সমস্ত পাপও ক্ষমা করে দেন। কোনো পাপের দরুন শাস্তি প্রদান করেন না। (জুমাল)

২. আয়াত নং ৭-এর মধ্যেও إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا-কে لِمَنْ يَّشَاءُ শর্তের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। এর প্রমাণ হলো, হযরত আব্দুল্লাহ (রা)-এর কেরাতে প্রকাশ্যভাবে إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا-এর সাথে لِمَنْ يَّشَاءُ শব্দটি উল্লেখ হয়েছে। অতএব, প্রথমোক্ত ছয় আয়াতের মর্মার্থ যেমনিভাবে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর মওকুফ, তেমনিভাবে শেষোক্ত আয়াতের মর্মার্থও আল্লাহর ইচ্ছার ওপর মওকুফ আছে। এখন আয়াতগুলোর মাঝে আর কোনো বিরোধ বাকি রইল না।

জান্নাত সৃষ্ট না কেয়ামতের পরে সৃষ্টি করা হবে?

১. وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.

২. سَابِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ. *

৩. تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا.

অনুবাদ

১. তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার সীমা হচ্ছে আসমান ও জমিন। যা তৈরি করা হয়েছে পরহেজগারদের জন্যে। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৩৩)

২. তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মতো প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্যে। (সূরা হাদীদ : আয়াত ২১)

৩. এই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। (সূরা কাসাস : আয়াত ৮৩)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : আয়াত নং ১ ও ২-এর মধ্যে জান্নাত সম্পর্কে عدت; (তৈরি করা হয়েছে) অতীতকালীন ক্রিয়ার রূপ ব্যবহার হয়েছে। যদ্দ্বার বোঝা যায় যে, জান্নাত তৈরিকৃত ও সৃষ্ট বস্তু। যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শের অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে আয়াত নং ৩ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, জান্নাত এখন পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি। কেননা, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, এটি আখেরাতের এমন ঘর যা আমি তাদের জন্যে তৈরি করব, যারা দুনিয়াতে অহংকার ও ফাসাদ সৃষ্টি করে না। সুতরাং শেষোক্ত আয়াতটিতে জান্নাত প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। তাই আমরা বলতে পারি যে, জান্নাত এখনো সৃষ্টি হয়নি। আর এ মতটি মুতাযিলা সম্প্রদায় পোষণ করে। অতএব, প্রথমোক্ত দুই আয়াত ও শেষোক্ত আয়াতের মাঝে বিরোধ হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতগুলোর মাঝে বিরোধ নিরসনকল্পে দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. শেষোক্ত আয়াতে نَجْعَلُهَا শব্দটি রূপকার্থে চিরন্তনতা ও চলমানতা বোঝাবার জন্যে ব্যবহার হয়েছে, যার মধ্যে অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সবই বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং শেষোক্ত আয়াতের মর্মার্থ এটাই হবে যে, জান্নাত সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে তা বিদ্যমানও আছে এবং ভবিষ্যতেও বিদ্যমান থাকবে। (নিবরাস)

২. نَجْعَلُهَا শব্দটির ক্রিয়াপদের মূলধাতু جَعَل-এর দুটি অর্থ আছে– خَلق ও تَمْلِيْك; এখানে দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ, تَمْلِيْك অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ হবে এই যে, আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের মালিক বানাবেন তদেরকে, যারা দুনিয়াতে ফাসাদ ও অহংকার সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করেনি। (নিবরাস)

মুমিনদের জন্যে পরকালে লাঞ্ছনা আছে কি?

١. رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ. *

٢. يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ.

অনুবাদ

১. হে আমার পালনকর্তা, তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলে, তাকে সবসময় অপমানিত করলে। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯২)

২. সেদিন আল্লাহ্ নবী ও যারা ঈমান এনেছে, তাদের অপমানিত করবেন না। (সূরা তাহরীম : আয়াত ৮)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তাকে অপমান ও অপদস্থ করবেন। সুতরাং এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, যে গুনাহগার মুমিন জাহান্নামী হবে, সেও অপমান-অপদস্থ হবে। অথচ ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, নবী ও মুমিনদেরকে অপমান-অপদস্থ করা হবে না। অতএব, আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

ক. ১ নং আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা সবসময়ের জন্যে জাহান্নামী অর্থাৎ, যারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে, তারা অপমান ও অপদস্থ হবে। আর চিরকালের জন্যে জাহান্নামী হবে একমাত্র কাফের ও মুশরিকরা। সুতরাং আয়াতটি কাফের ও মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আর ২ নং আয়াতটি মুমিনদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যাদের জন্যে পরকালে কোনো রকম অপমানজনক অবস্থা সৃষ্টি হবে না। এ বিশ্লেষণ অনুযায়ী আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো বিরোধ বাকি থাকে না। (সাবী, রুহুল মাআনী)

খ. আয়াতদ্বয় মানুষের শ্রেণিভেদের ওপর নির্ভরশীল। এভাবে যে, শেষোক্ত আয়াতে آمَنُوا مَعَهُ দ্বারা উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কেরাম, যারা রাসূল (স)-এর সোহবত ও সাহচর্য লাভ করার কারণে পরকালে অপমাণিত হবে না। আর প্রথমোক্ত আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য কাফের ও গুনাহগার মুমিন। সুতরাং এ মর্মার্থ অনুসারেও আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না। (রুহুল মাআনী)

মানুষ একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা রক্ষা করতে সক্ষম কিনা?

١. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. *

٢. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ.

অনুবাদ

১. আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই। (সূরা নিসা : আয়াত ৩)

২. তোমরা কখনো নারীদের সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। (সূরা নিসা : আয়াত ১২৯)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে দুটি, তিনটি বা চারটি স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করে তাদের মাঝে ইনসাফ ও সাম্যবিধান রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করেছেন। সাথে সাথে এটাও ইরশাদ করেছেন– فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً (যদি তোমরা একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা রক্ষা করতে না পার, তাহলে একটি মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে বিধিসম্মত হবে)। এর দ্বারা বোঝা যায়, ইনসাফ ও সমতা রক্ষা করলে একাধিক বিবাহ করতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ২ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক বিবাহ করার মোটেই অনুমতি নেই। কেননা, তাতে অকাট্যভাবে বলা হয়েছে যে, তোমরা একাধিক স্ত্রীর মাঝে কখনো ইনসাফ ও সমতা রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১ নং আয়াতের মধ্যে সেসব বিষয়ে সমতা রক্ষা করতে বলা হয়েছে, যা মানুষের অধিকারভুক্ত। যেমন– ভরণপোষণ ও রাত্রিযাপনে সাম্যবিধান রক্ষা করা অপরিহার্য। অতএব, যদি এ বস্তুগুলোতে সমতা রক্ষার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহলে একাধিক বিবাহ বৈধ। আর যদি তার বিপরীত হয়, তাহলে একাধিক বিবাহের অনুমতি নেই।

আর ২ নং আয়াতে সেসব বিষয়ে সমতা রক্ষা করতে সক্ষম না হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা মানুষের অধিকারভুক্ত নয়। যেমন– ভালোবাসা, আন্তরিক আকর্ষণ ও সঙ্গমের মাঝে সমতা রক্ষা করা মানুষের ইচ্ছা ও অধিকারভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে এ মর্মার্থ ইমাম বায়হাকী হযরত উবায়দা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মুনযির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত স্ত্রীসঙ্গমের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ইবনে আবী শাইবা ও ইবনে জারীর আবু মুলাইকা থেকে বর্ণনা করেন যে, উক্ত আয়াত হযরত আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারে নাযিল হয় যে, হুজুর (স) অন্যান্য স্ত্রীদের তুলনায় হযরত আয়েশা (রা)-কে বেশি ভালোবাসতেন। হযরত আয়েশা (রা) ইরশাদ করেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ يَعْنِى الْقَلْبَ (اَوْ عَنٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا تَمْلِكُ الْمُحَبَّةَ وَ مَيْلَ الْقَلْبِ الْغَيْرَ لِلْاِخْتِيَارِىِّ) رواه احمد وابو داود والترمذى وغيرهم.
روح المعانى. (١٦٣/٥)

অর্থ : নবীজী (স) স্ত্রীদের মাঝে পালা বণ্টন করার সময় সাম্যবিধান রক্ষা করতেন, অতঃপর বলতেন, হে আল্লাহ! এটি আমার বণ্টন সেসব বিষয়ে যা আমার মালিকানাধীন ও অধিকারভুক্ত। অতএব, যে বিষয়ের মালিক আপনি আমি নই অর্থাৎ, আন্তরিক ভালোবাসা, তাতে যদি আমার পক্ষ থেকে বেশকম হয়ে যায়, তাহলে আমাকে পাকড়াও করবেন না। রাসূল (স) مَا تَمْلِكُ শব্দ থেকে ভালোবাসা ও অনিচ্ছাকৃত আন্তরিক আকর্ষণকে উদ্দেশ্য নিতেন।

সুতরাং উক্ত রেওয়ায়াত থেকেও প্রতীয়মান হলো যে, ভালোবাসা, স্ত্রীসঙ্গম ও আন্তরিক আকর্ষণের মাঝে সমতা রক্ষা করা মানুষের ইচ্ছা ও অধিকারভুক্ত নয়। সেজন্যে মানুষকে পাকড়াও করা হবে না। তবে যার একাধিক স্ত্রী আছে, সে এক স্ত্রী ব্যতীত অপরাপর স্ত্রীদেরকে ঝুলন্ত বস্তুর মতো লটকিয়ে রাখলে তার জন্যে তাকে পাকড়াও করা হবে। (রুহুল মাআনী, মাআরেফুল কুরআন)

রিজিকদাতা শুধু আল্লাহ নাকি বান্দাও?

١. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.

٢. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.

٣. وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

٤. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

٥. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. *

٦. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.

অনুবাদ

১. তোমরা তাদের খাওয়াও, পরাও এবং তাদের সান্ত্বনার বাণী শোনাও।
(সূরা নিসা : আয়াত ৫)

২. সম্পদ বণ্টনের সময় যখন আত্মীয়স্বজন, এতিম ও মিসকিন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে সদালাপ করো। (সূরা নিসা : আয়াত ৮)

৩. আমাদের রিজিক দান করুন। আপনি উত্তম রিজিকদাতা।
(সূরা মায়েদা : আয়াত ১১৪)

৪. আল্লাহ সর্বোত্তম রিজিকদাতা। (সূরা হজ্জ : আয়াত ৫৮)

৫. তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিজিকদাতা। (সূরা সাবা : আয়াত ৩৯)

৬. আল্লাহ তায়ালাই তো জীবিকাদাতা, শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।
(সূরা তূর : আয়াত ৫৮)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উক্ত আয়াতগুলোর প্রথম দুটোতে اُرْزُقُوْهُمْ (রিজিক প্রদান করো) বলে সম্বোধন করা হয়েছে বান্দাদের প্রতি। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, বান্দাও রিজিক দান করতে পারে। এভাবে আয়াত নং ৩, ৪ ও ৫-এ আল্লাহ তায়ালার গুণ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা সর্বোত্তম রিজিকদাতা। এর দ্বারাও জানা যাচ্ছে যে, বান্দা রিজিক প্রদান করতে পারে, তবে রিজিক প্রদানে আল্লাহ হলেন উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শেষোক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, রিজিক প্রদানের গুণ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে সীমাবদ্ধ। কেননা, উক্ত আয়াতে ان অব্যয়ের اِسْم (উদ্দেশ্য) ও خَبَر (বিধেয়)-এর মাঝে هُوَ সর্বনাম আনা হয়েছে, যা সীমাবদ্ধতা ও নির্দিষ্টকরণের ওপর নির্দেশনা প্রদান করে। সুতরাং ৬ নং আয়াত ও ১-৫ পর্যন্ত আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১. আল্লাহ ও বান্দার মাঝে রিজিক প্রদানের বিষয়টি ব্যাপক হওয়া রিজিক সৃষ্টির মধ্যে নয়; বরং রিজিক পৌঁছানোর মধ্যে। অর্থাৎ, রিজিক সৃষ্টিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আর সরবরাহকারী আল্লাহও হতে পারেন এবং বান্দাও হতে পারে। সুতরাং রিজিক সৃষ্টি ও সরবরাহের মাঝে পার্থক্য বুঝলে আয়াতগুলোর মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারে না।

২. ব্যাপকতা رَازِقِيَت গুণের মধ্যে, আর সীমাবদ্ধতা ও নির্দিষ্টকরণ হলো رَزَّاقِيَت গুণের মধ্যে, যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে নির্দিষ্ট ও বিশেষিত। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টজগৎকে রিজিক প্রদান করেন এবং তিনি অসীম রিজিক প্রদানের ক্ষমতারও অধিকারী।

পক্ষান্তরে বান্দারা রিজিক প্রদান করতে পারে সীমিত ও স্বল্প, তাই তাদের ব্যাপারে رَازِق (কর্তৃকারক বিশেষ্য) ব্যবহার হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা অসীম রিজিক প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী বিধায় তাঁর শানে مُبَالَغَة-এর রূপ তথা رَزَّاق শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। (সাবী)

ব্যভিচারের শাস্তি কী?

١. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ
يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. *

٢. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. *

٣. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

অনুবাদ

১. আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব করো। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে সংশ্লিষ্টদের গৃহে আবদ্ধ রাখো। যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদের তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্যে অন্য কোনো পথনির্দেশ না করেন। (সূরা নিসা : আয়াত ১৫)

২. তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান করো। অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। (সূরা নিসা : আয়াত ১৬)

৩. ব্যভিচারিণী নারী, ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত করো। (সূরা নূর : আয়াত ২)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, যখন চার সাক্ষ্য দ্বারা ব্যভিচারিণী মহিলার ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তখন তার শাস্তি হবে এটা যে, তাকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হবে; যে পর্যন্ত মৃত্যু তাকে তুলে না নেয়, অথবা আল্লাহ্ তার জন্যে অন্য কোনো পথনির্দেশনা না দেন।

আর ২ নং আয়াত দ্বারা জানা যায়, যে পুরুষ ও মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ, লজ্জা বা প্রহারের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করতে হবে। আর ৩ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে একশটি বেত্রাঘাত করতে হবে– যদি তারা বিবাহিত না হয়। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

ক. ২ নং আয়াত ১ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে, অতঃপর ১ নং আয়াত ৩ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অনুরূপ উক্তি হযরত হাসান বসরী (র) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, সর্বপ্রথম ব্যভিচারের শাস্তি ছিল নিন্দা, তিরস্কার ও লাঞ্ছনা প্রদান করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) জুতা দিয়ে প্রহার করার কথা উল্লেখ করেন এবং তিরস্কার ও ভর্ৎসনা প্রদর্শনের কথাও বর্ণনা করেন। হযরত কাতাদা, মুজাহিদ ও সুদ্দী اِيْذَاء শব্দের তাফসীর তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও নিন্দার মাধ্যমে করে থাকেন। তারপর ব্যভিচারের এ শাস্তির বিধান রহিত হয়ে অপর শাস্তির বিধান বাস্তবায়নের জন্যে ১ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। যার মর্মার্থ পূর্বে উল্লেখ হয়ে ৩ নং আয়াতটি নাযিল হয়। (তাফসীরে মাদারিক ও মাযহারী)

খ. আবু মুসলিম ইস্পাহানী বর্ণনা করেন যে, ১ নং আয়াতটি سَحَّاقَات-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে سَحَّاقَات সে দু'জন মহিলাকে বলা হয়, যারা পরস্পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যৌন উত্তেজনার আকাঙ্ক্ষা মেটায়।

আর ২ নং আয়াত لَوَاطَت তথা সমকামিতার শাস্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ, এ মহাপাপে লিপ্ত পুরুষদেরকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা ও জুতা দিয়ে প্রহার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা অপরিহার্য, যাতে উত্তরসূরিদের কেউ এমন পাপে লিপ্ত না হয়।

এবং ৩ নং আয়াত যেনাকারীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যে, তাদের শাস্তি হলো একশটি বেত্রাঘাত করা, যদি তারা অবিবাহিত হয়। আর যদি বিবাহিত হয়, তাহলে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা শরীয়তসম্মত বিধান। সুতরাং উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর প্রয়োগস্থল যেহেতু ভিন্ন, সেহেতু এগুলোর মাঝে কোনো বিরোধই অবশিষ্ট নেই।

(তাফসীরে কাবীর, রুহুল মাআনী)

উত্তরাধিকার নিকটাত্মীয়দের জন্যে নাকি চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের জন্যে?

١. وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا. *

٢. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

٣. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُهَاجِرِيْنَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوْا إِلٰى أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوْفًا.

অনুবাদ

১. আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছ, তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও। আল্লাহ্ তায়ালা নিঃসন্দেহে সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন। (সূরা নিসা : আয়াত ৩৩)

২. বস্তুত যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশি হকদার। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাবতীয় বিষয়ে সক্ষম ও অবহিত।

৩. আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুসারে আত্মীয়স্বজনগণ পরস্পর অন্যান্য মুমিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ। কিন্তু যদি তোমরা নিজের বন্ধুদের সাথে কোনো সদাচরণ করতে চাও, তবে তা বৈধ। (সূরা আহযাব : আয়াত ৬)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : আয়াতগুলোর মাঝে দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ বুঝতে হলে ভূমিকাস্বরূপ একটি আলোচনা বুঝতে হবে। আর তা হলো এই যে, যদি তোমরা পরস্পর এ অঙ্গীকার কর যে, তোমরা একে অপরের সাহায্যকারী হবে এই মর্মে, যদি তোমাদের মধ্য থেকে কারো ওপর দিয়াত ওয়াজিব হয়, তাহলে অন্যজন তা পরিশোধ করে দেবে এবং কেউ মারা গেলে অন্য ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী হবে। এমন অঙ্গীকার ও চুক্তিকারী উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী হবে। এমন অঙ্গীকার ও চুক্তিকারী ব্যক্তিকে مَوْلَى الْمَوَالَاةِ (মৈত্রী চুক্তিকারী) বলা হয়। সুতরাং এ পদ্ধতির শরয়ী বিধান ১ নং আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মৈত্রী চুক্তিতে অঙ্গীকারবদ্ধ লোকেরা তাদের উত্তরাধিকার লাভ করবে। অর্থাৎ, উত্তরাধিকার বিধান তাদের জন্যে চলমান রয়েছে, ফলে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ প্রদান করতে হবে। কিন্তু শেষোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, উত্তরাধিকার বিধান একমাত্র নিকটাত্মীয়দের জন্যে চলমান আছে; বাকিদের জন্যে নয়। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব দেয়া হলো।

ক. উল্লিখিত ১ নং আয়াতটি শেষোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। জাহেলী যুগে লোকেরা পরস্পর মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হতো এবং তাদের মাঝে উত্তরাধিকার বিধানও জারি হতো। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেহেতু অধিকাংশ লোকের নিকটাত্মীয়গণ মুসলমান ছিলেন না, সেজন্যে এ হুকুম জারি ছিল যে, মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকার তার মিত্রদেরকে দেয়া যাবে। পরবর্তীকালে যখন অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে গেল, তখন হুকুমের মধ্যে কিছু রদবদল হয়ে গেল– এভাবে যে, মিত্রদেরকে সবটুকু মিরাস দেয়া যাবে না। তবে যদি মৃতব্যক্তি অসিয়ত করে, তাহলে একষষ্ঠাংশ প্রদান করা যাবে। এটাকেই প্রথমোক্ত আয়াতের মধ্যে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ .

অর্থ : (আল্লাহ তায়ালা বলেন,) পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্যে আমি উত্তরাধিকারী স্থির করে দিয়েছি এবং যাদের সঙ্গে তোমরা মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছ, তাদেরকে তোমরা তাদের অংশ দিয়ে দাও।

এখানে তাদের অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ষষ্ঠাংশ, যা পরবর্তীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয়োক্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়। (বয়ানুল কুরআন)

হযরত ইবনে জারীর হযরত কাতাদা থেকে উক্ত হুকুম রহিত হওয়া প্রসঙ্গে একটি রেওয়ায়াতও বর্ণনা করেন–

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَيَقُوْلُ دَمِىْ دَمُكَ وَهَدْمِىْ هَدْمُكَ تَرِثُنِىْ وَارِثُكَ وَتَطْلُبُ بِىْ وَاَطْلُبُ بِكَ فَجَعَلَ لَهُ السُّدُسَ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ فِى الْاِسْلَامِ ثُمَّ يُقْسَمُ اَهْلُ الْمِيْرَاثِ مِيْرَاثُهُمْ فَنُسِخَ ذٰلِكَ بَعْدُ فِىْ سُوْرَةِ الْاَنْفَالِ بِقَوْلِهٖ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ. اخرجه ابن جرير وغيره.

(روح المعانى ٥/٢٢)

অর্থ : হযরত কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলী যুগে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হতো– এভাবে যে, যদি কোনো ব্যক্তি আমাকে খুন করে, তাহলে বুঝবে যে, তোমাকে খুন করল। আর যদি আমার ইজ্জত-সম্মান ক্ষুণ্ন করে, তাহলে বুঝবে যে, তোমার ইজ্জত-সম্মান ক্ষুণ্ন করল। এভাবে তুমি আমার উত্তরাধিকার লাভ করবে, আর আমি তোমার উত্তরাধিকার লাভ করব এবং তুমি আমার খুনের প্রতিশোধ নেবে

আর আমি তোমার খুনের প্রতিশোধ নেব। ইসলামের সূচনাকালে এমন মিত্র ব্যক্তিকে মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে একষষ্ঠাংশ প্রদান করা হতো। তারপর বাকি সম্পদ মিরাস লাভের অধিকারীদের মাঝে বণ্টন করা হতো। অতঃপর সূরা আনফালের আয়াত وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ দ্বারা উক্ত হুকুম রহিত করা হয়েছে।

উপরোল্লিখিত আলোচনার সারাংশ হলো এই যে, এখানে ১ নং আয়াতটি (وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ الخ) মানসুখ তথা রহিত। আর ২ ও ৩ নং আয়াতদ্বয় নাসেখ তথা রহিতকারী। আল্লামা কুরতুবীর মতানুসারে প্রথমোক্ত আয়াতের হুকুমকে রহিতকারী হলো তার প্রথমাংশ– وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ এবং আল্লামা সাবী-এর মতে শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ের সাথে রহিতকারী আয়াত হলো তিনটি। সুতরাং এ বিশ্লেষণ মোতাবেক কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি থাকতে পারে না। (রুহুল মাআনী, জুমাল ও সাবী)

খ. ১ নং আয়াতের মধ্যে مَوْلَى الْمَوَالَاةِ (মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ)-কে মিরাসের অংশ প্রদান করার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা সে সময় যখন মৃতব্যক্তির কোনো নিকটাত্মীয় ও মিরাসের হকদার বিদ্যমান না থাকে। এমতাবস্থায় মিরাস পাওয়ার যোগ্য مَوْلَى الْمَوَالَاةِ হবে। আর ২ ও ৩ নং আয়াতদ্বয় ঐ অবস্থার ওপর নির্ভরশীল, যে অবস্থায় মৃতব্যক্তির নিকটাত্মীয় বিদ্যমান থাকে। তখন তারা مَوْلَى الْمَوَالَاةِ-এর ওপর অগ্রগামী হবে মৃতব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে মিরাস লাভ করার জন্যে। এটা এজন্যে যে, ২ ও ৩ নং আয়াতদ্বয় দ্বারা مَوْلَى الْمَوَالَاةِ (মিত্র)-কে মিরাস থেকে বঞ্চিত করার কথা বোঝা যায় না; বরং উক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে– أُولُوا الْأَرْحَامِ তথা নিকটাত্মীয়গণ একে অপরের নিকটতর ও অগ্রগামী। যদ্দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয় যে, যদি কোনো মৃতব্যক্তি নিকটাত্মীয় ও মিত্র রেখে দুনিয়া ত্যাগ করে, তাহলে মিরাস লাভের অধিকারী ও নিকটতর হবে তার নিকটাত্মীয়; মিত্র নয়। এ বর্ণনা হযরত ইমাম আবু হানীফা (র) থেকেও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন তিনি বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো হাতে মুসলমান হয় এবং উভয়জন একে অপরের উত্তরাধিকারী হওয়ার অঙ্গীকার করে, এমতাবস্থায় উভয়জন থেকে কেউ মারা গেল আর কোনো আত্মীয় রেখে গেল না, তাহলে মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকার তার মিত্রই পাবে। এ বিশ্লেষণ অনুসারে ১ নং আয়াতটি রহিত হয় না এবং উল্লিখিত আয়াতগুলোর মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাও সৃষ্টি হয় না। (রুহুল মাআনী)

মুশরিকরা কেয়ামত দিবসে
কোনো কথা গোপন করতে পারবে কি?

١. وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا. *

٢. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ.

অনুবাদ

১. আর তারা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট কোনো কথা গোপন করতে পারবে না। (সূরা নিসা : আয়াত ৪২)

২. অতঃপর তাদের পরিণাম এটা ব্যতীত আর কিছুই হবে না যে, তারা এরূপ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম না। (সূরা আনয়াম : আয়াত ২৪)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : আয়াত নং ১ দ্বারা জানা যায়, যখন আল্লাহ্ তায়ালা কেয়ামত দিবসে মুশরিকদের সম্বোধন করে বলবেন– أَيْنَ شُرَكَائُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ (কোথায় তোমাদের সে অংশিদাররা, যাদের তোমরা আমার অংশিদার মনে করতে?) তখন তারা উত্তরে বলবে– وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ (আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্র শপথ! আমরাতো আপনার সাথে কাউকে শরীক করিনি)। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, মুশরিকরা আল্লাহ্র সামনে শপথের সাথে স্বীয় শিরকের গুনাহ্কে গোপন রাখার চেষ্টা করবে। অতএব, আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয়ের মাঝে বিরোধ নিরসনকল্পে এ জবাব প্রদান করা হয় যে, উল্লিখিত আয়াতদ্বয় সময়ের ভিন্নতার ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, মুশরিকরা প্রাথমিক পর্যায়ে নিজ নিজ শিরকের কথা গোপন করার চেষ্টা করবে এবং এর জন্যে মিথ্যা শপথেরও আশ্রয় নেবে। পরবর্তীতে যখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের জিহ্বার ওপর মহর এঁটে দেবেন এবং তাদের অঙ্গপ্রতঙ্গকে সাক্ষ্য দেয়ার নির্দেশ প্রদান করবেন, তখন তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ শিরক ও কুফরের কথা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেবে।

এমতাবস্থায় তারা কোনো কথা গোপন করতে সক্ষম হবে না। এ বিশ্লেষণটি বুখারী শরীফের একটি রেওয়ায়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয়–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا وَقَوْلُهُ تَعَالٰى وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ اِنَّهُ قَالَ اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ لَمَّا رَأَوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ وَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ وَلَا يَغْفِرُ الشِّرْكَ جَحَدُوْا رَجَاءَ اَنْ يَّغْفِرَ لَهُمْ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ فَيَخْتِمُ اللّٰهُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا. (رواه البخاری وغيره. تفسير مظهری)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আল্লাহ তায়ালার বাণী– وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ও وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ-এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, মুশরিকরা যখন কেয়ামত দিবসে দেখবে, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করছেন, আর মুশরিকদের শিরকের গুনাহ ক্ষমা করছেন না, তখন মুশরিকরা এ আশায় নিজেদের শিরক গোপন করবে যে, আল্লাহ তাদেরকেও ক্ষমা করে দেবেন এবং তারা শপথের সাথে বলবে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহর শপথ! আমরা শিরকের গুনাহ করিনি।

এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাদের জিহ্বার ওপর মহর এঁটে দেবেন এবং তাদের হাত-পা তখন কথা বলতে থাকবে সে কর্ম সম্পর্কে, যা তারা দুনিয়াতে করেছিল। আর সে সময় কাফের, মুশরিক ও নবীজীর নাফরমানরা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, যদি তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হতো। সুতরাং এহেন অবস্থায় তারা কোনো কথাই আল্লাহর সামনে গোপন করতে পারবে না।

এভাবে বুখারী শরীফের মধ্যে আরো একটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে কুরআনের কতেক আয়াতের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন। সেগুলোর মধ্য থেকে উপর্যুক্ত দুটি আয়াতও ছিল। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সে জবাবই প্রদান করলেন, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

(তাফসীরে মাযহারী)

নিয়ামত ও মুসিবত সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে
না মুসিবত বান্দার পক্ষ থেকে হয়?

١. وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ. *

٢. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ.

অনুবাদ

১. আর যদি তাদের কোনো ভালো অবস্থা উপস্থিত হয় তবে বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর যদি তাদের কোনো মন্দ অবস্থা উপস্থিত হয় তবে বলে, এটা আপনার দরুন হয়েছে। আপনি বলে দিন, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। (সূরা নিসা : আয়াত ৭৮)

২. হে মানব! তোমাদের প্রতি যে কোনো মঙ্গল উপস্থিত হয়, সেটা কেবল আল্লাহর পক্ষ হতে! আর যে কোনো অমঙ্গল উপস্থিত হয়, তা তোমাদেরই কারণে হয়ে থাকে। (সূরা নিসা : আয়াত ৭৯)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : মদিনায় যখন মুনাফিকদের উত্তম অবস্থা বিরাজ করতো, তখন তারা বলত, এটি আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে। আর যখন কোনো মুসিবত বা অনুত্তম পরিস্থিতির তারা সম্মুখিন হতো তখন তারা বলত, এটি নবীজী (স)-এর পক্ষ থেকে হয়েছে নাউযুবিল্লাহ! অথচ আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন– قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ (হে নবীজী, ওদেরকে বলুন, নিয়ামত ও মুসিবত সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়)। আমার সেখানে কোনো হাত নেই। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, নিয়ামত ও মুসিবত উভয় বস্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। কিন্তু মুসিবত ও অশান্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় না; বরং বান্দার পক্ষ থেকেই হয়। অতএব আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১ নং আয়াত সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনার ওপর নির্ভরশীল, আর ২ নং আয়াতটি বিস্তারিত আকারে নিয়ামত ও মুসিবতের বর্ণনা প্রদানের ওপর ভিত্তিশীল। এর বিশ্লেষণ এভাবে যে, ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, নিয়ামত ও মুসিবত উভয় বস্তুর সৃষ্টি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। অবশ্য নিয়ামতকে আল্লাহ তায়ালা কোনো মাধ্যম ব্যতীতই স্বীয় অনুগ্রহে বান্দাকে প্রদান করেন এবং মুসিবত বান্দার গুনাহের কারণেই বান্দার ওপর অবতীর্ণ হয়। কিন্তু মাধ্যমসহ বা মাধ্যমবিহীন হওয়ার কথা এ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়নি; বরং قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ বলে তাকে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। ২ নং আয়াতে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে এভাবে যে, যত কল্যাণ ও নিয়ামত তোমাদের অর্জন হয়, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং সেগুলো কোনো মাধ্যম ব্যতীতই আল্লাহর অনুগ্রহের মাধ্যমে বান্দার নিকট পৌঁছে। আর وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ (যত মুসিবত ও অশান্তি তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়, সব তোমাদের গুনাহের দরুন তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়। অতএব, উক্ত আলোচনার সারমর্ম হলো এই যে, মুসিবত ও অশান্তির আগমন বান্দার মন্দ কাজের ফলাফল। যেমন আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন– مَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ (যত মুসিবত তোমাদের অর্জিত হয়, সব তোমাদের হাতের কামাই অথচ আল্লাহ তায়ালা অধিকাংশ ক্ষমা করছেন)। হাদীস শরীফেও এ বিষয়ে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়–

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُصِيْبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا وَمَا دُوْنَهَا اِلَّا بِذَنْبٍ وَمَا يَعْفُوْ اَكْثَرُ.

(رواه الترمذى)

অর্থ : হযরত আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, বান্দাকে যে কোনো ছোট-বড় মুসিবত আক্রমণ করুক না কেন, সেটি বান্দার গুনাহের কারণেই হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তায়ালা অধিকাংশ গুনাহ ক্ষমা করেছেন। (মাযহারী)

আল কুরআনে
কোনো দ্বন্দ্ব বা বিরোধ আছে কি?

١. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. *

٢. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا.

٣. قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ.

অনুবাদ

১. আর যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে হতো, তবে তারা এর মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য পেত। (সূরা নিসা : আয়াত ৮২)

২. সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে, যিনি তাঁর বান্দার ওপর এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এতে একটুও বক্রতা রাখেননি। (সূরা কাহাফ : আয়াত ১)

৩. এটা আরবি কুরআন, যাতে মাত্রই বক্রতা নেই, যেন তারা আল্লাহভীরু হয়। (সূরা যুমার : আয়াত ২৮)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : আয়াত নং ১-এ ইরশাদ হয়েছে যে, যদি এ কুরআন শরীফ আল্লাহ ব্যতীত অন্য লোকের বানানো হতো, তাহলে তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ অনেক হতো। সুতরাং তাতে যেহেতু মতানৈক্য ও বিরোধ বেশি নেই সেহেতু বোঝা গেল, এটি গাইরুল্লাহর কালাম নয়; বরং আসমান থেকে নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ। এ আয়াতে আল কুরআনে বহু ইখতিলাফ ও মতানৈক্য হওয়াকে রহিত করা হয়েছে, যা দ্বারা বোঝা যায় যে, আল কুরআনে বহু মতানৈক্য তো নেই, তবে স্বল্প সংখ্যক মতানৈক্য বিদ্যমান রয়েছে।

পক্ষান্তরে আয়াত নং ২ ও ৩ দ্বারা জানা যায়, আল কুরআনে কোনো প্রকারের ইখতিলাফ ও মতানৈক্য নেই; চাই সেটি স্বল্প হোক অথবা বেশি

হোক। কেননা, উভয় আয়াতের মধ্যে عِوَجٌ শব্দটি نَفْى-এর পরে نَكِرَةٌ (অনির্দিষ্ট অবস্থায়) ব্যবহার হয়েছে, যা সাধারণভাবে নাবোধক হওয়ার উপকারিতা প্রদান করে। অর্থাৎ, আল কুরআনে কমবেশ কোনো প্রকারের বিরোধ ও মতানৈক্য নেই। বাস্তবেও তা-ই। সুতরাং ১ নং আয়াত ও ২ নং আয়াতদ্বয়ের মাঝে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব নিরসন : ১ নং আয়াতে كَثِيْرًا শব্দটির শর্তটি সতর্কতামূলক নয় যে, كَثِيْر (অনেক)-কে রহিত করার দ্বারা قَلِيْل (কম)-এর সত্যায়ন উদ্দেশ্য। كَثِيْرًا-এর শর্তটি এখানে অতি ও ঊর্ধ্বগতির ভিত্তিতে আনা হয়েছে। যার মর্মার্থ হলো এই যে, যদি আল কুরআন গাইরুল্লাহর কালাম হতো, তাহলে তাতে ইখতিলাফ ও মতানৈক্য শুধু কম নয় বেশিই হতো। কিন্তু তাতে মতানৈক্য কম ও বেশ কোনোটাই না থাকার দরুন বোঝা যায় যে, সেটি মানবরচিত গ্রন্থ নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ। সুতরাং এ আয়াত দ্বারাও আল কুরআনে মতানৈক্য না থাকার বিষয়টি সাধারণভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। অতএব, এখন আর উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর মাঝে কোনো বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। (জুমাল, সাবী)

রূহ কবজকারী আল্লাহ তায়ালা
মালাকুল মউত নাকি অন্যান্য ফেরেশতাগণ?

١. إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِىْ أَنفُسِهِمْ.

٢. حَتّٰى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا.

٣. حَتّٰى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ.

٤. وَلَوْ تَرٰى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ.

٥. الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِىْ أَنفُسِهِمْ.

٦. الَّذِيْنَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِيْنَ.

٧. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. *

٨. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُم مَّنْ يُرَدُّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ.

٩. اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا. *

١٠. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ.

অনুবাদ

১. নিশ্চয় ফেরেশতাগণ যখন এমন লোকদের রূহ কবজ করেন, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। (সূরা নিসা : আয়াত ৯৭)

২. এমনকি যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ তার রূহ কবজ করে। (সূরা আনয়াম : আয়াত ৬১)

৩. এমনকি যখন তাদের নিকট আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ তাদের রূহ কবজ করার জন্যে পৌঁছবে। (সূরা আরাফ : আয়াত ৩৭)

৪. আর যদি আপনি দেখতেন, যখন ফেরেশতাগণ এই কাফেরদের জান কবজ করতে থাকে এবং তাদের চেহারায় ও তাদের পিঠে মারতে থাকে এবং এই বলতে থাকে যে, অগ্নির শাস্তি ভোগ করো।

(সূরা আনফাল : আয়াত ৫০)

৫. ফেরেশতাগণ তাদের রূহ কবজ করবেন যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। (সূরা নাহাল : আয়াত ২৮)

৬. ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ এ অবস্থায় বের করেন যে, তারা শিরক হতে পবিত্র থাকে। (সূরা নাহাল : আয়াত ৩২)

৭. তবে তাদের কী অবস্থা হবে, যখন ফেরেশতাগণ তাদের জান কবজ করবেন, আর মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে থাকবেন।

(সূরা মুহাম্মদ : আয়াত ২৭)

৮. আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মৃত্যু দেন। আর তোমাদের মধ্যে কতক লোক এমন রয়েছে যাদের অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। (সূরা নাহাল : আয়াত ৭০)

৯. আল্লাহ আত্মাসমূহকে কবজ করে থাকেন তাদের মৃত্যুকালে।

(সূরা যুমার : ৪২)

১০. আপনি বলে দিন, মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ বের করে থাকেন যিনি তোমাদের ওপর নিযুক্ত রয়েছেন। অতঃপর তোমরা স্বীয় কবরের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা সিজদা : আয়াত ১১)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : আয়াতগুলোর মধ্যে ১ থেকে ৭ নং আয়াত দ্বারা জানা যায়, যখন মানুষের মউত আসে, তখন তার রূহ কবজ করেন কয়েকজন ফেরেশতা। কারণ, আয়াতগুলোতে مَلَآئِكَةُ ও رُسُلُنَا শব্দদ্বয় বহুবচনের সাথে ব্যবহার হয়েছে। আর আয়াত নং ৮ ও ৯ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা নিজেই রূহ কবজ করেন।

আর আয়াত নং ১০ দ্বারা জানা যায়, শুধু মালাকুল মউত একজন ফেরেশতাই রূহ কবজ করে থাকেন। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব দেয়া হলো।

১. মালাকুল মউত রূহ কবজ করেন, আর অন্যান্য ফেরেশতারা তার সহযোগিতা ও আদেশ পালনের কাজে নিয়োজিত থাকেন। আর আল্লাহ তায়ালা রূহকে মানবদেহ থেকে টেনে এনে মালাকুল মউতের হাতে অর্পণ করেন। অতএব রূহ কবজ করার মধ্যে যেহেতু সবাই শরীক থাকেন, সেজন্যে রূহ কবজ করার বিষয়টি কোনো কোনো আয়াতে আল্লাহ তায়ালার প্রতি, আবার কোনো আয়াতে মালাকুল মউতের প্রতি, আবার কোনো আয়াতে অন্যান্য ফেরেশতাদের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে কোনো বিরোধ নেই। (রুহুল বয়ান, জালালাইন : ৩৪৯)

২. রূহ কবজের বিষয়টি লোকদের শ্রেণিভেদের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, কোনো কোনো লোকের রূহ আল্লাহ তায়ালা নিজেই কবজ করেন, আবার কোনো কোনো লোকের রূহ মালাকুল মউত বা অন্যান্য ফেরেশতাগণ কর্তৃক কবজ করিয়ে থাকেন। যেমন পানিতে ডুবে মরা শহীদদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের রূহসমূহ তাদের ইজ্জত-সম্মান রক্ষার্থে আল্লাহ তায়ালা নিজেই কবজ করেন। মালাকুল মউতের হাওলা করেন না।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ ﷛ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الْاَرْوَاحِ اِلَّا شُهَدَاءَ الْبَحْرِ فَاِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَتَوَلّٰى قَبْضَ اَرْوَاحِهِمْ. (رواه ابن ماجه، روح المعانى)

অর্থ : হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা মালাকুল মউত ফেরেশতাকে রূহ কবজ করার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন। কিন্তু পানিতে ডুবে মরা শহীদদের রূহ আল্লাহ তায়ালা নিজেই কবজ করেন। (রুহুল মাআনী)

পাপী ঈমানদার
জাহান্নামে প্রবেশ করবে কি না?

১. إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ. *

২. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى.

অনুবাদ

১. নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না। তা ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন।

(সূরা নিসা : আয়াত ১১৬)

২. এতে কেবল সেই হতভাগ্যই প্রবেশ করবে, যে সত্য ধর্মকে অবিশ্বাস করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (সূরা লাইল : আয়াত ১৫-১৬)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, মুশরিকদের মাগফিরাত তো হবে না, কিন্তু তারা ব্যতীত পাপী ঈমানদারদের আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে শাস্তিও প্রদান করতে পারেন, আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

আর ২ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, জাহান্নামে শুধু ঈমানবিমুখ ও মিথ্যারোপকারী হতভাগা কাফেররাই প্রবেশ করবে; আর কেউ নয়। কারণ, উক্ত আয়াতটি نَفْى ও اِسْتِثْنَاء-এর সাথে পরিবেষ্টিত, যা حَصَر বা সীমাবদ্ধতার ফায়দা প্রদান করে থাকে। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, পাপী ঈমানদার জাহান্নামে প্রবেশই করবে না।

আর ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে প্রবেশ করবে। সুতরাং উভয় আয়াতের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতদ্বয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে এ জবাব প্রদান করা হয় যে, ২ নং আয়াতের মধ্যে জাহান্নামে প্রবেশ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সব সময়ের জন্যে জাহান্নামে প্রবেশ করা। অর্থাৎ, সবসময়ের জন্যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে একমাত্র কাফের ও মুশরিকরা; অন্যরা নয়। যদিও গুনাহগার মুমিনরা আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক জাহান্নামে প্রবেশ করে, কিন্তু কিছুকাল শাস্তি ভোগ করার পর তারা সেখান থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। সুতরাং এখন আর আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। (জালালাইন)

যাবতীয় সম্মান আল্লাহর জন্যে
না রাসূল (স) ও মুমিনদের জন্যেও?

১. أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا.

২. إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

৩. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. *

৪. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ

১. তারা কি তাদের (কাফেরদের) নিকট সম্মানিত হয়ে থাকতে চায়? বস্তুত সমস্ত সম্মান আল্লাহরই অধিকারে। (সূরা নিসা : আয়াত ১৩৯)

২. সকল ক্ষমতা (সম্মান) আল্লাহরই জন্যে নিবেদিত। তিনি শুনেন, জানেন। (সূরা ইউনুস : আয়াত ৬৫)

৩. যে ব্যক্তি সম্মান লাভ করতে চায়, তবে যাবতীয় সম্মান আল্লাহর জন্যে। (সূরা ফাতির : আয়াত ১০)

৪. প্রকৃত সম্মান আল্লাহর জন্যে রয়েছে এবং তাঁর রাসূলগণের এবং মুসলমানদের জন্যে। (সূরা মুনাফিকূন : আয়াত ৮)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১, ২ ও ৩ নং আয়াত দ্বারা জানা যায়, যাবতীয় ইজ্জত-সম্মান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে নির্ধারিত। আর ৪নং আয়াত দ্বারা জানা যায়, ইজ্জত-সম্মান তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণের জন্যেই নির্দিষ্ট। সুতরাং শেষোক্ত আয়াতটি প্রথমোক্ত তিনটি আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতগুলোর মাঝে দ্বন্দ্ব নিরসনে এ জবাব প্রদান করা হয় যে, প্রথম তিনটি আয়াতের মধ্যে ইজ্জত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইজ্জত বিয-যাত ও বেলা ওয়াসিতা। অর্থাৎ, মৌলিক ও মাধ্যমবিহীন যাবতীয় ইজ্জত আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত। আর আয়াত নং ৪-এ রাসূল (স) ও মুমিনদের জন্যে যে ইজ্জতের কথা বলা হয়েছে, তা হলো উপায় ও উপকরণ দ্বারা অর্জিত ইজ্জত। সুতরাং এ বিশ্লেষণ অনুসারে আর কোনো বিরোধই বাকি থাকে না। সারকথা হলো উপায় ও উপকরণবিহীন দুনিয়া ও আখেরাতের বাস্তব ও মৌলিক যাবতীয় ইজ্জত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে। তবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তাঁর নৈকট্যলাভের মধ্য দিয়ে রাসূল (স)-এর এ ইজ্জত লাভ হয়। অতঃপর রাসূল (স)-এর অনুসরণের মাধ্যমে এ ইজ্জত মুমিনদেরও অর্জিত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি ইজ্জত-সম্মান অর্জন করতে চায়, সে যেন রাসূল (স)-এর অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে।

অযুতে পা ধৌত করা ওয়াজিব না মাসেহ করা?

١. وَامۡسَحُوۡا بِرُءُوۡسِكُمۡ وَاَرۡجُلَكُمۡ اِلَى الۡكَعۡبَيۡنِ. *

٢. وَامۡسَحُوۡا بِرُءُوۡسِكُمۡ وَاَرۡجُلِكُمۡ اِلَى الۡكَعۡبَيۡنِ.

অনুবাদ

১. আর নিজেদের মাথাসমূহ মাসেহ করো এবং নিজেদের পাসমূহ টাখনুসহ ধৌত করো। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৬)

২. আর নিজেদের মাথাসমূহ মাসেহ করো এবং নিজেদের পাসমূহ সহ (بِالْكَسْرِ) (সূরা মায়েদা : আয়াত ৬)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : কুরআন পাকের একাধিক কেরাত একাধিক আয়াতের সমকক্ষ। অতএব, যেমনিভাবে এক আয়াত অপর আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, ঠিক তেমনিভাবে এক কেরাতও অপর কেরাতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতের মধ্যে وَاَرْجُلَكُمْ শব্দটির ব্যাপারেও বর্ণনাকারীদের থেকে দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। হযরত নাফে, ইবনে আমের, কিসায়ী, ইয়াকুব ও হাফস (র)-এর কেরাতের মধ্যে اَرْجُلَكُمْ (بِنَصْبِ اللَّام) শব্দটির لام অক্ষরটি যেরের সাথে ব্যবহার হয়েছে। এ কেরাত অনুসারে اَرْجُلَكُمْ-এর عطف হয় وُجُوْهَكُمْ শব্দের ওপর। তখন আয়াতের মর্মার্থ হয়– وَاغْسِلُوْا اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ (তোমরা তোমাদের পাগুলোকে টাখনুসহ ধৌত করো)। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, অযুতে পা ধৌত করা ফরয। আর দ্বিতীয়োক্ত কেরাত অনুসারে اَرْجُلِكُم শব্দের عطف হয় رُؤُوْسَكُمْ-এর ওপর। অর্থাৎ– وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ ও وَامْسَحُوْا بِاَرْجُلِكُمْ (তোমরা তোমাদের মাথা ও পাগুলোকে মাসেহ করো।) এ কেরাত দ্বারা বোঝা যায় যে, অযুতে পা মাসেহ করা ফরয। অতএব, উল্লিখিত আয়াতের উভয় কেরাতের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. উক্ত আয়াতের উভয় কেরাত সময়ের বিভিন্নতার ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, পা যখন চামড়ার মোজা দ্বারা আবৃত থাকবে না, তখন যবর বা যেরবিশিষ্ট কেরাত অর্থাৎ, মাসেহ করার হুকুমটি প্রযোজ্য হবে। সুতরাং সময় ও অবস্থার বিভিন্নতার ওপর উভয় কেরাতের হুকুম রাখা হলে আর কোনো বিরোধই বাকি থাকে না। (রূহুল মাআনী)

২. দ্বিতীয় কেরাত প্রথম কেরাত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, ইসলামের সূচনাকালে অযুতে পা মাসেহ করার হুকুমটি বহাল ছিল। পরবর্তীকালে তা রহিত হয়ে যায়। (জুমাল, রূহুল মাআনী)

আহলে কিতাবের
ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা ওয়াজিব না ইচ্ছাধীন?

١۔ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. *

٢۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ.

٣۔ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ.

অনুবাদ

১. অতএব, তারা যদি আপনার নিকট আসে, আপনি তাদের মাঝে মীমাংসা করুন কিংবা তাদের থেকে বিরত থাকেন। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৪২)

২. অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহর অবধারিত এ কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করুন। আর তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেন না। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৮)

৩. আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে এ প্রেরিত কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবেন এবং তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেন না। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৯)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : আয়াত নং ১-এ ইরশাদ হয়েছে, যদি আহলে কিতাব আপনার (নবীজীর) নিকট তাদের ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা করার জন্যে আসে, তাহলে আপনার এখতিয়ার রয়েছে যে, যদি আপনি তাদের বিবাদের মীমাংসা করেন, তাহলে তা আপনি করতে পারবেন। আর যদি মীমাংসার কাজ থেকে বিমুখ থাকতে চান, তাও আপনার জন্যে সংগত রয়েছে। তবে মীমাংসা করলে তা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে হতে হবে। আর আয়াত নং ২ ও ৩-এ ইরশাদ হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত আইনকানুন মোতাবেক ফয়সালা করবেন। তাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার অনুকরণ করবেন না।

সুতরাং ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, আহলে কিতাবের বিবাদের মাঝে ফয়সালা করা-না করা নবীজীর ইচ্ছাধীন। আর ২ ও ৩ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, ফয়সালা করা ওয়াজিব। ফয়সালার কার্জ থেকে বিমুখ

থাকার কোনো অধিকারই নেই। অতএব, আয়াতগুলোর মাঝে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

ক. ১ নং আয়াত ২ ও ৩ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, ইসলামের প্রথম যুগে আহলে কিতাবের ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা করা-না করা নবীজীর এখতিয়ারাধীন ছিল। পরবর্তীকালে এ হুকুম রহিত হয়ে ফয়সালা করাকে ওয়াজিব ও অত্যাবশ্যক করে দেয়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, আতা, মুজাহিদ ও সুদ্দী থেকেও এমনটা বর্ণিত আছে। ইমাম আবু জাফর ও কাজী বায়যাভী ইমাম আবু হানীফা (র) থেকেও এ মত বর্ণনা করেন যে, আহলে কিতাব ও জিম্মীদের ঝগড়া-বিবাদ ইসলামী বিধি মোতাবেক ফয়সালা করা অপরিহার্য। ফয়সালা থেকে বিমুখ হয়ে তাদের শাসকের নিকট সোপর্দ করা বৈধ নয়। এটা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বিশুদ্ধ মত। (বয়ানুল কুরআন, রুহুল মাআনী, জালালাইন)

খ. আয়াতগুলোর মর্মার্থ লোকদের শ্রেণিভেদের ওপর ভিত্তিশীল। অর্থাৎ, ১ নং আয়াতের হুকুম ওদের জন্যে প্রযোজ্য যারা জিম্মী নয়। আর ২ ও ৩ নং আয়াতের হুকুম জিম্মীদের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, জিম্মীদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও উত্তরাধিকারের মীমাংসা ইসলামী আইনকানুন মোতাবেক হতে হবে। তবে মদ ও শূকরের ক্রয়-বিক্রয়ের ফয়সালা তাদের ধর্মীয় বিধান মোতাবেক হবে। (রুহুল মাআনী)

আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার ওয়াজিব নাকি স্বীয় ইসলাহই যথেষ্ট?

١. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. *

٢. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً.

অনুবাদ

১. হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের নিজেদের সংশোধন করার চেষ্টা করো। তোমরা যখন হেদায়াতপ্রাপ্ত হলে, পথভ্রষ্ট লোকেরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। (সূরা মায়েদা : আয়াত ১০৫)

২. আর তোমরা এরূপ ফেতনা থেকে বেঁচে থাকো, যা কেবল জালেমদের ওপরই পতিত হবে না। (সূরা আনফাল : আয়াত ২৫)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা করো। অর্থাৎ, তোমাদের ওপর নিজ নিজ ইসলাহ ও সংশোধন অপরিহার্য। যখন তোমরা সৎপথের সন্ধান পাবে, তখন পথহারা লোকেরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, মুমিনদের ওপর নিজ নিজ ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য। অন্যদেরকে ইসলাহ করা, সৎকাজের নির্দেশ প্রদান করা ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করা অপরিহার্য নয়। আর ২ নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে যে, তোমরা সে শাস্তিকে ভয় করো, যা বিশেষভাবে কোনো অত্যাচারী বা গুনাহগারদেরকে প্রদান করা হয় না; বরং ঐ নেককার লোকদেরকে প্রদান করা হয়, যারা গুনাহগারদেরকে গুনাহ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে না। ওয়াজ-নসীহত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে লোকদের বারণ করে না।

সুতরাং এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, মুমিনগণ নিজে শুধু সংশোধন হলে চলবে না; বরং অন্যকে সংশোধন করার জন্যে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করতে হবে।

অতএব, উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

ক. ১ নং আয়াতে اهتديتم اذا-এর اهتداء শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার। অর্থাৎ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা। হযরত হুযাইফা ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব থেকে اهتداء শব্দের এ তাফসীরই বর্ণিত আছে। সুতরাং اهتداء-এর পূর্ণতা ঐ সময় হয়, যখন মানুষ আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব আদায় করে। এ তাফসীর অনুসারে ১ নং আয়াত দ্বারা আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার তরক করা প্রতীয়মান হয় না। কেননা, তখন আয়াতের মর্মার্থ এটা হয় যে, যখন তোমরা নিজ নিজ ইসলাহ করে নাও এবং অন্যদেরকে আমর বিল মারূপ ও নাহী আনিল মুনকার করতে থাক, তখন কোনো লোকের পথভ্রষ্টতা ও পাপাচার দ্বারা তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন হবে না। অতএব এর দ্বারা বোঝা গেল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধির সাথে সাথে আমর বিল মারূফ, নাহি আনিল মুনকার ও অন্যদেরকে ইসলাহ করাও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এ বিশ্লেষণ অনুসারে ১ নং আয়াত ২ নং আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় না; বরং উভয়ের মর্মার্থ এক ও অভিন্ন হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খোতবা দ্বারাও উল্লিখিত আলোচনার দৃঢ়তা বোঝা যায়–

عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ ﷺ قَالَ صَعَدَ اَبُوْ بَكْرٍ ﷺ مِنْبَرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ لَتَتْلُوْنَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ وَتَعِدُّوْنَهَا رُخْصَةً وَاللّٰهِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ كِتَابِهٖ اَشَدَّ مِنْهَا يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ اَلْآيَة وَاللّٰهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيَعُمَّنَّكُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهُ بِعِقَابٍ.

(اخرجه ابن جرير، روح المعانى ٤٥/٨)

অর্থ : হযরত কায়েস ইবনে আবী হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) রাসূল (স)-এর মিম্বরের ওপর আরোহণ করে খোতবা দিতে গিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন, হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর কিতাবের এ আয়াত– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ তেলাওয়াত করছ, আর তাকে আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার তরক করার অনুমতি মনে করছ।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কিতাবে এর চাইতে কঠিন কোনো আয়াত অবতরণ করেননি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্যই অবশ্যই 'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার' করতে থাক; নচেৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমনকারী শাস্তি তোমাদের ওপর ব্যাপক হয়ে যাবে।

সুতরাং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর এ খোতবা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ এক ও অভিন্ন।

খ. 'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার' তরক করার অনুমতি রয়েছে সে সময়, যখন উক্ত কাজ করতে গিয়ে ফেতনা-ফাসাদে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা হয়। এমতাবস্থায় মানুষ নিজে নিজে নেক আমল করতে থাকবে। অন্যকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যখন ফেতনা-ফাসাদে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তখন 'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার' ওয়াজিব ও অপরিহার্য বলে বিবেচ্য হবে। সুতরাং দুই আয়াত দুই অবস্থার ওপর ভিত্তিশীল। অতএব এ পদ্ধতিতেও আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো বিরোধ বাকি থাকে না।

অসিয়তের ব্যাপারে সাক্ষীগণ মুসলমান হওয়া আবশ্যক
নাকি কাফেররাও সাক্ষী হতে পারে?

١. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.

٢. وَأَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ.

অনুবাদ

১. হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়পরায়ণ দু'জনকে সাক্ষী রেখো। অথবা তোমরা ব্যতীত অন্যদের মধ্য থেকে দু'জনকে।
(সূরা মায়েদা : আয়াত ১০৬)

২. তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়পরায়ণ দু'ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করো। (সূরা আত-তালাক : আয়াত ০২)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা জানা যায়, যদি কোনো মুসলমান মরণকালে কাউকে নিজ মাল সোপর্দ করে, তাহলে দু'জন ইনসাফগার ব্যক্তিকে সাক্ষীরূপে গ্রহণ করবে। কিন্তু সাক্ষীদ্বয় মুসলমান হওয়া জরুরি নয়। যদি ভ্রমণ ইত্যাদিতে মুসলমান পাওয়া না যায়, তাহলে অমুসলিম ব্যক্তিকেও সাক্ষীরূপে গ্রহণ করতে পারবে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ বলেছেন। অর্থাৎ, তোমাদের মুসলমানদের মধ্য থেকে দু'জন ইনসাফাগার সাক্ষী অথবা তোমরা ব্যতীত অমুসলিমদের থেকে দু'জন সাক্ষী গ্রহণ করা উচিত ও উত্তম হবে।

আর ২ নং আয়াত দ্বারা জানা যায়, সাক্ষীদ্বয় মুসলমান হওয়া অপরিহার্য। অতএব, আয়াতদ্বয়ের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

ক. ১ নং আয়াত ২ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল, তখন বিশেষ করে ভ্রমণ অবস্থায় অমুসলিমদেরকে সাক্ষী বানানোর অনুমতি প্রদান করা হয়। অতঃপর তা রহিত হয়ে শুধু মুসলমানদের থেকে সাক্ষী গ্রহণ করার বিধান আরোপ করা হয়। (তাফসীরে আবুস সঊদ, আল-ফাওযুল কাবীর)

খ. ১ নং আয়াতের মধ্যে مِنْكُمْ ও مِنْ غَيْرِكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مِنْ اَقَارِبِكُمْ ও مِنْ غَيْرِ اَقَارِبِكُمْ অর্থাৎ, সাক্ষীদ্বয় মুসলমান হওয়া তো অবশ্যই অত্যাবশ্যক, তবে নিকটাত্মীয় হওয়া অপরিহার্য নয়; বরং যদি আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে সাক্ষী পাওয়া না যায়, তাহলে অনাত্মীয়কেও সাক্ষীরূপে গ্রহণ করতে পারবে। এ তাফসীর হযরত হাসান বসরী, ইকরিমা ও ইমাম যুহরী থেকেও বর্ণিত হয়েছে। (রূহুল মাআনী, আল-ফাওযুল কাবীর)

আল্লাহ্ তায়ালা কি কাফেরদের সাহায্যকারী?

١. ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ.

٢. وَرُدُّوْا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ. *

٣. ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَأَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ.

অনুবাদ

১. অতঃপর তাদেরকে তাদের সত্যিকার প্রভু আল্লাহর নিকট পৌছানো হবে।
(সূরা আনয়াম : আয়াত ৬২)

২. এবং তারা আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে, যিনি তাদের প্রকৃত মালিক। আর তাদের কাছ থেকে দূরে যেতে থাকবে, যা তারা মিথ্যা বানাত।
(সূরা ইউনুস : আয়াত ৩০)

৩. এটি এজন্যে যে, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। আর কাফেরদের কোনো অভিভাবক নেই। (সূরা মুহাম্মদ : আয়াত ১১)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতের মধ্যে رُدُّوْا (فِعْل) ক্রিয়াপদের فَاعِل-এর সর্বনামটি মাখলুকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, যার মধ্যে মুমিন ও কাফের সব শামিল রয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে এই যে, সমস্ত (সৃষ্ট) মাখলুককে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে, যিনি তাদের প্রকৃত অভিভাবক।

আর ২ নং আয়াতখানা কাফেরদের সম্পর্কে আলোচিত। অতএব এ দুই আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা মুমিন ও কাফের উভয় দলের মাওলা ও সাহায্যকারী।

তবে ৩ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা শুধু মুমিনদের মাওলা ও সাহায্যকারী। কাফেরদের কোনো মাওলা ও সাহায্যকারী নেই। সুতরাং ৩ নং আয়াতটি প্রথমোক্ত আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : প্রথম ২ আয়াতে মাওলা অর্থ মালিক ও সৃষ্টিকর্তা। আর ৩ নং আয়াতে মাওলা অর্থ সাহায্যকারী। সুতরাং বোঝা গেল, আল্লাহ্ তায়ালা মুমিন ও কাফের উভয় দলের সৃষ্টিকর্তা, তবে তিনি মুমিন ব্যতীত আর কাউকে সাহায্য ও মদদ করেন না। (জুমাল)

তাবলীগে রিসালাতের ওপর
পারিশ্রমিক দাবি করা নিষিদ্ধ না অনুমোদিত?

١. قُلْ لَّآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْعَالَمِيْنَ.

٢. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَّتَّخِذَ إِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا.

٣. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ.

٤. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ.

٥. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ. *

٦. قُلْ لَّآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى.

অনুবাদ

১. বলুন, আমি তোমাদের নিকট এর ওপর কোনো বিনিময় চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্যে একটি উপদেশ মাত্র। (সূরা আনয়াম : আয়াত ৯০)

২. বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর কোনো বিনিময় চাই না। কিন্তু যে ইচ্ছা করে, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (সূরা ফুরকান : আয়াত ৫৭)

৩. বলুন, আমি তোমাদের নিকট বিনিময় হিসেবে যা কিছু চাই, মূলত তা তোমাদেরই জন্যে। আমার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর নিকট। (সূরা সাবা : আয়াত ৪৭)

৪. বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আর আমি লৌকিকতাকারীও নই। (সূরা সোয়াদ : আয়াত ৮৬)

৫. তবে কি আপনি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চান যে, তাদের ওপর ঋণের বোঝা চেপে বসে। (সূরা তূর : আয়াত ৪০)

৬. বলুন, আমি এর ওপর তোমাদের নিকট আত্মীয়তার সৌহার্দ ব্যতীত কোনো বিনিময় চাই না। (সূরা শূরা : আয়াত ২৩)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে ১ থেকে ৫ নং পর্যন্ত আয়াতগুলোতে ইরশাদ হয়েছে যে, নবীজী (স) তাবলীগে রিসালাত ও ঈমানের দাওয়াতের ওপর কারো থেকে কোনো প্রকারের পারিশ্রমিক ও প্রতিদানের কামনা করতে পারবেন না।

কিন্তু ৬ নং আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে যে, আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার প্রতিদান চাই না, তবে اَلْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى কামনা করছি। অর্থাৎ, তোমাদের কাছে কেবল আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্য চাই। সুতরাং এ আয়াতে اِسْتِثْنَاء করা হয়েছে اَجْرًا শব্দ থেকে। আর اِسْتِثْنَاء-এর মধ্যে আসল হলো اِتِّصَال তথা مُسْتَثْنٰى পদটি مُسْتَثْنٰى مِنْه-এর মধ্যে শামিল থাকা এবং তার সমজাতীয় বস্তু থেকে হওয়া। অতএব এর দ্বারা অত্যাবশ্যক হয় যে, مَوَدَّةً فِى الْقُرْبٰى (আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্য)-ও প্রতিদান ও পারিশ্রমিকের মধ্যে শামিল থাকা এবং তার সমজাতীয় হওয়া। তাহলে আয়াতের মর্মার্থ হবে, আমি তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান কামনা করি না, কিন্তু এই প্রতিদান যে, তোমরা আমার প্রতি আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্য রক্ষা করবে। অতএব এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, তাবলীগে রিসালাতের এক প্রকার প্রতিদান তথা مَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى-এর আবেদন ও অন্বেষণ অনুমোদনযোগ্য। ফলে এ আয়াতটি উপর্যুক্ত পাঁচটি আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যায়।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى-এর মধ্যে اِسْتِثْنَاء-টি مُنْقَطَع অর্থাৎ, তা مُسْتَثْنٰى مِنْه-এর অন্তর্ভুক্ত ও তার সমজাতীয় নয়; বরং لا। শব্দটি এখানে لٰكِن-এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا-এর ওপর বাক্যটি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى এটি আরেকটি পরিপূর্ণ বাক্য। অতএব আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, তোমরা আমার রিসালাতকে স্বীকৃতি দাও এবং নিজেদের সৌভাগ্য ও সাফল্যের জন্যে আমার আনুগত্য করো। তোমরা এটা না করলে আমার কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু আমার একটি মানবিক ও পারিবারিক হকও রয়েছে, যা তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমাদের অধিকাংশ গোত্রে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মীয়তার অধিকার ও আত্মীয়বাৎসল্যের প্রয়োজন তোমরা অস্বীকার কর না। অতএব আমি তোমাদের থেকে

তাবলীগে রিসালাতের বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, তবে এটুকু চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ রাখবে। মানা-না মানা তোমাদের ইচ্ছাধীন। কিন্তু শত্রুতা প্রদর্শনে তো কমপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত। অতএব مَوَدَّةً فِى الْقُرْبٰى তাবলীগে রিসালাতের বিনিময়ে প্রতিদানও নয় এবং ৬ নং আয়াতটি প্রথমোক্ত ৫ আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বীও নয়। (সাবী, মাআরেফুল কুরআন)

২. হযরত যাহহাক ও হোসাইন ইবনে ফজল (র) বলেন, শেষোক্ত আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। আয়াতটি মূলত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। যখন মক্কার মুশরিকরা নবীজী (স)-কে কষ্ট দিতে আরম্ভ করল, তখন আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত অবতরণ করে নবীজী (স)-কে ফরমালেন যে, হে নবীজী! আপনি মক্কার কাফেরদের বলুন, আমি তোমাদের কাছে দীনের প্রচার ও তাবলীগে রিসালাতের ওপর কোনো প্রতিদান চাই না। কিন্তু এতটুকু চাই যে, তোমরা আমার সাথে ভালোবাসা ও আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্য রক্ষা করবে। সুতরাং যেহেতু তোমাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, সেহেতু তোমরা আমাকে তাবলীগে রিসালাতের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিবে না। অতঃপর যখন হুজুর (স) হিজরত করে মদিনায় তাশরীফ নিয়ে আসেন, তখন আনসার সাহাবীদের সাথে হুজুর (স)-এর ভালোবাসা ও সাহায্য-সহানুভূতির মোয়ামালা চলতে থাকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অন্যান্য নবীদের সাথে সম্পৃক্ত করতে চাইলেন এভাবে যে, যেমনিভাবে পূর্ববর্তী নবীগণ তাবলীগে রিসালাতের ওপর কোনো প্রকার প্রতিদান কামনা করেননি (সম্পদের মাধ্যমেও নয়, আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্য রক্ষার মাধ্যমেও নয়), ঠিক তেমনিভাবে আপনিও তাদের মতো কোনোরূপ প্রতিদান কামনা করবেন না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতরণ করেন, যা উল্লিখিত ৬ নং আয়াতের হুকুমকে রহিতকারী।

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ.

অতএব রহিত করার বিষয়টির ওপর জ্ঞাত হওয়ার পর আয়াতগুলোর মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি থাকে না। (তাফসীরে খাযেন)

আল্লাহ তায়ালার দর্শন হবে কি?

١. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

٢. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. *

٣. كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ.

অনুবাদ

১. দৃষ্টিসমূহ তাকে পেতে পারে না। অথচ তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ। (সূরা আনয়াম : আয়াত ১০৩)

২. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা স্বীয় পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সূরা কিয়ামা : আয়াত ২২-২৩)

৩. কখনো না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তা থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। (সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত ১৫)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে যে, দৃষ্টিসমূহ আল্লাহ তায়ালাকে পাবে না। এর দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ তায়ালার দর্শন হবে না। অথচ ২ নং ও ৩ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালাকে দর্শন করা যাবে। কেননা, ২ নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন অনেক মুখমণ্ডল সজীব ও প্রফুল্ল হবে। তারা স্বীয় পালনকর্তাকে দেখতে পারবে। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, মুমিনগণ কেয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবেন এবং তাঁকে দেখবেন। আর ৩ নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ হয় যে, কেয়ামতের দিন কাফেররা আল্লাহকে দেখার গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকবে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মুমিনগণ আল্লাহকে দেখার গৌরব থেকে বঞ্চিত হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, আল্লাহর দীদার থেকে মাহরূম হওয়ার একমাত্র কারণ হলো কুফর। ইমাম মালেক (র) বলেন, যদি কেয়ামত দিবসে মুমিনগণ আল্লাহকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ না করে, তাহলে কাফেরদেরকে আল্লাহর দীদার থেকে বঞ্চিত করার কথা বলে লজ্জা প্রদর্শন করা হতো না। কাফেরদেরকে আল্লাহ সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত করার কথা বলে লজ্জা প্রদান করাই হচ্ছে এ কথার দলীল যে, মুমিনগণ কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালাকে দেখবেন। (তাফসীরে খাযেন)

সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াতের সাথে শেষোক্ত দুই আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর তিনটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. আল্লাহ তায়ালাকে না দেখার বিষয়টি দুনিয়ার জন্যে নির্ধারিত। অর্থাৎ, পার্থিব জীবনে মুমিনগণও আল্লাহকে দেখবেন না, যা ১ নং আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়। অবশ্য আখেরাতের মধ্যে আল্লাহর দর্শন লাভ করা মুমিনগণের জন্যে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, যা শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ের يَوْمَئِذٍ শব্দ দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে– لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ فِى الدُّنْيَا وَهُوَ يَرٰى فِى الْاٰخِرَةِ অর্থ : দৃষ্টিসমূহ আল্লাহকে দুনিয়াতে পাবে না, তবে তাকে আখেরাতে পাওয়া যাবে। সুতরাং দেখা-না দেখার স্থান সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর আয়াতগুলোর মাঝে আর কোনো বিরোধ বাকি থাকে না।

(তাফসীরে খাযেন)

২. কেয়ামত দিবসে আল্লাহকে দর্শন করা তার অনুমতির ওপর নির্ভরশীল থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা অনুমতি প্রদান করবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত দৃষ্টিসমূহ আল্লাহকে দেখবে না। অতএব ১ নং আয়াতে আল্লাহকে না দেখার বিষয়টি অনুমতি পাওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের ওপর ভিত্তিশীল। আর ২ ও ৩ নং আয়াতদ্বয়ের হুকুম অনুমতি পাওয়ার পরবর্তীকালের ওপর নির্ভরশীল। অতএব এখন আর কোনো বিরোধ নেই। (রূহুল মাআনী)

৩. উল্লিখিত আয়াতগুলোর মর্মার্থ লোকদের শ্রেণিভেদের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, প্রথমোক্ত আয়াতটি কাফেরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ যে, তাদের দৃষ্টিসমূহ স্বীয় পালনকর্তাকে দেখার গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকবে। আর শেষোক্ত আয়াতদ্বয় মুমিনগণের সুসংবাদ প্রদানে অবতীর্ণ। অর্থাৎ, তারা কেয়ামত দিবসে স্ব স্ব দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হবে। এ বিশ্লেষণ হিসেবেও আয়াতগুলোর মাঝে আর কোনো বিরোধ বাকি থাকে না। (হাশিয়ায়ে জালালাইন : পৃষ্ঠা ১২২)

গুনাহের শাস্তি কি
তদনুরূপ মিলবে না অতিরিক্ত?

١. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰى إِلَّا مِثْلَهَا.

٢. وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا.

٣. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰى إِلَّا مِثْلَهَا.

٤. وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ. *

٥. يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ.

٦. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অনুবাদ

১. আর যে মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। (সূরা আনয়াম : আয়াত ১৬০)

২. আর যারা মন্দ কাজ করে, মন্দ কাজের বিনিময় তার সমপরিমাণ। (সূরা ইউনুস : আয়াত ২৭)

৩. যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করে, তাকে সে পরিমাণই বদলা দেয়া হবে। (সূরা মুমিন : আয়াত ৪০)

৪. আর মন্দের বিনিময়ে তার সমপরিমাণ মন্দ, তবে যে ক্ষমা করে এবং আপস করে। (সূরা শূরা : আয়াত ৪০)

৫. তাদের জন্যে শাস্তিকে দ্বিগুণ করা হবে । তারা শুনতেও পেত না এবং দেখতেও পেত না। (সূরা হূদ : আয়াত ২০)

৬. কেয়ামতের দিন তার আজাব দ্বিগুণ করে দেয়া হবে। (সূরা ফুরকান : আয়াত ৬৯)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ থেকে ৪ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, গুনাহের শাস্তি তদনুরূপ প্রদান করা হবে।

কিন্তু ৫ ও ৬ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, গুনাহের শাস্তি তার চেয়ে অতিরিক্ত দেয়া হবে। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : পাপ ও শাস্তির সাদৃশ্য পরিমাণের দিক দিয়ে হয়ে থাকে। আর শাস্তির আধিক্য অবস্থার দিক দিয়ে হয়। অতএব যখন দুটি পরস্পরবিরোধী বস্তুর দিক পরিবর্তন হয়ে যায়, তখন আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং এর সারমর্ম হলো এই যে, একটি গুনাহের শাস্তি পরিমাণ ও সংখ্যার দিক দিয়ে সমান হবে। এমনটা নয় যে, একটি পাপকে দুটি পাপে পরিণত করে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে। অবশ্য অবস্থার দিক দিয়ে একটি পাপের শাস্তি অনেক কঠোর হয়ে যাবে। (বয়ানুল কুরআন)

পাপীরা কি কেয়ামত দিবসে শুধু
নিজ পাপের বোঝা বহন করবে না অন্যদেরও?

١. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى.

٢. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى.

٣. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى.

٤. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى.

٥. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى. *

٦. لِيَحْمِلُوْا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

٧. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ.

অনুবাদ

১. কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। (সূরা আনয়াম : আয়াত ১৬৪)

২. কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ১৫)

৩. কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। (সূরা ফাত্বির : আয়াত ১৮)

৪. কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। (সূরা যুমার : আয়াত ০৭)

৫. কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। (সূরা নাজম : আয়াত ৩৮)

৬. যাতে তারা কেয়ামত দিবসে পরিপূর্ণরূপে তাদের পাপের বোঝা এবং সে সব লোকের পাপের বোঝা বহন করে, যাদেরকে তারা অজ্ঞতাহেতু পথভ্রষ্ট করেছে। (সূরা নাহাল : আয়াত ২৫)

৭. আর অবশ্যই তারা বহন করবে তাদের পাপের বোঝা, এবং নিজেদের পাপের বোঝার সাথে আরো বোঝাসমূহ। (সূরা আনকাবূত : আয়াত ১৩)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : প্রথমোক্ত ৫টি আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, পাপীদের শুধু নিজ পাপের বোঝা বহন করতে হবে; অন্যদের বোঝা নয়।

আর শেষোক্ত আয়াত ২টি দ্বারা বোঝা যায় যে, পাপীদের নিজেদের পাপের বোঝা বহন করার সাথে সাথে অন্যদের পাপের বোঝাও বহন করতে হবে। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে বাহ্যিক দিক দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : প্রথমোক্ত ৫টি আয়াত তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ, যারা নিজে পাপ করে, তবে অন্যদেরকে পাপ করার ওপর উৎসাহিত করে না। এমন লোক নিজ পাপের বোঝা নিজে বহন করবে।

আর শেষোক্ত আয়াতদ্বয় তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ, যারা নিজেও পথভ্রষ্ট এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করে। এমন লোকের নিজেদের পাপের বোঝা বহন করার সাথে সাথে অন্যদের পাপের বোঝাও বহন করতে হবে। কেননা, অপরকে পথভ্রষ্ট করা যেহেতু পথভ্রষ্টকারীর নিজের কর্ম, সেহেতু সে কর্মের পাপের বোঝাও পথভ্রষ্টকারীর নিজেকেই বহন করতে হবে। অতএব এ বিশ্লেষণ মোতাবেক প্রথমোক্ত ৫ আয়াত ও শেষোক্ত ২ আয়াতের মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি থাকে না। (বয়ানুল কুরআন, সাবী)

কেয়ামত দিবসে
লোকদেরকে প্রশ্ন করা হবে কি?

١. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.

٢. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

٣. تَاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ.

٤. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

٥. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ.

٦. سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. *

٧. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ.

٨. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ.

অনুবাদ

১. অতএব, আমি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করব, যাদের নিকট রাসূল প্রেরিত হয়েছিল, এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব রাসূলগণকে।
(সূরা আরাফ : আয়াত ০৬)

২. অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। (সূরা হিজর : আয়াত ৯২-৯৩)

৩. আল্লাহর শপথ! অবশ্যই তোমরা সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে যে বিষয়ে তোমরা মিথ্যা রটনা করতে। (সূরা নাহাল : আয়াত ৫৬)

৪. আর অবশ্যই তোমরা তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।
(সূরা নাহাল : আয়াত ৯৩)

৫. এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা সাফফাত : আয়াত ২৪)

৬. তাদের দাবি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(সূরা যুখরুফ : আয়াত ১৯)

৭. আর পাপিষ্ঠদের তাদের পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

(সূরা কাসাস : আয়াত ৭৮)

৮. সেদিন জিন বা মানুষ কেউই তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না।

(সূরা আর-রহমান : আয়াত ৩৯)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : প্রথমোক্ত ৬টি আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, কেয়ামত দিবসে লোকদেরকে তাদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

আর শেষোক্ত ২টি আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, কোনো প্রশ্ন করা হবে না। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. আয়াতগুলো সময়ের বিভিন্নতার ওপর ভিত্তিশীল। কেয়ামত দিবসটি বহু দীর্ঘ হবে। তাতে এমন একটি মুহূর্ত আসবে, তখন কাউকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। আবার এমন একটি মুহূর্ত আসবে, তখন কেউ জিজ্ঞাসিত হওয়া থেকে মুক্তও থাকবে না। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে কোনো বিরোধ নেই। (জালালাইন শরীফ)

২. আয়াতগুলো স্থানের বিভিন্নতার ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, কেয়ামত দিবসে লোকসকল এমন একটি স্থানে পৌঁছবে, যেখানে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। পক্ষান্তরে আরেকটি স্থান এমন মিলবে, যাকে হিসাবের স্থান বলা হয়। সেখানে সমস্ত লোক প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। হযরত ইকরিমা ও কাতাদা থেকে এ তাফসীরই বর্ণিত রয়েছে। (রূহুল মাআনী)

কাফেরদের দোয়া কি কবুল হয়?

١. قَالَ أَنْظِرْنِيْ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ. *

٢. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلَالٍ.

٣. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلَالٍ.

অনুবাদ

১. সে বলল, আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, নিশ্চয় তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো। (সূরা আরাফ : আয়াত ১৪-১৫)

২. কাফেরদের সকল আহ্বানই ব্যর্থতার। (সূরা রা'দ : আয়াত ১৪)

৩. কাফেরদের সকল আহ্বানই কেবল ব্যর্থতার। (সূরা মুমিন : আয়াত ৫০)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, কাফেরদের দোয়া কবুল হয়। কেননা, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের সরদার অভিশপ্ত ইবলিসের দোয়া কবুল করেছেন। ইবলিস দোয়া করেছিল– رَبِّ اَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ (হে পালনকর্তা, আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত হায়াত দান করুন)। আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করে বলেছিলেন– اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ (নিশ্চয় তোমাকে কেয়ামত পর্যন্ত হায়াত দেয়া গেল)। সুতরাং ইবলিসের দোয়া যেহেতু কবুল করা হয়েছে, সেহেতু তার অধীনস্থ কাফেরদের দোয়া অবশ্যই কবুল করা হবে। আবু নসর দাবূসী ও অন্যান্য ফিকহবিদগণেরও এ উক্তি বর্ণিত আছে।

আর দ্বিতীয়োক্ত আয়াত ২টি দ্বারা জানা যায় যে, কাফেরদের দোয়া কবুল হয় না। তাদের দোয়া বেকার ও অনর্থক। কেননা, আয়াতদ্বয়ে ضَلَال থেকে উদ্দেশ্য হলো বেকার ও বাতিল হওয়া। অতএব আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

ক. শেষোক্ত ২টি আয়াতে দোয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মূর্তিসমূহের নিকট দোয়া প্রার্থনা করা। যদি কাফেররা আল্লাহর কাছে দোয়া করে, তাহলে তা কবুল হয়। আর যদি মূর্তিসমূহের কাছে দোয়া করে, তাহলে তা বেকার ও অনর্থক হয়ে যায়। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে কোনো বিরোধ নেই। (রূহুল মাআনী)

খ. ১ নং আয়াতে পার্থিব জীবনের কর্ম সম্পর্কে দোয়া করা উদ্দেশ্য। আর শেষোক্ত আয়াত ২টিতে পরকালীন বিষয় সম্পর্কে দোয়া করা উদ্দেশ্য। সুতরাং যদি কাফেররা দুনিয়াবি জিনিস সম্পর্কে আল্লাহর নিকট দোয়া করে, তাহলে তা কবুল হয়। আর পরকালীন কোনো বিষয়ে দোয়া করলে তা কবুল হয় না। (রূহুল মাআনী)

আসমান-জমিনের সৃষ্টি কি
ছয় দিনে হয়েছে না আট দিনে?

١. إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ.

٢. إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ.

٣. وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ.

٤. اَلَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ.

٥. اَللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ.

٦. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ.

٧. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ. *

٨. قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْأَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ أَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا أَقْوَاتَهَا فِىْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ.

অনুবাদ

১. নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ সেই সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। (সূরা আরাফ : আয়াত ৫৪)

২. নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ সেই সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। (সূরা ইউনুস : আয়াত ০৩)

৩. তিনি সেই সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। (সূরা হূদ : আয়াত ০৭)

৪. যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। (সূরা ফুরকান : আয়াত ৫৯)

৫. আল্লাহ্ সেই সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। (সূরা সাজদা : আয়াত ০৪)

৬. আর আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। আর তাতে আমাকে স্পর্শ করেনি কোনো ক্লান্তি। (সূরা কাফ : আয়াত ৩৮)

৭. তিনি সেই সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। (সূরা হাদীদ : আয়াত ০৪)

৮. বলুন, তোমরা কি সেই সত্তাকে অস্বীকার কর, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে, এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থির কর? তিনিই সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। তিনি পৃথিবীতে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন। তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন– পূর্ণ হলো জিজ্ঞাসুদের জন্যে। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন, যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ। অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো– ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুই দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন। (সূরা হা-মীম সাজদা : আয়াত ৯-১২)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : প্রথমোক্ত ৭টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা আসমান, জমিন ও এতদুভয়ের মাঝে সৃষ্ট বস্তুসমূহকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।

আর ৮ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আট দিনে সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপভাবে ৮ নং আয়াতে ইরশাদ হয় যে, দুই দিনে জমিন সৃষ্টি, চার দিনে পাহাড় ও খাদ্যসামগ্রী সৃষ্টি এবং দুই দিনে সপ্তাকাশ সৃষ্টি হয়। সুতরাং শেষোক্ত আয়াতটি প্রথমোক্ত আয়াতগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ৮ নং আয়াতে فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّام শব্দের اَرْبَعَةَ اَيَّام-এর শুরুতে تَمَام শব্দটি مُضَاف হিসেবে উহ্য আছে। অর্থাৎ, فِىْ تَتِمَّةِ اَرْبَعَةِ اَيَّام যেমনিভাবে আল্লামা যাজ্জাজ এ কথার বিশ্লেষণ করেছেন। অর্থাৎ, জমিন ও পর্বতমালা চার দিনে সৃষ্টি হয়েছে এভাবে যে, দুই দিনে জমিন ও দুই দিনে পর্বতমালা সৃষ্টি হয়েছে। অতএব পূর্ণ চার দিন হলো। এটাকে আল্লাহ তায়ালা এভাবে ইরশাদ করেছেন যে, দুই দিনে জমিন ও চার দিনে পবর্তমালা এবং খাদ্যসামগ্রী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এটা এমন পর্যায়ের হয়ে গেল যে, যেমনিভাবে পরিভাষায় বলা হয়– سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلىٰ بَغْدَادَ فِىْ عَشْرَةٍ وَالْكُوْفَةِ فِىْ خَمْسَ عَشْرَةَ অর্থ : আমি বসরা থেকে দশ দিনে বাগদাদে পৌঁছলাম এবং পনেরো দিনে কুফা নগরে পৌঁছলাম। এর অর্থ এ নয় যে, কুফা নগরে পৌঁছতে পনরো দিন অতিবাহিত হয়েছে; বরং এর মর্মার্থ হলো এই যে, বাগদাদ শহরে পৌঁছতে ১০ দিন ও কূফা নগরে পৌঁছতে ৫ দিন সর্বমোট পনেরো দিন ব্যয় হয়। (তাফসীরে মাদারিক)

অথবা ৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালার বর্ণিত উক্তিটি এ পর্যায়ের হয়ে গেল যে, যেমনিভাবে বলা হয়, শিশুটি দুই বছরে দুধপান বন্ধ করেছে এবং চার বছরে মকতবে পড়তে গেছে। এ কথার অর্থ এ নয় যে, দুগ্ধপানে দুই বছর বাদ দিয়ে বাকি চার বছর পর মকতবে পড়াশুনা করতে গেছে; বরং উদ্দেশ্য হলো, দুগ্ধপানের দুবছর অতিবাহিত হওয়ার পর শিশুটি যখন চার বছর বয়স সমাপ্ত করে, তখন মকতবে যায়। সুতরাং উল্লিখিত ৮ নং আয়াতেও জমিন সৃষ্টির দুদিন পর্বতমালা ও খাদ্যসামগ্রী সৃষ্টির চার দিনের মধ্যে শামিল ও উদ্দিষ্ট হবে। (বয়ানুল কুরআন)

লূত (আ)-এর নসীহতের জবাবে
তাঁর কওম কী উত্তর দিয়েছিল?

١. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ إِلَّآ أَنْ قَالُوْٓا أَخْرِجُوْهُمْ.

٢. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ إِلَّآ أَنْ قَالُوْٓا أَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ. *

٣. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ إِلَّآ أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ.

অনুবাদ

১. তাঁর সম্প্রদায়ের এ ছাড়া কোনো উত্তর ছিল না যে, তারা বলল, এদের বের করে দাও। (সূরা আরাফ : আয়াত ৮২)

২. তাঁর সম্প্রদায়ের এ ছাড়া কোনো উত্তর ছিল না যে, তারা বলল, লূতের পরিবারকে বের করে দাও। (সূরা নামল : আয়াত ৫৬)

৩. অতঃপর তাঁর সম্প্রদায়ের এ ছাড়া কোনো উত্তর ছিল না যে, তারা বলল, তুমি আমাদের জন্যে আল্লাহর আজাব নিয়ে এসো। (সূরা আনকাবূত : আয়াত ২৯)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : প্রথমোক্ত ২টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যখন হযরত লূত (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে নসীহত করছিলেন এবং সমকামিতার মতো মহাপাপ থেকে বাধা প্রদান করছিলেন, তখন সম্প্রদায়ের শুধু এ উত্তর ছিল যে, হযরত লূত (আ) ও তার পরিবার-পরিজনকে এলাকা থেকে বের করে দাও। এটা ব্যতীত আর কোনো উত্তর তাদের ছিল না।

কিন্তু ৩ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, তাদের উত্তর শুধু এটা ছিল, যদি আপনি সত্যবাদী হন, তাহলে আমাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি অবতরণ করিয়ে দিন। এটা ব্যতীত অপর কোনো উত্তর তাদের পক্ষ থেকে ছিল না। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. এ দ্বন্দ্ব ইখতিলাফে জমান তথা কাল বা সময়ের বিভিন্নতার ওপর ভিত্তিশীল। তবে তার পদ্ধতি হলো এই যে, যখন হযরত লূত (আ) কওমকে নসীহত করতেন, তখন তারা হযরত লূত (আ)-কে শুধু এ উত্তর দিত যে– ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ অর্থ : যদি তুমি সত্যবাদী হও, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি নিয়ে এসো। আর যখন তারা পরস্পর পরামর্শ করতে বসত, তখন তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতো যে, হযরত লূত (আ)-কে কী করতে হবে? তখন তাদের উত্তর শুধুমাত্র এটি ছিল যে– اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ অর্থ : তোমরা তাকে ও তার পরিবারবর্গকে এলাকা থেকে বের করে দাও। নিশ্চয় তারা পবিত্র মানুষ সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াত ২টি পরামর্শকালীন সময়ের ওপর ভিত্তিশীল। আর শেষোক্ত আয়াত লূত (আ)-এর নসীহতকালীন সময়ের ওপর নির্ভরশীল। (রূহুল মাআনী)

২. লোকদের শ্রেণিভেদের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, উল্লিখিত দুটি উত্তর থেকে একটি উত্তর কওমের শাসক ও নেতারাই দিত এভাবে যে– ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ আর অপরটি প্রদান করতো কওমের সাধারণ লোকেরা– اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ (রূহুল মাআনী)

ছামুদ সম্প্রদায়ের ওপর
কোন শাস্তি এসেছিল?

١. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. *

٢. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.

٣. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.

٤. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ.

٥. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. *

٦. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُودَ.

٧. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ.

٨. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ.

অনুবাদ

১. অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করল ভূমিকম্প। ফলে তারা উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় নিজ নিজ গৃহে সকাল করল।

(সূরা আরাফ : আয়াত ৭৮)

২. আর যারা জুলুম করেছে, তাদেরকে পাকড়াও করল বিকট আওয়াজ। ফলে তারা উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় নিজ নিজ গৃহে সকাল করল।

(সূরা হূদ : আয়াত ৬৭)

৩. অতঃপর তাদেরকে ভোর বেলায় পাকড়াও করল বিকট আওয়াজ।

(সূরা হিজর : আয়াত ৮৩)

৪. আমি তাদের প্রতি একটি মাত্র নিনাদ প্রেরণ করেছিলাম। এতেই তারা শুষ্ক শাখাপল্লব নির্মিত দলিত খোয়াড়ের ন্যায় হয়ে গেল।

(সূরা ক্বামার : আয়াত ৩১)

৫. আর ছামুদ জাতি তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে বজ্র দ্বারা। (সূরা হাক্কাহ : আয়াত ০৫)

৬. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠিন আজাব সম্পর্কে আদ ও ছামুদের আজাবের মতো। (সূরা হা-মীম সাজদা : আয়াত ১৩)

৭. অতঃপর তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর কঠিন আজাব পাকড়াও করল। (সূরা হা-মীম সাজদা : আয়াত ১৭)

৮. অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করল কঠিন আজাব– এমতাবস্থায় যে, তারা তাকিয়ে রইল। (সূরা যারিয়াত : আয়াত ৪৪)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে ছামুদ সম্প্রদায়ের ওপর শাস্তি আগমনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু শাস্তির প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য কি ছিল, এ নিয়ে আয়াতগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়।

১ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, ওদেরকে رَجْفَة দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। رَجْفَة অর্থ– কঠিন ভূমিকম্প।

আর ২, ৩, ৪ ও ৫ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, صَيْحَة ও طَاغِيَة দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। صَيْحَة ও طَاغِيَة বলা হয় কঠোর আওয়াজকে।

এবং ৬, ৭ ও ৮ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, صَاعِقَة দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করা হয়। আর صَاعِقَة বলা হয় আকাশের বিদ্যুৎ চমককে। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনকল্পে এ জবাব প্রদান করা হয় যে, ছামুদ সম্প্রদায়ের ওপর যখন শাস্তি অবতীর্ণ হয়, তখন সর্বপ্রথম হযরত জিবরাঈল (আ) আকাশ থেকে খুব জোরে আওয়াজ করলেন। ফলে জমিনে ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়, যার দরুন ছামুদ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের এ ধ্বংসযজ্ঞকে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করতে গিয়ে কোথাও رَجْفَة আবার কোথাও صَيْحَة আবার কোথাও صَاعِقَة দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন। ৫ নং আয়াতে طَاغِيَة শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ সীমাতিরিক্ত। যেহেতু তাদের শাস্তি সীমাতিরিক্ত ছিল, সেজন্যে আয়াতে طَاغِيَة শব্দের ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং এখন কোনো বিরোধ নেই।

হযরত শুয়াইব (আ)-এর কওম কোন আজাবে ধ্বংস হয়?

١. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. *

٢. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ.

٣. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. *

٤. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ.

অনুবাদ

১. অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করল বজ্রনাদ। ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় অবস্থায় সকাল করল। (সূরা আরাফ : আয়াত ৯১)

২. অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ফলে তাদেরকে পাকড়াও করল বজ্রনিনাদ। (সূরা আনকাবূত : আয়াত ৩৭)

৩. আর যারা জুলুম করল তাদেরকে পাকড়াও করল বজ্রধ্বনি। ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হওয়া অবস্থায় সকাল করল। (সূরা হূদ : আয়াত ৯৪)

৪. ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আজাব পাকড়াও করল। (সূরা শুআরা : আয়াত ১৮৯)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : এ আয়াতগুলোর মধ্যে হযরত শুয়াইব (আ)-এর কওমের ওপর অবতীর্ণ শাস্তির কথা আলোচনা হয়েছে। তবে শাস্তির প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আয়াতগুলো পরস্পরবিরোধী।

আয়াত নং ১ ও ২-এর মধ্যে رَجْفَة তথা কঠিন ভূকম্পনের কথা উল্লেখ করা রয়েছে।

আয়াত নং ৩-এর মধ্যে নিকট আওয়াজের কথা উল্লেখ আছে।

আর আয়াত নং ৪-এর মধ্যে يَوْمِ الظُّلَّة অর্থাৎ, ছায়ার মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের কথা উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এখানেও সে বিশ্লেষণ চলবে, যা পূর্বে কওমে ছামুদের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) সর্বপ্রথম বিকট আওয়াজ দিলেন। ফলে জমিনের কম্পন আরম্ভ হয়ে গেল, যার দরুন লোকেরা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো।

প্রথম দুই আয়াতে سَبَب قَرِيْب তথা ভূমিকম্পের আলোচনা করা হয়েছে।

তিন নং আয়াতে سَبَب بَعِيْد তথা বিকট আওয়াজের আলোচনা করা হয়েছে। এবং ৪ নং আয়াতে ছায়ার মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা হযরত শুয়াইব (আ)-এর অপর সম্প্রদায় আসহাবে আইকার ওপর নিপতিত হয়।

হযরত কাতাদা (র) ইরশাদ করেন যে, হযরত শুয়াইব (আ)-কে আসহাবে আইকা ও মাদইয়ানের অধিবাসী উভয় গোত্রের নিকট নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। মাদইয়ান এলাকার অধিবাসী লোকেরা বিকট আওয়াজ ও কঠিন ভূমিকম্পের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আর আসহাবে আইকাকে ظُلَّة (ছায়া)-এর মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়। এখানে ظُلَّة অর্থ ছায়া। আর ছায়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মেঘমালার ছায়া, যা আগুন হয়ে তাদের ওপর বর্ষণ হতে লাগল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আসহাবে আইকার ওপর আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত উষ্ণতা অবতরণ করতে লাগলেন। যার ফলে তাদের শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো এবং তারা স্বীয় গৃহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে লাগল। সাথে সাথে উষ্ণতাও তাদের গৃহে ঢুকতে শুরু করল। তখন তারা নিজ নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে জঙ্গলে চলে গেল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের মাথার ওপর মেঘমালার ন্যায় একটি ছায়া নিয়ে আসলেন। ছায়াতে যখন তারা আরাম ভোগ করতে লাগল তখন একে অপরকে ডেকে সে ছায়াতলে সমবেত করল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা উক্ত মেঘমালার ছায়াকে আগুন বানিয়ে তাদের ওপর অবতরণ করে তাদেরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছেন। (রুহুল মাআনী, মাযহারী, জুমাল ও সাবী)

মুসা (আ)-এর লাঠি মুজিযাস্বরূপ
ছোট সাপে রূপান্তর হয়েছে না বড় সাপে?

١۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ.

٢۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. *

٣۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. *

٤۔ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا.

٥۔ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا.

অনুবাদ

১. অতঃপর তিনি তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন। আর তখন তা প্রকাশ্য অজগরে পরিণত হলো। (সূরা আরাফ : আয়াত ১০৭)

২. অতঃপর তিনি তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন। আর তখন তা প্রকাশ্য অজগরে পরিণত হলো। (সূরা শুআরা : আয়াত ৩২)

৩. অতঃপর তিনি তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন, আর তখন তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। (সূরা তোয়াহা : আয়াত ২০)

৪. অতঃপর যখন তিনি তাকে দেখলেন সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করছে, তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন। (সূরা নামল : আয়াত ১০)

৫. অতঃপর যখন তিনি তাকে দেখলেন সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করছে, তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন। (সূরা কাসাস : আয়াত ৩১)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : হযরত মুসা (আ)-এর লাঠি মুজিযাস্বরূপ যে সাপে রূপান্তর হয়েছিল, তাকে আয়াত নং ১ ও ২-এর মধ্যে ثُعْبَان তথা বড় অজগর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আয়াত নং ৩-এর মধ্যে حَيَّة তথা শুধু সাপ (ছোট হোক কিংবা বড় হোক) এবং আয়াত নং ৪ ও ৫-এর মধ্যে جَان তথা সূক্ষ্ম ও ছোট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতগুলো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতগুলোর মর্মার্থ সময় ও অবস্থার বিভিন্নতার ওপর ভিত্তিশীল। অর্থাৎ, সর্বপ্রথম লাঠি সমকক্ষ ছোট সাপে রূপান্তরিত হয়েছে। অতঃপর ফুলতে ফুলতে বড় অজগরে পরিণত হয়েছে। প্রথম অবস্থায় তাকে جَان শেষাবস্থায় তাকে ثُعْبَان এবং সাধারণ অবস্থায় তাকে حَيَّة শব্দ দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। (বায়যাবী, খাযেন ও মাদারিক)

জাদুকররা ঈমান আনার সময় কি বলেছিল
بِرَبِّ هَارُوْنَ وَمُوْسٰى না اٰمَنَّا بِرَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ

١. قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ.

٢. قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ. *

٣. قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هَارُوْنَ وَمُوْسٰى.

অনুবাদ

১. তারা বলল, আমরা ঈমান এনেছি জগৎসমূহের প্রতিপালকের ওপর। মুসা ও হারুনের রবের ওপর। (সূরা আরাফ : আয়াত ১২১-১২২)

২. তারা বলল, আমরা ঈমান এনেছি জগৎসমূহের প্রতিপালকের ওপর। মুসা ও হারুনের রবের ওপর। (সূরা শুআরা : আয়াত ৪৭-৪৮)

৩. তারা বলল, আমরা ঈমান এনেছি হারুন ও মুসার রবের ওপর। (সূরা তোয়াহা : আয়াত ৭০)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : যখন হযরত মুসা (আ)-এর মোকাবেলারত জাদুকররা হযরত মুসা (আ)-এর মুজিযার সত্যবাদিতা জেনে ফেলল, তখন তারা সেজদায় পড়ে গেল এবং ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হলো। তবে তারা ঈমান আনয়নের প্রকাশ কোন শব্দের দ্বারা করেছে, এ ব্যাপারে প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে যে, তারা বলেছে– اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ অর্থাৎ, مُوْسٰى-কে هَارُوْنَ-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।
এবং তৃতীয়োক্ত আয়াতে বলা হয়েছে– اٰمَنَّا بِرَبِّ هَارُوْنَ وَمُوْسٰى অর্থাৎ, هَارُوْنَ-কে مُوْسٰى-এর পূর্বে উল্লেখ করা হলো। সুতরাং আয়াতগুলোতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়েছে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. জাদুকরদের উক্তি– رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ-ই ছিল। অর্থাৎ, তারা مُوْسٰى-এর নাম পূর্বে উল্লেখ করেছেন এজন্যে যে, তিনি হযরত হারুন থেকে সম্মানিত ছিলেন এবং নবুওয়ত ও রিসালাতের পয়গামের মধ্যে অনুসৃত ও আসল ছিলেন। আর হযরত হারুন (আ) তাঁর অনুসারী ও সাহায্যকারী ছিলেন। কিন্তু সূরা তোয়াহা এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা رِعَايَتِ فَاصِلَةٌ তথা আয়াতসমূহের অন্ত্যমিলের প্রতি লক্ষ করে رَبِّ هَارُوْنَ وَمُوْسٰى বলেছেন। (রুহুল মাআনী)

২. আল্লামা আবু হাইয়ান (র) বলেছেন, উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে উল্লিখিত উক্তিদ্বয়ের প্রবক্তা জাদুকরদের পৃথক পৃথক দুটি দল। অর্থাৎ, একদল رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ বলেছে, আর অপর দল رَبِّ هَارُوْنَ وَمُوْسٰى বলেছে। সুতরাং এ জবাবদ্বয়ের পর আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই আয়াতগুলোতে বাকি থাকে না। (রুহুল মাআনী)

প্রিয়নবী (স)-এর ওপর
শয়তানের কুমন্ত্রণা কার্যকর হতো কি?

١. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

٢. إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ.

٣. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

অনুবাদ

১. আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।
(সূরা আরাফ : আয়াত ২০০)

২. নিশ্চয় আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই একমাত্র পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে তোমার অনুসারীদের ব্যতীত।
(সূরা হিজর : আয়াত ৪২)

৩. নিশ্চয় সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের ওপর ভরসা করে, তাদের ওপর তার কোনো ক্ষমতা নেই। (সূরা নাহল : আয়াত ৯৯)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে প্রিয় নবীজী (স)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করা হয়েছে যে, আপনার প্রতি যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা আসতে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, হুজুর (স)-এর কলব মোবারকে শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে পারে।

আর ২ নং আয়াতে শয়তানকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তুমি আমার মুখলিস বান্দাগণের ওপর কখনো কর্তৃত্ব করতে পারবে না। অর্থাৎ, তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদেরকে পাপ ও পথভ্রষ্টতার দিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না।

এভাবে ৩ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, ঈমানদার ও তাওয়াক্কুল অর্জনকারীদের অন্তরে শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে পারে না। যাদের মধ্যে প্রিয় নবীজী (স) প্রথম নম্বরে অন্তর্ভুক্ত আছেন। অতএব তিনি ও তাঁর মুখলিস মুমিন তাওয়াক্কুল অর্জনকারী উম্মতকে আল্লাহ তায়ালা শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে মাহফুজ রাখবেন। সুতরাং শেষোক্ত আয়াতদ্বয় প্রথমোক্ত আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

ক. ১ নং আয়াতে نَزْغُ الشَّيْطَانِ দ্বারা এখানে রূপকঅর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আর তা হলো রাগ ও ক্রোধ। শয়তানী কুমন্ত্রণা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হবে এটা যে, যদি আপনার কখনো রাগ ও ক্রোধ এসে যায়, তাহলে তখন আপনি স্বীয় চাহিদাঅনুসারে আমল করবেন না; বরং সে সময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন, যাতে ক্রোধ দূরীভূত হয়ে যায়। সুতরাং উক্ত ১ নং আয়াতে ক্রোধান্বিত হওয়াকে শয়তানী কুমন্ত্রণার দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ বিশ্লেষণ ও জবাব প্রদানের পক্ষে উক্ত আয়াতের শানে নুযূলও রয়েছে। যা তাফসীরে মাযহারীতে মধ্যে উল্লেখ আছে।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ বর্ণনা করেন যে, যখন خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ الخ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো (যার মধ্যে রাসূল (স)-কে ক্ষমা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে), তখন রাসূল (স) আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন– كَيْفَ يَارَبِّ وَالْغَضَبُ (হে পালনকর্তা, যদি ক্রোধ এসে যায় তখন কি করব?) এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ الخ এ আয়াতখানা নাযিল করেন। অতএব نَزْغُ الشَّيْطَانِ দ্বারা ক্রোধ উদ্দেশ্য হলে শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ের সাথে কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় না। (রুহুল মাআনী, মাদারিক ও তাফসীরে মাযহারী)

খ. প্রথমোক্ত আয়াতে যদিও আল্লাহ তায়ালা নবীজী (স)-কে সম্বোধন করে نَزْغُ الشَّيْطَانِ তথা শয়তানী কুমন্ত্রণার কথা বলেছেন, কিন্তু তা দ্বারা উদ্দেশ্য তিনি নন; বরং তিনি ব্যতীত অন্য লোক। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ হলো–

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ.

অর্থ : হে মানুষ, যদি তোমার নিকট শয়তানী কুমন্ত্রণা এসে যায়, তাহলে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। অতএব সাধারণ লোক বা বিশেষত পাপীদের ওপর শয়তানী কুমন্ত্রণা ও কর্তৃত্ব জারি হওয়া কোনো অনর্থক বা অযৌক্তিক বিষয় নয়। যেমন ২ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ এবং অন্য আয়াতেও ইরশাদ হয়েছে– إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ অর্থাৎ, শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী ও পথহারা লোকদের ওপর শয়তানের কুমন্ত্রণা ও কর্তৃত্ব চলে। (তাফসীরে খাযেন)

মুমিনদের অন্তঃকরণ
আল্লাহর যিকিরে ভীত হয় না প্রশান্ত?

١. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. *

٢. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

অনুবাদ

১. নিশ্চয় যারা ঈমানদার তারা এমন যে, যখন তাদের সম্মুখে আল্লাহর নাম আলোচনা করা হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে যায়। (সূরা আনফাল : আয়াত ০২)

২. যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর যিকির দ্বারা তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। অনন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। (সূরা রা'দ : আয়াত ২৮)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহর যিকির দ্বারা মুমিনগণের অন্তরসমূহে ভয় অনুভব হয়।

আর ২নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, প্রশান্তি অনুভব হয়। সুতরাং আয়াতদ্বয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১ নং আয়াতে আল্লাহর যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর শাস্তির স্মরণ।

আর ২ নং আয়াতে আল্লাহর যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর রহমতের স্মরণ। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার শাস্তির কথা শুনে মুমিন বান্দাগণের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, তাদের অন্তরসমূহ ভীত ও প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। আর আল্লাহর রহমতের আলোচনা শুনে তাদের অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়ে যায়। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ.

অর্থ : আল্লাহ তায়ালা খুব উত্তম কালাম নাযিল করেছেন, যা পরস্পর মিলনমুখী ও সদৃশ। বার বার পঠনে ও শ্রবণে মনকে কেড়ে নেয়। (অঙ্গীকার, শাস্তি, আজাব ও রহমতের বিষয়গুলো বারংবার পড়তে ও শুনতেই মন চায়)। উক্ত কালামে বর্ণিত শাস্তির বিষয়গুলোর আলোচনা দ্বারা ঐ লোকদের চামড়াগুলো কম্পমান হয়, যারা স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে। অতঃপর যখন অঙ্গীকার ও রহমতের আলোচনা হয় তখন তাদের চামড়া ও অন্তরসমূহ উক্ত আলোচনার দরুন নরম ও প্রশান্ত হয়ে যায়।

তাফসীরে জালালাইনের লেখক তাঁর গ্রন্থে এ কথাই উল্লেখ করেছেন। সুতরাং অন্তরে ভয় ও প্রশান্তি অনুভব হওয়া দুটি ভিন্নমুখী ব্যাপার, যা উপরে উল্লেখ করা হলো। অতএব এখন আর কোনো বিরোধ বাকি নেই। (তাফসীরে কাবীর, রুহুল মাআনী ও জালালাইন শরীফ)

বদর যুদ্ধে কাফেরদের প্রতি কঙ্কর
আল্লাহ্ তায়ালা নিক্ষেপ করেছেন না রাসূল (স)?

١. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ.

অনুবাদ

১. আর আপনি নিক্ষেপ করেননি যখন আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন; বরং আল্লাহ্ তায়ালা তা নিক্ষেপ করেছিলেন। (সূরা আনফাল : আয়াত ১৭)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : যখন বদর যুদ্ধে রাসূল (স) এক মুঠো মাটি ও কঙ্কর কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন তখন সেগুলো কাফেরদের চোখে গিয়ে পতিত হয়। এটাকে আল্লাহ্ তায়ালা উক্ত আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেন– وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ الخ (যে, যখন আপনি (নবীজী স.) এক মুঠো মাটি ও কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন তখন আপনি তা নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহ্ তায়ালাই নিক্ষেপ করেছেন)। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতের প্রথমাংশ وَمَا رَمَيْتَ দ্বিতীয়াংশ إِذْ رَمَيْتَ-এর সাথে বাহ্যিক দিক দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১. আয়াতের প্রথমাংশে কঙ্কর নিক্ষেপ করা নবীজী (স) থেকে রহিত করা হয়েছে خَلْق সৃষ্টি হিসেবে আর দ্বিতীয়াংশে নিক্ষেপ করা সাব্যস্ত করা হয়েছে كَسَب তথা অর্জন হিসেবে। অর্থাৎ, বান্দা নিজ কর্মের শুধু অর্জনকারী, আর আল্লাহ্ হলেন উক্ত কর্মের সৃষ্টিকারী। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ হবে– وَمَا رَمَيْتَ خَلْقًا إِذَا رَمَيْتَ كَسَبًا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الرَّمْىَ অর্থ: কঙ্কর নিক্ষেপের অর্জন আপনি করেছেন, তবে সৃষ্টি আপনি করেননি; বরং আল্লাহ্ তায়ালা করেছেন। (তাফসীরে কাবীর)

২. إِذْ رَمَيْتَ দ্বারা উদ্দেশ্য وَمَا رَمَيْتَ بِالرُّعْبِ আর وَمَا رَمَيْتَ দ্বারা উদ্দেশ্য رَمَيْتَ الْحَصَاء; সুতরাং পুরোটা হবে এভাবে– وَمَا رَمَيْتَ بِالرُّعْبِ إِذْ رَمَيْتَ بِالْحَصَاءِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى অর্থাৎ, কঙ্কর তো আপনি নিক্ষেপ করেছেন। তবে ভয়ভীতি আপনার পক্ষ থেকে তাদের অন্তরে ঢুকেনি; বরং আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই তা ঢেলে দিয়েছেন।

(তাফসীরে খাযেন, রুহুল মাআনী)

সুতরাং এখন আর কোনো বিরোধ বাকি নেই।

হুজুর (স)-এর উপস্থিতিতে
কাফেরদের ওপর শাস্তি আসতে পারে কি?

١. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ. *

٢. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

অনুবাদ

১. আল্লাহ কখনো তাদেরকে আজাব দেবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাদের মাঝে থাকেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ততক্ষণ আল্লাহ তাদেরকে আজাব দেবেন না। (সূরা আনফাল : আয়াত ৩৩)

২. আর তাদের এমন কি রয়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে আজাব দেবেন না, অথচ তারা মসজিদে হারাম থেকে বাধা দান করে।(সূরা আনফাল : আয়াত ৩৪)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবেন এবং তারা ইসতিগফার করতে থাকবে, ততক্ষণ তাদেরকে আজাব প্রদান করা হবে না।

আর ২ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কোনো আজাব দেবেন না, অথচ তারা মুসলমানদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বারণ করে রাখতে চায়।

সুতরাং ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, হুজুর (স)-এর উপস্থিতিতে কাফের-মুশরিকদের ওপর আজাব আসবে না। আর ২ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আজাব আসতে কোনো বাধা নেই। অতএব আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ক. হযরত হাসান বসরী (র) ফরমান যে, ১ নং আয়াত ২ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। মক্কার কাফের-মুশরিকরা খানায়ে কাবার তাওয়াফ করা অবস্থায় তালবিয়া পড়াকালে غُفْرَانَكَ غُفْرَانَكَ শব্দ বলত।

আল্লাহ তায়ালা তখন ফরমালেন, যতক্ষণ আপনি (নবীজী) তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবেন এবং তারা ইসতিগফার করতে থাকবে, ততক্ষণ তাদের ওপর আজাব আসবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা উক্ত আয়াত রহিত করে নাযিল করলেন– وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ الخ অর্থ: কি হলো যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে আজাব দিবেন না। অর্থাৎ, তাদেরকে আল্লাহ্ অবশ্যই আজাব দেবেন। যেমন মক্কাবাসী কাফেরদের ওপর আল্লাহ্ দুর্ভিক্ষের আজাব নাযিল করেছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

খ. ১ নং আয়াতে আজাব ও শাস্তি প্রদান না করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই যে, আল্লাহ্ তায়ালা পূর্ববর্তী উম্মতগণের ন্যায় নবীজী (স)-এর যুগের কাফের-মুশরিকদেরকে শাস্তি প্রদান করে সমূলে বিনাশ করবেন না।
আর ২ নং আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো عَذَابٌ بِالسَّيْفِ অর্থাৎ, যুদ্ধ-জিহাদের ময়দানে কাফের-মুশরিকদের প্রতি তরবারির মাধ্যমে আজাব ও শাস্তি অবতরণ করতে কোনো বাধা নেই। (তাফসীরে খাযেন)
সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিঃশেষ হয়ে গেল।

কাফেরদের সৎকাজ
উপকারী নাকি বিনষ্ট ও ব্যর্থ?

١. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ. *

٢. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلَالٍ.

٣. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ.

٤. وَقَدِمْنَا إِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا.

٥. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلَالٍ.

٦. اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.

٧. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

٨. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَاقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ.

অনুবাদ

১. আর আল্লাহ তাদেরকে আজাব দেবেন না এমতাবস্থায় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে। (সূরা আনফাল : আয়াত ৩৩)

২. আর কাফেরদের সকল আহ্বানই একমাত্র ভ্রষ্টতার দিকে।
(সূরা রা'দ : আয়াত ১৪)

৩. বলুন, আমি কি তোমাদেরকে নিজ কর্মে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে অবহিত করব না, যাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টাই পার্থিব জীবনে ভ্রান্তে পরিণত হয়েছে, অথচ তারা ধারণা করে যে, তারা ভালো কাজ করছে। এরা সেসব লোক যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলি ও সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল হয়েছে।

(সূরা কাহাফ : আয়াত ১০৩-১০৫)

৪. আর আমি মনোনিবেশ করলাম তাদের কৃতকর্মসমূহের দিকে। অতঃপর তাকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করলাম। (সূরা ফুরকান : আয়াত ২৩)

৫. আর কাফেরদের সকল আহ্বানই কেবল ভ্রষ্টতার দিকে।

(সূরা মুমিন : আয়াত ৫০)

৬. যারা কুফরি করে এবং আল্লাহর পথ থেকে বারণ করে, তারা নিজেরাই নিজেদের আমলসমূহ নষ্ট করল। (সূরা মুহাম্মাদ : আয়াত ০১)

৭. আর যারা কুফরি করে, তাদের জন্যে রয়েছে ধ্বংস, এবং তারা নিজেরাই নিজেদের আমলসমূহ নষ্ট করেছে। এটি এজন্যেই যে, তারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অপছন্দ করে। ফলে তাদের আমলসমূহকে নিষ্ফল করে দিয়েছে। (সূরা মুহাম্মাদ : আয়াত ৮-৯)

৮. নিশ্চয় যারা কুফরি করে এবং আল্লাহর পথ থেকে বারণ করে, এবং তাদের জন্যে হেদায়াত প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসূলের নাফরমানি করে, তারা আল্লাহর কোনো অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। আর তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দেবেন। (সূরা মুহাম্মাদ : আয়াত ৩২)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে কাফেরদের সম্পর্কে ইরশাদ হয় যে, আল্লাহ তাদেরকে আজাব দেবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ তারা ইসতিগফার করতে থাকে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেরদের ইসতিগফার (যা তাদের সৎকর্ম) তাদেরকে উপকার প্রদান করে থাকে এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের এ আমলের দরুন তাদের প্রতি আজাব অবতরণ করেন না।

আর ২ থেকে ৮ নং পর্যন্ত আয়াতগুলো দ্বারা জানা যায় যে, কাফেরদের সব আমল বেকার ও বিনষ্ট। তাদের আমল দ্বারা তাদের কোনো ফায়দা হবে না। যেমন আয়াত নং ২ ও ৫-এ বলা হয়েছে– وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِيْ

ضَلَالٍ অর্থ: কাফেরদের দোয়া সম্পূর্ণ বাতিল ও বেকার বলে গণ্য হয়। আয়াত নং ৩-এ বলা হয়েছে যে, কাফেররা আমলের দিক দিয়ে ক্ষতি ও লোকসানের মধ্যে নিপতিত। ইহকালে যদি তারা কোনো সৎকাজ করে, তাহলে তা বেকার ও বিনষ্ট বলে গণ্য হয়, অথচ তারা ধারণা করে যে, আমরা সৎকর্ম সম্পাদন করছি। আর আল্লাহ্ তায়ালা তাদের সৎকর্মকে বাতিল ও বিনষ্ট বলে আখ্যায়িত করেন।

এভাবে আয়াত নং ৪-এ আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদের সৎকর্মকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মতো বেকার ও অলাভজনক বলে সাব্যস্ত করেন এবং আয়াত নং ৬, ৭ ও ৮-এও বেকার ও বাতিল বলে ঘোষণা করেন। মোটকথা এই যে, শেষোক্ত ৭টি আয়াত দ্বারা কাফেরদের সৎকর্ম অনুপকারী ও বিনষ্ট হওয়া বোঝা যায়। অতএব প্রথমোক্ত আয়াত শেষোক্ত আয়াতগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : কাফেরদের সৎকর্মগুলো দুনিয়ার জীবনে উপকারী ও লাভজনক হয় এবং আখেরাতের জীবনে সেগুলো সম্পূর্ণ বেকার ও নিকৃষ্ট হয়। সুতরাং কোনো কাফের যদি কোনো সৎকর্ম করে, তাহলে তার প্রতিদান তাকে দুনিয়াতেই প্রদান করা হয়। যেমন– উক্ত সৎকর্মের দরুন তাকে ইহকালীন আজাব ও মুসিবত থেকে রক্ষা করা হয় এবং ধন-দৌলতের মধ্যে প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, তবে আখেরাতের বেলায় সে কর্মের ওপর কোনো ফায়দা সংযোজিত হয় না। সুতরাং কাফেরদের সৎকর্মের উপকারিতার স্থান বুঝে থাকলে উপরিউক্ত প্রথম আয়াতের সাথে শেষোক্ত আয়াতগুলোর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সৃষ্টি হয় না। (জালালাইন, সাবী)

কাফেরদের সাথে সন্ধি করা বৈধ কিনা?

١. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. *

٢. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ.

অনুবাদ

১. আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহী হয়, তাহলে আপনি সে দিকে আগ্রহী হোন, এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী ও পরিজ্ঞাত। (সূরা আনফাল : আয়াত ৬১)

২. অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহ্বান জানিয়ো না। তোমরাই হবে প্রবল। (সূরা মুহাম্মাদ : আয়াত ৩৫)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয় যে, যদি কাফেররা সন্ধি করার জন্যে আপনার প্রতি অগ্রসর হয়, তাহলে আপনিও সন্ধি করার উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি অগ্রসর হবেন। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেরদের সাথে সন্ধি করা বৈধ।

তবে ২ নং আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কাফেরদের সাথে সন্ধি করা কখনো বৈধ নয়। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদা ও মুজাহিদ (র) বর্ণনা করেন যে, ১ নং আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সন্ধি করার অনুমতি ছিল। পরবর্তীতে জিহাদ ও কিতালের আয়াত নাযিল করে সন্ধি করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। (রুহুল মাআনী)

২. আয়াতদ্বয় কাফেরদের শ্রেণিভেদের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, আহলে কিতাবের সাথে সন্ধি করার অনুমতি রয়েছে, তবে মুশরিকদের সাথে সন্ধি করা বৈধ নয়। তাদের জন্যে হয়তো ইসলাম গ্রহণ করা অপরিহার্য, নয়তো যুদ্ধ-জিহাদ। সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াত আহলে কিতাবের সাথে নির্দিষ্ট, আর শেষোক্ত আয়াত আরবের মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ। (রুহুল মাআনী)

যুদ্ধের ময়দানে কত সংখ্যক
কাফেরের সাথে মোকাবেলা করা অপরিহার্য?

١. إِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْا أَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ. *

٢. فَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ أَلْفٌ يَّغْلِبُوْا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ.

অনুবাদ

১. যদি তোমাদের মাঝে ধৈর্যশীল বিশজন থাকে, তবে তারা দুইশত জনের ওপর বিজয় লাভ করবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকে, তবে তারা কাফেরদের এক হাজারের ওপর বিজয় লাভ করবে। তারা এমন জাতি যারা বুঝে না। (সূরা আনফাল : আয়াত ৬৫)

২. আর যদি তোমাদের মাঝে ধৈর্যশীল একশজন থাকে, তবে তারা দুইশতজনের ওপর বিজয় লাভ করবে। আর যদি তোমাদের মাঝে এক হাজার থাকে, তবে তারা আল্লাহর ইচ্ছায় দুই হাজারের ওপর বিজয় লাভ করবে। (সূরা আনফাল : আয়াত ৬৬)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : আয়াত নং ১-এর মধ্যে ইরশাদ হয় যে, যদি মুসলমানদের বিশজন দৃঢ়পদ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকে, তাহলে দুই শত কাফেরের মোকাবেলায় বিজয় লাভ করবে। আর যদি একশত লোক থাকে, তাহলে হাজার সংখ্যক কাফেরের মোকাবেলায় জয়ী হবে। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের সংখ্যা যদি দশগুণ বা তার চেয়ে কম হয়, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দৃঢ়পদ থাকা ও লড়াই করা অপরিহার্য। পলায়ন করা ও পিছু হটা হারাম।

আর আয়াত নং ২ দ্বারা জানা যায় যে, কাফেরদের সংখ্যা যদি দ্বিগুণ হয়, তাহলে তাদের সাথে মোকাবেলা করা অপরিহার্য। দ্বিগুণ অপেক্ষা বেশি হলে তখন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ফরয বা অপরিহার্য নয়।

অতএব আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : প্রথমোক্ত আয়াত দ্বিতীয়োক্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন প্রথমোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদেরকে দশগুণ কাফেরের সাথে মোকাবেলা করার ওপর দৃঢ়পদ থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়, তখন মুসলমানদের ওপর উক্ত নির্দেশ পালন করা ভারী ও কঠিন অনুভব হয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা সহজকরণার্থে শেষোক্ত আয়াত নাযিল করেন। সুতরাং রহিতকরণের বিষয়টির ওপর অবগত হওয়ার পর আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি থাকে না। (তাফসীরে খাযেন)

সমস্ত মুশরিকের সাথে যুদ্ধ করা অপরিহার্য নাকি শুধু নিকটাত্মীয় মুশরিকদের সাথে?

১. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً. *

২. يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيْكُمْ غِلْظَةً.

অনুবাদ

১. আর তোমরা কাফেরদের সাথে লড়াই করো সমবেতভাবে। (সূরা তাওবা : আয়াত ৩৬)

২. হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করো আর তারা যেন তোমাদের মাঝে কঠোরতা অনুভব করে। (সূরা তাওবা : আয়াত ১২৩)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেন যে, তোমরা মুশরিকদের সাথে লড়াই করো; চাই তারা তোমাদের আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয় হোক।

আর ২ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, কাফেরদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের রিস্তাদার, তাদের সাথে লড়াই করো এবং তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করো। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : উপর্যুক্ত ২ নং আয়াতে অনাত্মীয়ের সাথে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়নি; বরং তার মধ্যে যুদ্ধ ও জিহাদের আদবসমূহ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, জিহাদের পদ্ধতি ও আদব হলো এই যে, সর্বপ্রথম আত্মীয়দের সাথে জিহাদ করবে। অতঃপর অনাত্মীয়দের সাথে। কারণ, সমস্ত মুশরিকের সাথে একই দফায় লড়াই করা সম্ভব নয়। সেজন্যে ক্রমে ক্রমে একদলের পর অন্য দলেন সাথে লড়াই করার অতি সুন্দর পদ্ধতি ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে। যেমন রাসূল (স) সর্বপ্রথম নিজ সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করেছেন। তারপর অন্যান্য আরববাসী লোক ও আহলে কিতাবের সাথে জিহাদ করেছেন। তারপর রূমের অধিবাসী ও সিরিয়ার অধিবাসী কাফেরদের সাথে জিহাদ করার প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। এভাবে রাসূল (স)-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের উদ্দেশ্যে ইরাকের দিকে রওয়ানা হন। অতঃপর অন্যান্য দেশের কাফেরদের সাথেও জিহাদ করতে থাকেন। অতএব এ বর্ণনা দ্বারা বোঝা গেল যে, ১ নং আয়াতে জিহাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর ২ নং আয়াত দ্বারা জিহাদের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। (সাবী)

জিহাদ কি সক্ষম, অক্ষম উভয়ের ওপর ফরয
নাকি শুধু সক্ষমের ওপর ফরয?

١. اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. *

٢. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ.

٣. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ.

অনুবাদ

১. তোমরা স্বল্প ও ভারী সবধরনের সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ো, এবং তোমাদের জানমাল নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর।

(সূরা তাওবা : আয়াত ৪১)

২. দুর্বল, রুগ্ণ, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের ওপর কোনো জটিলতা নেই। (সূরা তাওবা : আয়াত ৯১)

৩. অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ণ ব্যক্তির ওপর কোনো জটিলতা নেই।

(সূরা ফাতহ : আয়াত ১৭)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপর্যুক্ত ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয় যে, তোমরা বের হয়ে পড়ো স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে, এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে। অর্থাৎ, তোমাদের অবস্থা চাই এমন হোক যে, জিহাদ করা তোমাদের জন্যে সহজতর হয় অথবা এমন হোক যে, জিহাদ করা ভারী ও কঠিন হয়ে যায়– সর্বাবস্থায় তোমাদের ওপর জিহাদ করা ফরয। যার দ্বারা বোঝা যায় যে, মানুষ ধনী হোক অথবা দরিদ্র, সুস্থ হোক অথবা অসুস্থ, অক্ষম হোক অথবা সক্ষম, পরিবারমুক্ত হোক অথবা পরিবারযুক্ত– সবার জন্যে সর্বাবস্থায় জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া একান্ত প্রয়োজন।

অথচ ২ নং ও ৩ নং আয়াতে ইরশাদ হয় যে– দুর্বল, অক্ষম, রুগ্ণ, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ, অন্ধ ও খোঁড়া লোকদের জন্যে জিহাদে বের হওয়া ফরয নয়। সুতরাং ১ নং আয়াত ২ নং ও ৩ নং আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১ নং আয়াতটি শেষোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সর্বাবস্থায় জিহাদে বের হওয়া ফরয ছিল। অতঃপর এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে। যেমন এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) অন্ধ সাহাবী ছিলেন। তিনি একদা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্যেও কি জিহাদে বের হওয়া ফরয? নবীজী (স) ইরশাদ করলেন যে, আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করেছেন– لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ الخ অর্থ: অন্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিবর্গ যদি জিহাদে বের না হয়, তাহলে কোনো দোষ নেই। সুতরাং রহিত হওয়ার বিষয়টি জানলে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বাকি থাকে না। (রুহুল মাআনী)

জিহাদে সবার বের হওয়া প্রয়োজন না একদলের?

১. مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَّتَخَلَّفُوا عَنْ رَّسُولِ اللهِ.

*

২. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

অনুবাদ

১. মদিনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রাসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পিছনে থাকা। (সূরা তাওবা : আয়াত ১২০)

২. আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সতর্ক করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে। যাতে তারা বাঁচতে পারে। (সূরা তাওবা : আয়াত ১২২)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয় যে, মদিনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের জন্যে বৈধ নয় যে, যখন রাসূল (স) জিহাদের জন্যে তাশরীফ নিয়ে যান তখন তারা পিছু হটে যাবে; বরং সবাইকে নবীজীর সাথে জিহাদে বের হওয়া জরুরি হয়ে যায়।

আর ২ নং আয়াতে ইরশাদ হয় যে, সমস্ত মুসলমান একত্রে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া উচিত নয়; বরং একদল জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হবে আর অপর দল ইলমে দীনের শিক্ষাদীক্ষার কাজে লিপ্ত থাকবে, যাতে জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণ জিহাদ থেকে ফিরে আসলে তাদেরকে আল্লাহর বিধান শিক্ষা দিয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : হযরত ইবনে সাঈদ (র) বর্ণনা করেন যে, ১ নং আয়াত ২ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। যখন মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল তখন আল্লাহ তায়ালা সবাইকে একত্রে জিহাদে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেন, এবং তা সবার জন্যে জরুরিও হয়ে পড়ে। তবে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যায় তখন উক্ত নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। (তাফসীরে খাযেন, মাযহারী)

এভাবে আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনে এ জবাবও প্রদান করা যায় যে, সাধারণ অবস্থায় সবার জন্যে জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরয নয়, তবে চূড়ান্ত অবস্থায় সবার জন্যে জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরয।

মানুষ বিপদে দোয়া করে নাকি নিরাশ ও হতাশ হয়ে থাকে?

١. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا.

٢. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ.

٣. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ.

٤. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا.

٥. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو
دُعَاءٍ عَرِيضٍ. *

٦. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.

٧. لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ.

অনুবাদ

১. আর যখন মানুষকে কষ্ট স্পর্শ করে তখন শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। (সূরা ইউনুস : আয়াত ১২)

২. আর যখন মানুষকে কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে তার অভিমুখী হয়ে। (সূরা রূম : আয়াত ৩৩)

৩. মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার প্রভুকে ডাকে। অতঃপর যখন তার পক্ষ থেকে তাকে নেয়ামত দান করে। (সূরা যুমার : আয়াত ৮)

৪. অতঃপর যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা আমাকে ডাকে। অতঃপর যখন আমি আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে নেয়ামত দান করি। (সূরা যুমার : আয়াত ৪৯)

৫. আমি যখন মানুষের প্রতি অনাগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে সুদীর্ঘ দোয়া করে। (সূরা হা-মীম সাজদা : আয়াত ৫১)

৬. আর যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে নিরাশ হয়ে পড়ে। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৮৩)

৭. মানুষ উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় না। যদি তাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। (সূরা হা-মীম সাজদা : আয়াত ৪৯)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : প্রথমোক্ত ৫টি আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, যখন মানুষ পেরেশানি ও মুসিবতে আক্রান্ত হয় তখন তারা শয়ন, উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে খুব লম্বালম্বা দোয়া করে থাকে।

আর শেষোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, তারা নিরাশ ও হতাশ হয়ে বসে থাকে। সুতরাং দোয়া যেহেতু আশা-ভরসার অবস্থাতে করা যায়, সেজন্যে দোয়া করা ও হতাশ হয়ে যাওয়া উভয় জিনিসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. আয়াতগুলো লোকসমাজের শ্রেণিভেদের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, প্রথম ৫ আয়াত মুমিনগণের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আর শেষ ২ আয়াত কাফেরদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। সুতরাং যারা মুমিন, তারা পেরেশানি ও মুসিবতের সময় আল্লাহর কাছে খুব দোয়া করে থাকে। আর যারা কাফের, তারা নিরাশ ও হতাশ হয়ে বসে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ অর্থঃ আল্লাহর রহমত থেকে একমাত্র কাফেররাই নিরাশ হয়ে যায়। (তাফসীরে মাদারিক)

২. আয়াতগুলো সময় ও অবস্থার প্রভেদের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, যখন মানুষ মুসিবতে পতিত হয়, তখন প্রাথমিক পর্যায়ে খুব দোয়া করতে থাকে, তবে যখন কবুল না হওয়ার নিদর্শন প্রতিপন্ন হয়, তখন তারা নিরাশ ও হতাশ হয়ে দোয়া ছেড়ে দেয়। (বয়ানুল কুরআন)

বনী আদমকে কীসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে?

١- هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا.

٢- مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ.

٣- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ.

٤- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ.

٥- إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ.

٦- هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ. *

٧- خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ.

٨- ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ.

٩- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ.

١٠ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ.

١١- وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ.

١٢- أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.

١٣- أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ.

١٤- إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ.

١٥- أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ.

١٦- مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِن نُّطْفَةٍ.

١٧.فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. *

١٨.خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.

অনুবাদ

১. তিনি জমিন হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তোমাদের বসতি দান করেছেন। (সূরা হূদ : আয়াত ৬১)

২. তা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদের ফিরিয়ে দেব এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদের বের করব।

৩. হে লোকসকল, তোমরা যদি পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দিহান হও, তবে (জেনে রেখো,) নিশ্চয় আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে। (সূরা হজ্জ : আয়াত ০৫)

৪. আর তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে এই যে, তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমরা এখন মানুষ ছড়িয়ে আছ। (সূরা রূম : আয়াত ২০)

৫. নিশ্চয় আমি তাদের সৃষ্টি করেছি আঠালো মাটি থেকে। (সূরা সাফফাত : আয়াত ১১)

৬. তিনি তোমাদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত, যখন তোমাদের সৃষ্টি করেছেন জমিন থেকে। (সূরা নাজম : আয়াত ৩২)

৭. তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন শুক্রবিন্দু থেকে। এতৎসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে গেছে। (সূরা নাহাল : আয়াত ০৪)

৮. অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। (সূরা মুমিনূন : আয়াত ১৩)

৯. অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। (সূরা সাজদা : আয়াত ৮)

১০. মানুষ কি লক্ষ করে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে। অতঃপর সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। (সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৭৭)

১১. এবং তিনিই সৃষ্টি করেছেন যুগল-পুরুষ ও নারী। একবিন্দু বীর্য থেকে যখন তা স্খলিত করা হয়। (সূরা নাজম : আয়াত ৪৫-৪৬)

১২. তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে? তোমরা তা সৃষ্টি করেছ না আমি সৃষ্টি করি? (সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত ৫৮-৫৯)

১৩. সে কি স্থলিত বীর্য ছিল না? (সূরা কিয়ামা : আয়াত ৩৭)

১৪. আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে। (সূরা দাহার : আয়াত ২)

১৫. আমি কি তোমাদের তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি। (সূরা মুরসালাত : আয়াত ২০)

১৬. তাকে কোন জিনিস থেকে সৃষ্টি করেছেন? শুক্রবিন্দু থেকে। (সূরা আবাসা : আয়াত ১৮-১৯)

১৭. অতএব মানুষের ভেবে দেখা উচিত, কোন জিনিস থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে, যা বের হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাঁজরের মধ্যভাগ থেকে। (সূরা তারিক : আয়াত ৫-৭)

১৮. মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। (সূরা আলাক : আয়াত ০২)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উল্লিখিত আয়াতগুলোতে হযরত আদম (আ)-এর সন্তানাদির সৃষ্টির বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, এ আয়াতগুলো কোনো কোনোটার মধ্যে বহুবচনের রূপ ব্যবহার হয়েছে, আবার কোনো কোনোটার মধ্যে বংশধর বা সন্তানাদি ব্যবহার হয়েছে। এভাবে যেসব আয়াতে শুধু ইনসান শব্দ ব্যবহার হয়েছে, সেসব আয়াতের মধ্যে ইনসান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আদম (আ)-এর সন্তানাদি। যেমনিভাবে আয়াতগুলোর শব্দরূপ, বাচনভঙ্গি ও তাফসীরকারদের তাফসীরসমূহের দ্বারা অনুমান করা যায়।

কিন্তু হযরত আদম (আ)-এর সন্তানাদিকে কোন জিনিস দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, এ ব্যাপারে আয়াতগুলো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রথমোক্ত ৬ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, আদম-সন্তানগণ মাটি দ্বারা সৃষ্ট।

৭ থেকে ১৭ নং আয়াতসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, বীর্যের ফোঁটা দ্বারা সৃষ্ট।

এবং ১৮ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, জমাট রক্ত দ্বারা সৃষ্ট। অতএব আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১ থেকে ৬ পর্যন্ত আয়াতগুলোর মধ্যে হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির বর্ণনা উদ্দেশ্য যে, তাঁকে আল্লাহ তায়ালা মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন বহুবচনের সর্বনামের পূর্বে একটি مُضَاف উহ্য আছে। অর্থাৎ– مِنْهَا هُوَ اَنْشَأَ ,هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنْشَأَ اَبَاكُمْ ,اِنَّا خَلَقْنَا اَبَاهُمْ ,خَلَقْنَا اَبَاكُمْ اَبَاكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ইত্যাদি।

অতঃপর ৭ থেকে ১৭ নং আয়াতগুলোতে আদম-সন্তানগণের সৃষ্টির বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বীর্যের ফোঁটা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

এবং ১৮ নং আয়াতের মধ্যে যে عَلَق তথা জমাট রক্তের উল্লেখ করা হয়েছে, তার মর্মার্থ এ নয় যে, মানুষকে প্রথম বারেই জমাট রক্তের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে; বরং মানুষকে বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন নিম্নবর্ণিত সূরা মুমিনূনের আয়াতে বলা হয়েছে–

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

অর্থঃ, আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি। তারপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি। অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে এক নতুন সৃষ্টবস্তুরূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ কতই না কল্যাণময়!

সুতরাং এ বিশ্লেষণ অনুপাতে বোঝা গেল যে, উল্লিখিত প্রথমোক্ত ছয় আয়াত হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি এবং শেষোক্ত আয়াতগুলো আদম-সন্তানদের সৃষ্টির বর্ণনার উপর আলোচিত হয়েছে। অতএব এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা মিটে গেল। (রুহুল মাআনী)

২. উপর্যুক্ত আয়াতগুলো আদম-সন্তানগণের সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত এভাবে যে, আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানগণকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। তবে প্রথমোক্ত ৬ আয়াতে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করার কথা এ মর্মে বলা হয়েছে যে, মাটি মানব সৃষ্টির জন্যে দূরবর্তী উপকরণ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। কেননা, শুক্রবিন্দু খাদ্য দ্বারাই তৈরি হয়। আর খাদ্য মাটি থেকেই সৃষ্টি হয়। সুতরাং মানব সৃষ্টি যেন মাটি থেকেই হয়েছে। এজন্যেই প্রথমোক্ত আয়াতে মানব সৃষ্টির বর্ণনা দিতে গিয়ে মাটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর শেষোক্ত আয়াতগুলোতে মানব সৃষ্টির নিকটবর্তী উপকরণ বা ধাতুর কথা আলোচিত হয়েছে। সেজন্যে এগুলোতে শুক্রবিন্দুর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এখন আয়াতগুলোর মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি নেই।

(রুহুল মাআনী)

জান্নাতে প্রবেশ আমলের দ্বারা হবে
নাকি শুধু আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে?

١. يَقُوْلُوْنَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

٢. أَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

٣. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

٤. أُولٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. *

٥. فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ.

٦. لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهٖ.

٧. إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.

অনুবাদ

১. ফেরেশতারা বলে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা যা করতে তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ করো। (সূরা নাহাল : আয়াত ৩২)

২. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী বসবাসের জান্নাত। এটা তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়নস্বরূপ। (সূরা সাজদা : আয়াত ১৯)

৩. আর সেই জান্নাত, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে যার উত্তরাধিকারী হয়েছ। (সূরা যুখরুপ : আয়াত ৭২)

৪. তারা জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান হিসেবে। (সূরা আহকাফ : আয়াত ১৪)

৫. অতএব যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তারা নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে থাকবে। (সূরা হজ্জ : আয়াত ৫৬)

৬. যাতে তিনি যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের স্বীয় অনুগ্রহে প্রতিদান দিতে পারেন। (সূরা রূম : আয়াত ৪৫)

৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে তলদেশে প্রবহমান নির্ঝরিণীবিশিষ্ট জান্নাত। (সূরা বুরূজ : আয়াত ১১)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : প্রথমোক্ত ৪ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করা আমলের দরুনই হবে। কারণ– بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ও بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-এর মধ্যে بَاء অব্যয়টি কারণ বোঝানোর জন্যে ব্যবহার হয়েছে এবং بَاء অব্যয়ের পরবর্তী অংশটি পূর্ববর্তী অংশের জন্যে কারণ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে।

আর শেষোক্ত ৩ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, জান্নাতে প্রবেশ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহেই হয়ে থাকে; আমলের কারণে নয়। কেননা, আয়াত নং ৫ ও ৭-এর فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ও لَهُمْ جَنّٰت-এর শুরুতে فَاء سَبَبِيَّة-এর উল্লেখ নেই। যদি উল্লেখ থাকত, তাহলে فَاء سَبَبِيَّة এ কথার প্রতি নির্দেশনা প্রদান করতো যে, আমলসমূহ জান্নাতে প্রবেশের জন্যে কারণস্বরূপ হয়ে থাকে। কেননা, فَاء سَبَبِيَّة-এর পূর্ববর্তী অংশটি পরবর্তী অংশের জন্যে কারণ হয়। যেমন কুরআন শরীফের মধ্যে উপরোল্লিখিত ৫ নং আয়াতের পূর্বোক্ত আয়াত–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا فَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

এর মধ্যে اُولٰئِك-এর শুরুতে فَاء-টি فَاء سَبَبِيَّة; উক্ত فَاء এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, কুফর ও মিথ্যাচার কঠিন শাস্তি পাওয়ার জন্যে কারণ। সুতরাং فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ও لَهُمْ جَنّٰت-এর মধ্যে فَاء سَبَبِيَّة-কে তরক করা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত হয় যে, জান্নাতে প্রবেশ করা আমলের কারণে হয় না; বরং শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের করণেই হয়। এজন্যে তাফসীরে জালালাইনের লেখক فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ-এর পর فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ (আল্লাহর অনুগ্রহপূর্বক) শব্দটি বাড়িয়ে দেন। এভাবে আয়াত নং ৫-এর মধ্যে তো আল্লাহ নিজেই مِنْ فَضْلِهٖ শব্দটি প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ, প্রকৃত মুমিন ও সৎকর্মশীলদের আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহের দরুন প্রতিদান দেবেন। বিশুদ্ধ হাদীসের মধ্যেও রয়েছে যে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَّدْخُلَ اَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قِيْلَ وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَّتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهُ بِفَضْلٍ وَّرَحْمَةٍ. (رواه البخارى ومسلم)

অর্থ: হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স) ইরশাদ করেন, কোনো ব্যক্তি স্বীয় আমলের দরুন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না (বরং প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহের দরুনই জান্নাতে প্রবেশ করবে)। রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো হে আল্লাহর রাসূল, আপনিও কি প্রবেশ করতে পারবেন না? তিনি বললেন, না আমিও প্রবেশ করতে পারব না। তবে যদি আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে আমাকে ঢেকে নেন। (বুখারী, মুসলিম)

সারকথা হলো, প্রথমোক্ত ৪ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, মুমিনগণ স্বীয় ঈমান ও আমলের দরুনই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর শেষোক্ত ৩ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের দরুনই তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. যদিও জান্নাতে প্রবেশ করা আমলের কারণেই হয়ে থাকে, কিন্তু আমলের তাওফীক আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমেই হয়। সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ করার বাস্তব কারণ ও মাধ্যম হলো আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ, যা শেষোক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর প্রকাশ্য কারণ ও মাধ্যম হলো আমলসমূহ, যা পূর্বোক্ত ৪ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। (রুহুল মাআনী, খাযেন)

২. জান্নাতে প্রবেশ করা আল্লাহর অনুগ্রহের মাধ্যমেই হয়ে থাকে, তবে আমলসমূহের দরুন জান্নাতবাসীদের জন্যে জান্নাতে পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং প্রথমোক্ত ৪ আয়াত মুমিনদের জন্যে জান্নাতে পদমর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত। আর শেষোক্ত ৩ আয়াত জান্নাতে প্রবেশের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব এখন আর আয়াতগুলোর মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। (হাশিয়ায়ে জালালাইন)

কাফেরদের ঈমান আনয়নে
কোন জিনিস প্রতিবন্ধক?

١. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوْا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى إِلَّا أَنْ قَالُوْا أَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا. *

٢. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوْا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ.

অনুবাদ

১. আর মানুষের নিকট যখন হেদায়াত আসে, তখন ঈমান আনা থেকে তাদেরকে তাদের এ উক্তিই বারণ করে যে, আল্লাহ কি রাসূল হিসেবে একজন মানুষকে প্রেরণ করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৯৪)

২. হেদায়াত আসার পরও মানুষদের ঈমান আনা ও তাদের রবের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা থেকে এ প্রতীক্ষাই বারণ করেছে যে, কখন আসবে তাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি। (সূরা কাহাফ : আয়াত ৫৫)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয় যে, লোকসমাজের কাছে যখন হেদায়াত আসল তখন তাদেরকে ঈমান আনয়ন থেকে বাধা প্রদান করল তাদের এ উক্তি যে, তারা বলতে লাগল, "আল্লাহ কি মানুষকে রাসূলরূপে পাঠালেন। অর্থাৎ, তাদের আকীদা এমন ছিল যে, রাসূল মানুষ হতে পারেন না; বরং তিনি কোনো ফেরেশতাই হয়ে থাকেন। তাদের বাতিল আকীদাই তাদের ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রেখেছে। যদি এ আকীদা না হতো, তাহলে তারা অবশ্যই ঈমান নিয়ে আসত। কারণ, উল্লিখিত আয়াতের মধ্যে তাদের উক্ত আকীদাকে نَفْى ও اِسْتِثْنَاء-এর দ্বারা ঈমান আনয়নে প্রতিবন্ধক বস্তুরূপে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

আর ২ নং আয়াতে ইরশাদ হয় যে, কাফেরদের ঈমান ও ইস্তিগফার থেকে বিরত রাখল শুধু এ বস্তু যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের মতো ধ্বংস করার ইচ্ছা করেছেন। সুতরাং যদি আল্লাহ তায়ালার এ ইচ্ছা

না হতো, তাহলে তারা ঈমান নিয়ে আসত। কেনেনা, উক্ত আয়াতে أَنْ تَأْتِيَهُمْ-এর পূর্বে إِرَادَةُ اللّٰهِ শব্দটি উহ্য আছে। অর্থাৎ– وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُّؤْمِنُوْا إِلَّا إِرَادَةُ اللّٰهِ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ এ আয়াতের মধ্যে ঈমানের প্রতিবন্ধক বস্তুরূপে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার উল্লিখিত ইচ্ছাকে। অতএব উভয় আয়াতের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল এজন্যে যে, কোনো বস্তুকে অপর কোনো বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা তার বিপরীত বস্তুসমূহ নাবোধক হওয়ার দলীল হয়। সুতরাং যেহেতু প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের ঈমান আনয়ন থেকে বাধা প্রদানকারী বস্তু তাদের একমাত্র ভ্রান্ত আকীদা, সেহেতু আয়াতের মর্মার্থ হবে এটা যে, উক্ত ভ্রান্ত আকীদা ব্যতীত তাদের ঈমানের ব্যাপারে আর কোনো প্রতিবন্ধক নেই। এমনকি আল্লাহ তায়ালার উল্লিখিত ইচ্ছাও প্রতিবন্ধক তাদের ঈমান না আনার বেলায়। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রতিবন্ধক বস্তু একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উল্লিখিত ইচ্ছা। আর ১ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, তাদের ভ্রান্ত আকীদাই তাদের ঈমানের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। অতএব আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১ নং আয়াতে প্রকাশ্য প্রতিবন্ধক বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। আর ২ নং আয়াতে প্রকৃত প্রতিবন্ধক বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। যার মর্মার্থ হলো, কাফেরদের ঈমান আনার ব্যাপারে প্রকাশ্য প্রতিবন্ধক হলো, তারা এ আকীদা পোষণ করে যে, মানুষ রাসূল হতে পারে না। আর প্রকৃত প্রতিবন্ধক হলো, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পূর্ববর্তী উম্মতগণের মতো ধ্বংস করার ইচ্ছা পোষণ করা। সুতরাং এখন আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূরীভূত হয়ে গেল। (রূহুল মাআনী, আল-ইতকান)

কাফেরদের কেয়ামত দিবসে অন্ধ, বোবা ও বধির করে উঠানো হবে নাকি দৃষ্টিসম্পন্ন, কথক ও শ্রবণকারীরূপে?

١. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا.

٢. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. *

٣. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا.

٤. إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا.

٥. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا.

٦. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ.

٧. لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ.

অনুবাদ

১. আর কেয়ামত দিবসে আমি তাদের অন্ধ, মূক ও বধির অবস্থায় মুখ উপরি পুনরুত্থিত করব। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৯৭)

২. আর কেয়ামত দিবসে আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় পুনরুত্থিত করব। সে বলবে, হে প্রভু! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় পুনরুত্থিত করলেন, অথচ আমি দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলাম? (সূরা তোয়াহা : আয়াত ১২৪-১২৫)

৩. আর অপরাধীরা জাহান্নাম দেখল এবং তারা ধারণা করল যে, তারা তাতে পতিত হবে। (সূরা কাহাফ : আয়াত ৫৩)

৪. অগ্নি যখন দূর থেকে তাদের দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। (সূরা ফুরকান : আয়াত ১২)

৫. যখন তাদের বাঁধা অবস্থায় সেখানে সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে। (সূরা ফুরকান : আয়াত ১৩)

৬. জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করার সময় আপনি তাদের দেখবেন, অপমানে অবনত এবং অর্ধ নির্মীলিত দৃষ্টিতে তাকায়। (সূরা শূরা : আয়াত ৪৫)

৭. তুমি তো এই দ্বিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে, অতঃপর তোমার থেকে আমি পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। (সূরা কাফ : আয়াত ২২)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, কেয়ামত দিবসে কাফেরদের অন্ধ, বোবা ও বধির বানিয়ে একত্র করা হবে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেররা কেয়ামত দিবসে অন্ধ, বোবা ও বধির হয়ে উঠবে।

এভাবে ২ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, অন্ধ হয়ে উঠবে।

৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, পাপীরা জাহান্নামকে প্রত্যক্ষ করবে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, তারা অন্ধ হয়ে উঠবে না; বরং দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে উঠবে।

আয়াত নং ৪-এ উল্লেখ আছে যে, যখন জাহান্নাম তাদের দূর থেকে দেখবে, তখন তারা জাহান্নামের গর্জন ও হুংকার শুনতে পাবে। সুতরাং এর দ্বারা জানা যায় যে, কাফেররা বধির হয়ে উঠবে না; বরং শ্রবণ-ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠবে।

আয়াত নং ৫ দ্বারা জানা যায় যে, তারা বোবা হবে না; বরং উচ্চারণ-ক্ষমতার শক্তি রাখবে। কেননা, উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন এক শিকলে কয়েকজনকে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। সুতরাং উচ্চারণ-ক্ষমতা যদি না থাকত, তাহলে ডাকতে সক্ষম হতো না।

এভাবে ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা অপমানে অবনত ও অর্ধ নির্মীলিত দৃষ্টিতে তাকাবে।

এবং ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তুমি তো দুনিয়াতে কেয়ামত দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। আজ তোমার কাছ থেকে উদাসীনতার পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে তোমার দৃষ্টি আজ সুতীক্ষ্ণ হবে। সুতরাং এ দুই আয়াত দ্বারাও বোঝা গেল যে, কাফেররা কেয়ামত দিবসে অন্ধ হয়ে উঠবে না; বরং দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে উঠবে। অতএব আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : প্রথমত, অন্ধত্ব ও দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার মাঝে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হলো, তার নিরসনে তিনটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. আয়াতগুলোর মর্মার্থ সময়ের তারতম্যের ওপর নির্ভরশীল। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কাফেরদের কেয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম দৃষ্টিসম্পন্ন করে উঠানো হবে, অতঃপর অন্ধ বানিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ, তারা কবর থেকে উঠার সময় দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হবে,

তবে ময়দানে হাশরের দিকে নিয়ে যাওয়ার পর তাদের অন্ধ বানিয়ে দেয়া হবে। (রুহুল মাআনী)

২. আয়াতগুলোর মর্মার্থ স্থান ও কালের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, তারা হাশরের ময়দানে অন্ধ হয়ে উঠবে এবং যখন তাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে, তখন তারা দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হয়ে যাবে। ফলে তারা নিজেদের অবস্থা ও জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। (তাফসীরে বায়যাবী)

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর অপর বর্ণনায় এসেছে যে, কাফেররা কেয়ামত দিবসে অন্ধ হয়ে উঠার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দলীল-প্রমাণের দিক দিয়ে অন্ধ হয়ে উঠা। অর্থাৎ, কেয়ামত দিবসে তারা এমন কোনো দলীল-প্রমাণ আল্লাহর আদালতে দাঁড় করাতে পারবে না, যার মাধ্যমে তারা জাহান্নামের শাস্তি থেকে নাজাত পাবে। তখন তারা বলতে থাকবে হে আল্লাহ, দুনিয়াতে তো বড় বড় দলীল পেশ করতে সক্ষম ছিলাম। এখন কেন আপনি আমাদেরকে দলীল পেশ করা থেকে অন্ধ বানিয়ে দিলেন? এখন তো আমাদের কোনো দলীল নজরে আসছে না। (রুহুল মাআনী)

এবার বোবা ও কথক এবং বধির ও শ্রবণকারী হওয়ার যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়, তার নিরসনে দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. উপর্যুক্ত আয়াতগুলো সময়ের তারতম্যের ওপর ভিত্তিশীল। অর্থাৎ, সর্বপ্রথম তারা অনুভূতিহীন বোবা ও বধির হয়ে উঠবে। অতঃপর তাদের উচ্চারণ-ক্ষমতা ও শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দেয়া হবে, যার ফলে তারা মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে এবং জাহান্নামের গর্জন ও হুংকার শুনতে থাকবে। (সাবী, রুহুল মাআনী)

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, বধির হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কাফেররা এমন কোনো কথা শুনবে না, যার দরুন তাদের কর্ণ খুশি ও আনন্দ উপভোগ করতে পারে এবং বোবা হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তারা বোবা হবে। অর্থাৎ, দলীল-প্রমাণের ক্ষেত্রে তারা বোবা হবে। অর্থাৎ, এমন কোনো দলীল-প্রমাণ পেশ করতে পারবে না, যা আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং উল্লিখিত জবাবসমূহ বোঝে থাকলে উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর মাঝে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি থাকে না। (রুহুল মাআনী)

আসহাবে কাহাফ
ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কি বলেছিলেন?

١۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ *

٢۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ۔

অনুবাদ

১. তারা বলল, আমরা একদিন বা এক দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি।
(সূরা কাহাফ : আয়াত ১৯)

২. তারা বলল, তোমরা কি পরিমাণ অবস্থান করেছ, সে ব্যাপারে তোমাদের রবই অধিক জ্ঞাত। (সূরা কাহাফ : আয়াত ১৯)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : আসহাবে কাহাফ গুহার মধ্যে তিন শত বছরের অধিককাল ঘুমন্ত থাকার পর যখন জাগ্রত হলেন, তখন তাদের নেতা মাকসালমিনা স্বীয় সাথিগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কতকাল ঘুমিয়ে ছিলে? তার জবাবে সাথিগণ যা বললেন, তার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আসহাবে কাহাফের দুটি উক্তি উল্লেখ করেছেন।

১. لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ অর্থ: আমরা একদিন বা তদপেক্ষা কম সময় ঘুমিয়ে ছিলাম।

২. رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ অর্থ: তোমাদের পালনকর্তাই ভালো জানেন তোমরা কতকাল ঘুমিয়ে ছিলে। সুতরাং উভয় উক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল। কেননা, প্রথমোক্ত উক্তি দ্বারা জানা যায় যে, তারা নিজের পক্ষ থেকে গুহার মধ্যে ঘুমানোর সময় প্রকাশ্যভাবে বলে দিলেন। আর দ্বিতীয় উক্তি দ্বারা জানা যায় যে, সেটাকে আল্লাহ তায়ালার ইলমের প্রতি সোপর্দ করে দিলেন।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা গেল।

১. উভয় উক্তির প্রবক্তা পৃথক পৃথক। অর্থাৎ,

قَالَ بَعْضُهُمْ لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ.

কেউ কেউ বলেছেন, আমরা একদিন বা তদপেক্ষা কম সময় ঘুমে অবস্থান করেছি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তোমাদের পালনকর্তাই ভালো জানেন তোমরা কতকাল ঘুমিয়েছিলে। (রুহুল মাআনী, আবুস সঊদ)

২. উভয় উক্তির প্রবক্তা ভিন্ন ভিন্ন নয়; বরং এক। কিন্তু উভয় উক্তি পেশ করার কাল ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাল ভিন্ন হওয়ার দুটি পদ্ধতি।

ক. গুহাবাসী লোকেরা ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া মাত্রই চিন্তাভাবনা ব্যতীত لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ বলে দিলেন। অতঃপর চিন্তাভাবনায় নিমগ্ন হয়ে যখন ঘুমানোর সময় দীর্ঘ হওয়ার প্রতি অনুমান করতে পারলেন, তখন সতর্কতামূলক ও আদব রক্ষার্থে তারা তাদের উক্তিকে আল্লাহর ইলমের ওপর ছেড়ে দিয়ে رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ বলে দিলেন।

খ. ঘুমের প্রভাব ও অলসতা দূরীভূত হওয়ার পূর্বে তারা لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ বললেন। অতঃপর যখন তারা নিজেদের নখ ও চুলের প্রতি লক্ষ করে দেখলেন যে, সেগুলো বহু লম্বা ও দীর্ঘ হয়ে গেছে, তখন তারা তাদের ঘুমানোর সময়কে আল্লাহর ইলমের প্রতি সোপর্দ করলেন। সুতরাং উভয় উক্তি প্রবর্তনের কাল যেহেতু ভিন্ন, সেহেতু উক্তিদ্বয়ের মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই অবশিষ্ট নেই। (রুহুল মাআনী, জুমাল)

জান্নাতবাসীকে স্বর্ণের কংকন পরানো হবে
নাকি রৌপ্য বা মোতির কংকন?

١. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ. *

٢. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا.

٣. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. *

٤. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا.

অনুবাদ

১. তাদেরকে সেখানে স্বর্ণকংকনে অলংকৃত করা হবে। (সূরা কাহাফ : আয়াত ৩১)

২. তাদেরকে সেখানে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণকংকন ও মুক্তা দ্বারা। (সূরা হজ্জ : আয়াত ২৩)

৩. তাদেরকে সেখানে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণকংকন ও মুক্তা দ্বারা। আর তাতে তাদের পোশাক হবে রেশমি বস্ত্রের। (সূরা ফাত্বির : আয়াত ৩৩)

৪. এবং তাদেরকে অলংকৃত করা হবে রৌপ্য কংকন দ্বারা। আর তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন শারাবান তাহুরা তথা পবিত্র পানীয়। (সূরা দাহার : আয়াত ২১)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, জান্নাতবাসীকে স্বর্ণের কংকন পরিধান করানো হবে।

২ নং ও ৩ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, স্বর্ণ ও মোতির কংকন পরিধান করানো হবে।

এবং ৪ নং আয়াত দ্বারা উপলব্ধি করা যায় যে, রৌপ্যের কংকন পরিধান করানো হবে। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতগুলোর মাঝে বিদ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন কেরাত পাওয়া যায়। ১. نَصب-এর সাথে। ২. جَر-এর সাথে। যদি نَصب-এর সাথে পড়া হয়, তাহলে তার عطف হবে من শব্দের مَحَل তথা স্থানের ওপর। اَسَاوِر শব্দটি অব্যয়ের مِن مَجْرُوْر হওয়ার কারণে শব্দগতভাবে مجرور হয়েছে। যদিও غَيْر مُنْصَرِف হওয়ার কারণে তার মধ্যে نَصب-এর চিহ্ন প্রদান করা হয় এবং يُحَلَّوْنَ ক্রিয়াপদের مَفْعُوْل হওয়ার কারণে اَسَاوِر শব্দের স্থানের ওপর عطف হয়ে لُؤْلُؤًا শব্দটিও مَنْصُوْب হয়েছে। অতএব উহ্য

রূপ এভাবে হবে- يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيُحَلَّوْنَ لُؤْلُؤًا অর্থাৎ, জান্নাতবাসীকে জান্নাতে স্বর্ণের কংকন পরানো হবে এবং মোতির কংকনও পরানো হবে। অতঃপর মোতি পরানোর দুটি পদ্ধতি হতে পারে। ১. মোতির কংকন পরানো হবে। ২. মোতির হার পরানো হবে।

এভাবে যদি لُؤْلُؤْ শব্দটি مَجْرُوْر হয়, তাহলে সেটি ذَهَب শব্দের ওপর عطف হবে। তখন আয়াতের অনুবাদ হবে এভাবে যে, জান্নাতবাসীকে স্বর্ণ ও মোতি দ্বারা নির্মিত কংকন পরিধান করানো হবে। অর্থাৎ, স্বর্ণের কংকন মোতি দ্বারা সুসজ্জিত হবে। যেমন তাফসীরে জালালাইনের লেখক بِاَنْ يُّرَصَّعَ اللُّؤْلُؤُ بِالذَّهَبِ বলে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

এ ভূমিকা বর্ণনা করার পর আয়াতগুলোর মাঝে সৃষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনের ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। যার বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে হতে পারে যে, যদি উদ্দেশ্য নেয়া যায়, মোতিসমূহের কংকন হবে না; বরং মোতিসমূহের হার বা মোতিগুলোকে স্বর্ণের উপর সুসজ্জিত করা হবে, তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ও اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ-এর মাঝে অবশিষ্ট থাকে। আর যদি স্বতন্ত্রভাবে মোতির কংকন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ, اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ও اَسَاوِرَ مِنْ لُؤْلُؤْ তিনটির মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রথমে ذَهَب ও فِضَّة তথা স্বর্ণ ও রৌপ্যের মাঝে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়, তার নিরসনে পাঁচটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. আয়াতগুলোর মর্মার্থ লোকদের শ্রেণিভেদের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, স্বর্ণের কংকন জান্নাতবাসীকে পরানো হবে, আর রৌপ্যের কংকন তাদের খাদেমদের পরানো হবে।
২. রৌপ্যের কংকন শিশুদের পরানো হবে। আর স্বর্ণের কংকন মহিলাদের পরানো হবে।
৩. আয়াতগুলোর মর্মার্থ সময়ের তারতম্যের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, কখনো স্বর্ণের কংকন আবার কখনো রৌপ্যের কংকন পরানো হবে।
৪. আমলসমূহের তারতম্য অনুপাতে জান্নাতবাসীকে কংকন পরানো হবে।
৫. জান্নাতবাসীদের চাহিদা অনুপাতে তাদের কংকন পরানো হবে। অর্থাৎ, যারা স্বর্ণের কংকন পরিধান করতে চায়, তাদের স্বর্ণের কংকন এবং যারা রৌপ্যের কংকন পরিধান করতে চায়, তাদের রৌপ্যের কংকন পরানো হবে। (রুহুল মাআনী, জুমাল)

এবার ذَهَب, فِضَّة ও لُؤْلُؤْ তিনটির মাঝে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়, তার নিরসনে চারটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. প্রত্যেক জান্নাতিকে ছয়টি করে কংকন পরানো হবে। দুটি স্বর্ণের, দুটি রৌপ্যের, আর দুটি মোতির।
২. কখনো স্বর্ণের, কখনো রৌপ্যের, আর কখনো মোতির কংকন পরানো হবে।
৩. আমলসমূহের তারতম্য অনুপাতে কংকন পরানো হবে।
৪. জান্নাতিদের চাহিদা অনুপাতে কংকন পরানো হবে। (রুহুল মাআনী, জুমাল)

বনী ইসরাঈলের দুই ভাইয়ে মধ্য থেকে কাফের ভাইকে দুটি বাগান দেয়া হয়েছিল না একটি?

١. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. *

٢. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ.

অনুবাদ

১. আমি তাদের একজনের জন্যে প্রস্তুত করেছি আঙুরের দুটি বাগান। (সূরা কাহাফ : আয়াত ৩২)

২. আর সে তার বাগানে প্রবেশ করল এমতাবস্থায় যে, সে নিজের ওপর সীমালঙ্ঘনকারী। (সূরা কাহাফ : আয়াত ৩৫)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : আল্লাহ্ তায়ালা বনী ইসরাঈলের দুই ভাইয়ের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে ১ নং আয়াতে বললেন- جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ (আমি তাদের মধ্য থেকে একজনকে আঙুরের দুটি বাগান দান করলাম), তারপর বাগানদ্বয়ের গুণাগুণ বর্ণনা করলেন। অতঃপর যখন উক্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে ফরমালেন যে, বাগানের অধিকারী ব্যক্তি তার ভাইকে বাগানদ্বয়ের পরিপাটি ও সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করানোর জন্যে নিয়ে গেল 'তখন এ কথা ব্যক্ত করার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা وَدَخَلَ جَنَّتَهُ একবচনের রূপ উল্লেখ করেছেন, অথচ দ্বিবচনের রূপ ব্যবহার করা ব্যাকরণসম্মত ছিল, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, বাগান ছিল একটি। অথচ প্রথমোক্ত আয়াতে দ্বিবচনের রূপ ব্যবহার করেছেন। যার দ্বারা বোঝা যায়, বাগান একটি নয়; বরং দুটি। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর তিনটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. উভয় বাগান পরস্পরে সম্মিলিত ছিল। তাই উভয়টাকে একটি গণ্য করে আয়াতে একবচনের রূপ ব্যবহার করা হয়েছে। (তাফসীরে আবুস সঊদ)

২. বাগানের সংখ্যা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না। এজন্যে দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে দ্বিবচনের রূপ ব্যবহার করা হয়নি। (তাফসীরে আবুস সঊদ)

৩. বাগান অবশ্য দুটি ছিল, তবে উভয় বাগানে একত্রে প্রবেশ করা হয়নি; বরং একটির পর অন্যটিতে প্রবেশ করা হয়েছে। এজন্যে দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে একবচনের রূপ ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও আলোচনায় একটি এসেছে। কিন্তু উদ্দেশ্যের মধ্যে দুটিই বিদ্যমান রয়েছে। (তাফসীরে আবুস সঊদ)

কেয়ামত দিবসে পর্বতমালার কি অবস্থা হবে?

١. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً.

٢. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ.

٣. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا.

٤. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. *

٥. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ.

٦. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا.

٧. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ. *

٨. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا. *

٩. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. *

١٠. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ.

١١. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. *

١٢. وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا.

অনুবাদ

১. যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর। (সূরা কাহাফ : আয়াত ৪৭)

২. তুমি পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে কর। (সূরা নামল : আয়াত ৮৮)

৩. আর পর্বতমালা চলবে। (সূরা তূর : আয়াত ১০)

৪. আর পর্বতমালাকে পরিচালিত করা হবে। তখন তা হয়ে যাবে মরীচিকার ন্যায়। (সূরা নাবা : আয়াত ২০)

৫. আর স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন পরিচালিত হবে পর্বতমালা।
(সূরা তাকভীর : আয়াত ০৩)

৬. তারা আপনাকে প্রশ্ন করবে পর্বতমালা সম্পর্কে, সুতরাং আপনি বলুন আমার পালনকর্তা তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন। (সূরা তোয়া হা : আয়াত ১০৫)

৭. আর স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন পর্বতমালাকে চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে।
(সূরা মুরসালাত : আয়াত ১০)

৮. আর পর্বতমালাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হবে।(সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত ০৫)

৯. এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে।
(সূরা হাক্কাহ : আয়াত ৪)

১০.আর পবর্তমালা হয়ে যাবে তুলার ন্যায়। (সূরা আল-মায়ারিজ : আয়াত ০৯)

১১.আর পর্বতমালা হয়ে যাবে ধুনিত তুলার ন্যায়। (সূরা ক্বারিয়া : আয়াত ০৫)

১২.এবং পর্বতমালা হয়ে যাবে বহমান বালুস্তূপ। (সূরা মুযযাম্মিল : আয়াত ১৪)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : কেয়ামতের দিন পর্বতমালার কি অবস্থা হবে, এ ব্যাপারে উল্লিখিত আয়াতগুলো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতামুখী। কারণ, আয়াতগুলোতে আট প্রকার অবস্থার বর্ণনা রয়েছে।

১. চলা, ২. চালানো, ৩. উড়িয়ে দেয়া, ৪. ছিন্নভিন্ন করা বা তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, ৫. চূর্ণবিচূর্ণ করা, ৬. বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা, ৭. ধুনিত রঙিন পশমের মতো হওয়া, ৮. চলন্ত বালুকাস্তূপে পরিণত হওয়া।

সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে বাহ্যিক দিক দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : কেয়ামতের দিন পর্বতমালার ওপর একের পর এক উল্লিখিত অবস্থাসমূহ প্রকাশিত হবে। সর্বপ্রথম পর্বতমালাকে জমিন থেকে উচ্ছেদ করে আকাশের খোলা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে বাতাস সেগুলোকে উড়াতে থাকবে। ফলে সেগুলো মেঘমালার মতো চলতে থাকবে আকাশ সীমাতে। আর দূর থেকে দেখা যাবে ধুনিত রঙিন পশমের মতো। অতঃপর সেগুলোকে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করে ভেঙে চুরমার করে চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে, যার দরুন মনে হবে যে, পর্বতগুলো বহমান বালুকাস্তূপ। অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করা হবে। অতএব এ বিশ্লেষণ মোতাবেক উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে আর কোনো বিরোধ বাকি থাকে না। হযরত হাসান বসরী ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ থেকে এটাই বর্ণিত আছে। (রুহুল মাআনী)

কেয়ামতের দিন
কাফেরদের আমল পরিমাপ করা হবে কি?

১. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. *

২. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ.

অনুবাদ

১. তারা সেসব লোক যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলি ও তার সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, ফলে তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল হয়ে গেছে। অতএব, কেয়ামত দিবসে আমি তাদের জন্যে কোনো মাপযন্ত্র স্থাপন করব না।
(সূরা কাহাফ : আয়াত -১০৫)

২. এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে। তারা চিরকাল দোযখে বসবাস করবে। (সূরা মুমিনূন : আয়াত ১০৩)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয় যে– فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (আমি কাফেরদের জন্যে পরিমাপ (যন্ত্র) কায়েম করব না)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামতের দিন কাফেরদের আমলসমূহ পরিমাপ করা হবে না।

এবং ২ নং আয়াতে ইরশাদ হয় যে, যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা সেসব লোক যারা নিজেদের লোকসানে নিপতিত করেছে। ওরা সর্বদা জাহান্নামে থাকবে। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের আমলসমূহ পরিমাপ করা হবে। অতএব, উভয় আয়াতের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

ক. ১ নং আয়াতে অনির্দিষ্টভাবে কাফেরদের আমলসমূহ পরিমাপ করা রহিত করা হয়নি; বরং নির্দিষ্ট পরিমাপ তথা উপকারী পরিমাপ নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ হলো, তাদের আমলসমূহ পরিমাপ করা হবে, তবে উক্ত পরিমাপ দ্বারা তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো উপকার হবে না। কেননা, কাফেররা সাওয়াবের খাতিরে যে সৎকর্ম দুনিয়াতে করে থাকে, তা কবুল হওয়ার শর্তমুক্ত হওয়ায় বাতিল বলে গণ্য হবে। যদিও দেখতে বহু বড় বলে মনে হয়। এভাবে যখন তাদের আমলসমূহ পাল্লাতে রাখা হবে তখন পাল্লা ভারী হবে না; বরং হালকা হয়ে যাবে, অথচ এ কথা প্রকাশ্য যে, আমলসমূহ পরিমাপ করার দ্বারা আমলকারী ব্যক্তির ফায়দা সে সময় হয় যখন পাল্লা ভারী হয়। যেমন ইরশাদ হয়েছে যে– فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থ: যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ.

অর্থ : যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং তারা সর্বদা জাহান্নামে বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং সারকথা হলো, ১ নং আয়াতে উপকারী পরিমাপ ও ওজন করাকে নিষেধ করা হয়েছে।

আর ২ নং আয়াতে অনুপকারী পরিমাপ ও ওজন করাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব এখন আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশিষ্ট নেই। (জালালাইন শরীফ)

খ. ইখতিলাফে আশখাস তথা লোকদের শ্রেণিভেদের ওপর ভিত্তিশীল। অর্থাৎ, কাফেররা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হবে। এক শ্রেণির আমলসমূহ পরিমাপ করা হবে এবং অপর শ্রেণির আমলসমূহ পরিমাপ করা হবে না। (কুরতুবী, মাযহারী)

সৎকর্মশীল মুমিনরা
জাহান্নামে প্রবেশ করবে কি?

١. وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. *

٢. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ.

অনুবাদ

১. তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় উপনীত হবে না। এটা আপনার পালনকর্তার চূড়ান্ত ফয়সালা। (সূরা মারইয়াম : আয়াত ৭১)

২. নিশ্চয় সেসব লোক যাদের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ অগ্রগামী হয়েছে, তারা তা থেকে দূরে থাকবে। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত ১০১)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয় যে, তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে জাহান্নামে অবশ্যই দাখিল হতে হবে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নামে অবশ্যই প্রবেশ করবে; চাই সে মুমিন হোক অথবা কাফের, মুত্তাকী হোক অথবা ফাসিক, নবী হোক কিংবা উম্মত।

অথচ ২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন যে, আমার পক্ষ থেকে যাদের জন্যে কল্যাণ ও শুভ পরিণতির ফয়সালা করা হয়েছে তারা জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবে। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর তিনটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. প্রথমোক্ত আয়াতে وُرُوْد শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো حُضُوْر তথা উপস্থিত হওয়া। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত– اَلْوُرُوْدُ الْحُضُوْر এ তাফসীর হযরত ইবনে হোমাইদ (র) হযরত ইবনে উমাইর (র) থেকেও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ হবে, তোমাদের মধ্য থেকে

প্রত্যেক ব্যক্তিকে জাহান্নামের নিকটবর্তী হিসাব-নিকাশের স্থানে উপস্থিত হতে হবে।

অতএব وُرُوْد শব্দ দ্বারা قُرْب ও حُضُوْر তথা নিকটবর্তী ও উপস্থিত হওয়া উদ্দেশ্য। যেমন– وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ এ আয়াতের মধ্যে وُرُوْد শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য قُرْب ও حُضُوْر তথা নিকটবর্তী ও উপস্থিত হওয়া, যা হযরত মুসা (আ)-এর এক ঘটনার বর্ণনার ওপর অবতীর্ণ। অর্থাৎ, হযরত মুসা (আ) মাদইয়ান শহরের একটি কূপের নিকটবর্তী হয়েছেন। কূপের মধ্যে প্রবেশ করেননি। হযরত ইমাম রাযী (র) বলেন, যখন কোনো দল শহরের নিকটবর্তী হয় অথচ শহরে প্রবেশ করেনি, তখন বলা হয়– وَرَدَتِ الْقَافِلَةُ الْبَلْدَةَ.

এভাবে দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে উল্লিখিত اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ-এর মর্মার্থ এ নয় যে, সৎকর্মশীলগণ হুবহু জাহান্নাম থেকে বহু দূরে থাকবেন; বরং উদ্দেশ্য হলো, তারা জাহান্নামের নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নামের আজাব ও শাস্তি থেকে দূরবর্তী হবেন। সুতরাং এ বিশ্লেষণ অনুসারে আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি থাকে না।

(তাফসীরে কাবীর, রুহুল মাআনী, মাদারিক)

২. হযরত মুজাহিদ (র) বর্ণনা করেন যে, وُرُوْدٌ عَلَى النَّارِ দ্বারা উদ্দেশ্য দুনিয়াতে জ্বর ইত্যাদিতে আক্রান্ত হওয়া; জাহান্নামে প্রবেশ করা নয়। সুতরাং উপর্যুক্ত প্রথম আয়াতের মর্মার্থ হবে, তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি দুনিয়াতে জ্বর ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হবে। তিনি এ তাফসীর হযরত আয়েশা (রা)-এর এক রেয়ায়াত থেকে পেশ করেছেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمّٰى فَيْحُ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ. (رواه البخارى ومسلم)

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজী (স) ইরশাদ করেন, জ্বর জাহান্নামের উষ্ণতার দরুন হয়ে থাকে। সুতরাং তাকে তোমরা পানি দ্বারা ঠান্ডা করো। তবে উল্লিখিত রেওয়ায়াত দ্বারা উদ্দিষ্ট

বস্তুর ওপর দলীল পেশ করা স্পষ্ট নয়। কারণ, রেওয়ায়াতের মধ্যে وُرُوْدٌ عَلَى النَّارِ-এর কোনো অন্তরায় বিদ্যমান নেই।

(তাফসীরে খাযেন, রুহুল মাআনী)

৩. প্রথমোক্ত আয়াতে وُرُوْد দ্বারা مُرُوْر উদ্দেশ্য। হযরত হাসান ও কাতাদা (র) এর তাফসীর এটাই বর্ণনা করেন।

অর্থাৎ, সমস্ত মানুষ জাহান্নামের ওপর দিয়ে এভাবে অতিক্রম করবে যে, জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত কায়েম করা হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর বর্ণনা অনুসারে উক্ত পুলসিরাত দিয়ে মুমিনরা বিদ্যুৎগতিতে অতিক্রম করে জান্নাতে পৌঁছে যাবে, অথচ তারা টেরও পাবে না। যেমন একটি রেওয়ায়াতে এসেছে–

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ إِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةَ قَالُوْا رَبَّنَا اَلَمْ تَعِدْنَا اَنْ نَرِدَ النَّارَ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ مَرَرْتُمْ عَلَيْهَا وَهِيَ خَامِدَةٌ اَخْرَجَهُ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْحَكِيْمُ وَغَيْرُهُمْ. (روح المعانى صـ ١٢٢/١٦-)

অর্থ : হযরত খালেদ ইবনে মা'দান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তারা আরজ করবে, হে পালনকর্তা, আপনি কি আমাদের সাথে ওয়াদা করেননি যে, আমাদেরকে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করাবেন? তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হ্যাঁ ওয়াদা করেছি, তবে তা পূর্ণও করেছি, কিন্তু তোমরা তার ওপর দিয়ে এমতাবস্থায় অতিক্রম করেছ যে, সেটি নির্বাপিত ছিল। এ তাফসীর দ্বারা আয়াতদ্বয়ে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশিষ্ট থাকে না। (রুহুল মাআনী, মাদারিক)

হযরত মুসা (আ)-এর জিহ্বার জড়তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছিল কি না?

১. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ. *

২. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ.

৩. وَلَا يَكَادُ يُبِينُ.

অনুবাদ

১. তিনি বললেন, হে মুসা! আমি পূর্ণ করেছি তোমার প্রার্থনা।

(সূরা তোয়া হা : আয়াত ৩৬)

২. আর আমার ভাই হারুন, সে ভাষাগত দিক থেকে আমার তুলনায় সুস্পষ্ট ভাষী। সুতরাং তাকেও আমার সাথে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করুন।

(সূরা কাসাস : আয়াত ৩৪)

৩. এবং সে স্পষ্টভাবে কথা বলতেও সক্ষম নয়। (সূরা যুখরুফ : আয়াত ৫২)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, হে মুসা! আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করা হলো। হযরত মুসা (আ) আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন–

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ وَاجْعَلْ لِيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ هَارُوْنَ اَخِيْ.

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার ভাই হারুনকে আমার সহায়তাকারী বানিয়ে দিন।

আল্লাহ্ তায়ালা উক্ত দোয়া কবুল করে ফরমালেন– قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسٰى (হে মুসা! যে দোয়া আপনি করেছেন, তা কবুল করা হয়েছে)। অর্থাৎ, আপনার বক্ষ প্রশস্ত করা হয়েছে, আপনার জিহ্বার জড়তা দূর করা হয়েছে এবং আপনার ভাই হারুনকে আপনার সাহায্যকারী ও মদদগার বানিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুসা (আ)-এর জিহ্বার জড়তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে।

অথচ ২ ও ৩ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসা (আ)-এর জিহ্বার জড়তা একেবারে দূরীভূত হয়নি; বরং কিছু রয়ে গেছে। কেননা, হযরত মুসা (আ) নিজেই উপর্যুক্ত ২ নং আয়াতে হযরত হারুন (আ)-কে ভালো ভাষী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এভাবে ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন হযরত মুসা (আ) ফেরআউনের নিকট দীনের আহ্বান নিয়ে গেলেন, তখন ফেরআউন বলল– وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ (এ তো নিজের কথা ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারছে না)। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় যে, তার জিহ্বার জড়তা কিছু বাকি রয়ে গেছে। অতএব ২ ও ৩ নং আয়াতদ্বয় প্রথমোক্ত আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : হযরত মুসা (আ)-এর জিহ্বার জড়তা একেবারে দূর হয়ে গেছে, যেভাবে উপর্যুক্ত ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (র) ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ থেকে এ মতামত বর্ণিত আছে। আয়াত নং ২-এ মুসা (আ) হযরত হারুন (আ)-কে اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا বলে আখ্যায়িত করার ব্যাপারে দুটি জবাব দেয়া গেল।

১. হযরত মুসা (আ) হযরত হারুন (আ)-কে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করার দরখাস্ত করার সময় তাঁর জিহ্বায় জড়তা ছিল। এজন্যে সে সময় হযরত হারুন (আ)-কে তিনি اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا বলেছেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করে তাঁর জিহ্বার জড়তা দূর করেছেন।

২. যদি মেনে নেয়া যায় যে, দোয়া কবুল হওয়ার পর মুসা (আ) হারুন (আ)-কে اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا বলেছেন, তাহলে হযরত হারুন (আ) اَفْصَحُ اللِّسَانِ হওয়ার দ্বারা হযরত মুসা (আ)-এর فَصَاحَتُ لِسَانِىْ (মৌখিক প্রাঞ্জলতা) না হওয়া অত্যাবশ্যক হয় না; বরং হযরত মুসা (আ) فَصِيْحُ اللِّسَانِ ছিলেন। فَصِيْحُ اللِّسَانِ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার জিহ্বায় কোনো রকমের জড়তা নেই। আর হারুন (আ) اَفْصَحُ اللِّسَانِ ছিলেন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনো রকমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই।

এভাবে ৩ নং আয়াত وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ-এর মর্মার্থ হলো এই যে, হযরত মুসা (আ) যখন দীনের আহ্বান নিয়ে ফেরআউনের নিকট গমন করে দলীল ও প্রমাণ পেশ করেছিলেন আল্লাহর একত্ববাদের ওপর, তখন মালউন ফেরাউন প্রতারণামূলক বলছিল যে, এ তো নিজ কথা ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারছে না। যাতে তার প্রজারা হযরত মুসা (আ)-এর দিকে আকৃষ্ট না হয়। অথচ ফেরআউন জানত যে, হযরত মুসা (আ) দলীল-প্রমাণ পেশ করার দিক দিয়ে খুব শক্তিশালী ও বাকপটু। সুতরাং এ তাফসীর মোতাবেক উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। (রুহুল মাআনী, মাদারিক)

হযরত সুলাইমান (আ)-এর
অনুগত বাতাস তীব্র ছিল না মৃদু?

١. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ. *

٢. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ.

অনুবাদ

১. আর সোলাইমানের জন্যে প্রবল বায়ুকে (অনুগত করে দিয়েছি)। তার আদেশে তা প্রবাহিত হয়। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৮১)

২. তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হতো, যেখানে সে পৌঁছাতে চাইত। (সূরা সোয়াদ : আয়াত ৩৬)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : হযরত সোলাইমান (আ)-এর জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে বাতাসকে অনুগত বানিয়েছিলেন, তাকে ১ নং আয়াতে عَاصِفَةً তথা তীব্র এবং ২ নং আয়াতে رُخَاء তথা মৃদু বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. উক্ত বাতাস হযরত সোলাইমান (আ)-এর ইচ্ছানুসারে তীব্র ও মৃদু হতো। যখন হযরত সুলাইমান (আ) তীব্রগতিতে চালাবার ইচ্ছা করতেন, তখন সে বাতাস عَاصِفَةً তথা তীব্র হয়ে চলত। আর যখন হালকাগতিতে চালাবার ইচ্ছা করতেন, তখন তা হালকা হয়ে চলত। যেমন– গাড়ির চালক গাড়িকে ইচ্ছা করলে দ্রুতগতিতে চালাতে পারে এবং ইচ্ছা করলে হালকাগতিতে চালাতে পারে। ঠিক তেমনই অবস্থা ছিল সোলাইমান (আ)-এর অনুগত বাতাসের। (তাফসীরে খাযেন, রুহুল মাআনী)

২. যখন হযরত সোলাইমান (আ) নিজ গৃহ থেকে কোথাও তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন বাতাস হালকা হতো। আর যখন নিজ গৃহের দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন বাতাস তীব্রগতিতে চলত। (রুহুল মাআনী)

হযরত আইয়ুব (আ)
স্বীয় অসুস্থতায় ধৈর্যধারণ করেছেন কি না?

১. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. *

২. إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ.

অনুবাদ

১. আর স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন আইয়ুব তাঁর প্রভুকে ডাক দিয়ে বলল, হে প্রভু! আমাকে কষ্ট স্পর্শ করেছে। আর তুমি তো অধিক দয়াময় মেহেরবান। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৮৩)

২. নিশ্চয় আমি তাকে পেয়েছি ধৈর্যশীল হিসেবে। কতই না উত্তম বান্দা! নিশ্চয় সে চির প্রত্যাবর্তনশীল। (সূরা সোয়াদ : আয়াত-৪৪)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, হযরত আইয়ুব (আ) স্বীয় অসুস্থতা ও মুসিবতের অভিযোগ করে اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ (নিশ্চয় আমার কষ্ট অনুভব হচ্ছে) এ কথা প্রকাশ করেছেন। সুতরাং অসুস্থতার কষ্টের অভিযোগ প্রকাশ করা ধৈর্য ধারণ করার বিপরীত। তাই উক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অসুস্থতার দরুন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন।
আর ২ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন। কেননা, আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আমি তাঁকে ধৈর্য ধারণকারীরূপে পেয়েছি। অতএব আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।
দ্বন্দ্ব-নিরসন : হযরত আইয়ুব (আ) رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ বলা অভিযোগ নয়; বরং এটি হলো একটি দোয়া মাত্র। এজন্যেই তো আল্লাহ তায়ালা فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ শব্দ উল্লেখ করেছেন, যা দোয়া কবুল হওয়ার প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে। আল্লাহর কাছে কোনো হাজত পেশ করাকে অভিযোগ মনে করা ভুল ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। অভিযোগ তো বলা হয় মানুষ সৃষ্টজগতের সামনে নিজ দুঃখ-কষ্টের কথা প্রকাশ করা এবং তাদের সামনে হায় হায় করে অধৈর্য অবস্থায় ঘুরে বেড়ানো। সুতরাং আল্লাহর সামনে স্বীয় পেরেশানি ও মুসিবতের কথা বর্ণনা করা এবং তাঁর কাছে দয়া ও করুণা পাওয়ার দরখাস্ত পেশ করা ধৈর্য ধারণের পরিপন্থি নয়; বরং তাঁর দরবারে দরখাস্ত না করলে দরখাস্ত করবে কোন দরবারে? তিনিতো সমস্ত প্রয়োজন পুরা করেন। এজন্যেই তো হযরত আইয়ুব (আ) নিজের ব্যাধির কথা আল্লাহর দরবারে পেশ করেছেন। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। (তাফসীরে মাযহারী)

কাফেরদের ভ্রান্ত উপাস্যরা
তাদের সাথে জাহান্নামে উপস্থিত থাকবে কি না?

١. إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ. *

٢. ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا.

٣. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ.

٤. بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ وَذٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ.

অনুবাদ

১. নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর, তারা সকলে জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরা তথায় উপনীত হবে। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৯৮)

২. অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা করতে তারা কোথায়? তারা বলবে, তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে। (সূরা মুমিন : আয়াত ৭৩-৭৪)

৩. আর তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে ইতঃপূর্বে তারা যাদের ডাকত তারা। (সূরা হা-মীম সাজদা : আয়াত ৪৮)

৪. বরং তাদের কাছ থেকে তারা উধাও হয়ে গেছে। এটা ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়। (সূরা আহকাফ : আয়াত ২৮)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : আয়াত নং ১-এ কাফেরদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমরা ও তোমাদের উপাস্যরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেরদের সাথে তাদের উপাস্যরাও জাহান্নামে উপস্থিত থাকবে।

কিন্তু আয়াত নং ২-এ ইরশাদ হয়েছে যে, জাহান্নামীদের জাহান্নামে জিজ্ঞাসা করা হবে ঐ উপাস্যরা কোথায়, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করতে? তখন তারা জবাবে বলবে– ضَلُّوْا عَنَّا (তারা আমাদের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে)।

এভাবে ৩ ও ৪ নং আয়াত দ্বারাও অদৃশ্য হওয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং ১ নং আয়াত শেষোক্ত আয়াতগুলোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন

১. আয়াতগুলো اِخْتِلَافِ زَمَان তথা সময়ের তারতম্যের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, প্রথমে কাফেরদের নজর থেকে তাদের বাতিল উপাস্যরা অদৃশ্য থাকবে। অতঃপর যখন বলবে– ضَلُّوْا عَنَّا তখন তাদের বাতিল উপাস্যদের তাদের নিকট উপস্থিত করা হবে। ফলে উপাসনাকারী ও উপাস্য বস্তু একত্রে জাহান্নামে বিদ্যমান থাকবে।(তাফসীরে আবুস সঊদ, জালালাইন শরীফ)

২. اِخْتِلَافِ مَكَان তথা স্থানের তারতম্যের ওপর ভিত্তিশীল। অর্থাৎ, জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর থাকবে। কোনো কোনো স্তরে কাফেরদের উপাস্যরা তাদের সাথে উপস্থিত থাকবে। আবার কোনো কোনো স্তরে তাদের দৃষ্টি থেকে অনুপস্থিত হয়ে যাবে। (রুহুল মাআনী)

কেয়ামত দিবসে
আকাশমণ্ডলীর কি অবস্থা হবে?

١. يَوۡمَ نَطۡوِى السَّمَاۤءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلۡكُتُبِ.

٢. وَالسَّمَاوَاتُ مَطۡوِيَّاتٌۢ بِيَمِيۡنِهٖ. *

٣. وَيَوۡمَ تَشَقَّقُ السَّمَاۤءُ بِالۡغَمَامِ وَنُزِّلَ الۡمَلٰۤئِكَةُ تَنۡزِيۡلًا.

٤. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاۤءُ فَكَانَتۡ وَرۡدَةً كَالدِّهَانِ.

٥. فَيَوۡمَئِذٍ وَّقَعَتِ الۡوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاۤءُ فَهِىَ يَوۡمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ.

٦. فَكَيۡفَ تَتَّقُوۡنَ إِنۡ كَفَرۡتُمۡ يَوۡمًا يَّجۡعَلُ الۡوِلۡدَانَ شِيۡبًا السَّمَاۤءُ مُنفَطِرٌۢ
بِهٖ كَانَ وَعۡدُهٗ مَفۡعُوۡلًا.

٧. إِذَا السَّمَاۤءُ انۡفَطَرَتۡ.

٨. إِذَا السَّمَاۤءُ انۡشَقَّتۡ. *

٩. يَوۡمَ تَمُوۡرُ السَّمَاۤءُ مَوۡرًا *

١٠. يَوۡمَ تَكُوۡنُ السَّمَاۤءُ كَالۡمُهۡلِ. *

١١. وَإِذَا السَّمَاۤءُ فُرِجَتۡ.

١٢. وَفُتِحَتِ السَّمَاۤءُ فَكَانَتۡ أَبۡوَابًا. *

١٣. وَإِذَا السَّمَاۤءُ كُشِطَتۡ.

অনুবাদ

১. যেদিন আমি নভোমণ্ডলকে গুটিয়ে নেব লিখিত কাগজপত্রকে গুটানোর ন্যায়। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত ১০৪)

২. আর নভোমণ্ডল তার ডান হাতে গুটানো। (সূরা যুমার : আয়াত ৬৭)

৩. সেদিন মেঘমালাসহ আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদের নামিয়ে দেয়া হবে। (সূরা ফুরকান : আয়াত ২৫)

৪. যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, তখন তা হয়ে যাবে ধোঁয়াচ্ছন্ন প্রান্তরের ন্যায়। (সূরা আর-রহমান : আয়াত ৩৭)

৫. সেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে। আর আকাশ বিদীর্ণ হবে অতএব সেদিন তা মূল্যহীন। (সূরা হাককাহ : আয়াত ১৫-১৬)

৬. সুতরাং তোমরা কীভাবে আত্মরক্ষা করবে যদি সেদিনকে অস্বীকার কর, যেদিন বালককে যুবক বানিয়ে দেবে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, আর তার ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (সূরা মুযযাম্মিল : আয়াত ১৭-১৮)

৭. স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। (সূরা ইনফিতার : আয়াত ০১)

৮. স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। (সূরা ইনশিকাক : আয়াত ০১)

৯. যেদিন নভোমণ্ডল উড়তে থাকবে। (সূরা তূর : আয়াত ০৯)

১০. যেদিন আকাশসমূহ হয়ে যাবে গলিত তামার ন্যায়। (সূরা মাআরিজ : আয়াত ০৮)

১১. আর যখন আসমান ছিদ্রযুক্ত হবে। (সূরা মুরসালাত : আয়াত ০৯)

১২. আর আকাশকে খুলে দেয়া হবে, তখন তা হয়ে যাবে বহু দরজাবিশিষ্ট। (সূরা নাবা : আয়াত ১৯)

১৩. আর যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে। (সূরা তাকভীর : আয়াত-১১)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ ও ২ নং আয়াত থেকে জানা যায় যে, কেয়ামতের দিন আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে দেয়া হবে।

৩ থেকে ৮ নং পর্যন্ত আয়াতগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে, সেগুলো ফেটে যাবে।

৯ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, থরথর করে কাঁপতে থাকবে।

১০ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, আকাশসমূহ গলিত তামার মতো হয়ে যাবে।

১১ ও ১২ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে।

এবং ১৩ নং আয়াতে বলা হয় যে, আকাশমণ্ডলীর আবরণ অপসারিত করা হবে। এভাবে ৪ নং আয়াতে এটাও বলা হয় যে, আকাশসমূহ রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার মতো হয়ে যাবে। সুতরাং আয়াতগুলোতে পরস্পর দ্বন্দ্ব হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : কেয়ামতের দিন আকাশমণ্ডলীর কি অবস্থা হবে, এ ব্যাপারে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে যে সামঞ্জস্য বোঝে আসে তা হলো, কেয়ামতের দিন আকাশসমূহের ওপর বিভিন্ন অবস্থা ও বিকৃতি সংঘটিত হবে। সর্বপ্রথম আকাশসমূহ জাহান্নামের উষ্ণতা বা আল্লাহ তায়ালার ক্রোধের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে লাল বর্ণ ধারণ করবে। এটাকে فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রচণ্ড লাল হওয়ার কারণে কিছুটা কালো বর্ণের প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে যাবে। সেজন্যে يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (গলিত তামার মতো) বলা হয়েছে। এভাবে একের পর এক অন্যান্য রঙেও রঙিন হতে থাকবে। যেমন ইবনে কাসীর হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর থরথর করে কাঁপতে থাকবে। এরপর ফেটে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে একেবারে ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। যা প্রথমোক্ত দুই আয়াতে আলোচিত হয়েছে। আকাশসমূহের উল্লিখিত অবস্থা ও বিকৃতি হযরত ইসরাফীল (আ) প্রথম দফা শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার দরুন সংঘটিত হবে। অতঃপর দ্বিতীয় দফা শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার ফলে পুনরায় আকাশ-পাতালের সৃষ্টির বিকাশ ঘটবে'। তখন আকাশমণ্ডলীর দরজাসমূহ উন্মুক্ত থাকবে, যার ফলে আকাশের উপরিভাগের সকল বস্তু নজরে আসবে এবং উক্ত দরজা দিয়ে ফেরেশতাগণের অবতরণ ও সাদা জলধর অবতরণ হবে, যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার তাজাল্লী উদ্ভাসিত হবে। এটাকেই ৩, ১১, ১২ ও ১৩ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

কেয়ামতের যলযলার সময়
মানুষের ওপর মাতলামি আপতিত হবে কি?

١۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى.

অনুবাদ

১. আর তুমি মানুষদের দেখবে উন্মত্ত। মূলত তারা উন্মত্ত নয়।

(সূরা হজ্জ : আয়াত ০২)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উল্লিখিত আয়াতে প্রথমাংশে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের যলযলার সময় আপনি (নবীজী স.) লোকদেরকে মাতাল অবস্থায় দেখবেন। অথচ দ্বিতীয়াংশে বলা হয়, তারা মাতাল নয়। সুতরাং উক্ত আয়াতের প্রথমাংশ দ্বিতীয়াংশের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল। প্রথমাংশে মাতাল হওয়া প্রমাণিত হয়, আর দ্বিতীয়াংশে তা রহিত হয়।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : উপর্যুক্ত আয়াতে কেয়ামত দিবসে মানবসমাজের মাতলামি প্রমাণিত ও রহিত হওয়ার দিকগুলো ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমাংশে মাতলামি সাব্যস্ত করা হয়েছে বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে। আর দ্বিতীয়াংশে রহিত করা হয়েছে বাস্তবতার নিরিখে। অর্থাৎ, সেদিন মানবসমাজের ওপর আল্লাহর আজাবের প্রভাব এ পরিমাণ প্রতিপন্ন হবে যে, তারা বেহুঁশ হয়ে মাতলামিতে ঢুকে পড়বে এবং তাদের বুদ্ধিমত্তা বিনষ্ট হয়ে যাবে। ফলে মনে হবে যে, তারা মাতাল অবস্থায় বিরাজ করছে, অথচ তারা মাতাল নয়। কেননা, তারা তো বাস্তবে নেশাদায়ক কোনো বস্তু পান করেনি। যেমন হযরত হাসান বসরী (র)-এর বর্ণিত তাফসীরে উল্লেখ আছে–

تَرَى النَّاسَ سُكَارٰى مِنَ الْخَوْفِ، وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى مِنَ الشَّرَابِ.

অতএব, এ বর্ণনার পর আয়াতটির প্রথমাংশ ও দ্বিতীয়াংশের মাঝে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি নেই। (তাফসীরে মাদারিক, খাযেন)

কেয়ামত দিবসের পরিমাণ কতটুকু?

١. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ.

٢. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. *

٣. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ.

অনুবাদ

১. আর আপনার পালনকর্তার নিকট একদিন আপনাদের গণনায় এক হাজার বছরের ন্যায়। (সূরা হজ্জ : আয়াত ৪৭)

২. আর তিনি আকাশ থেকে জমিন পর্যন্ত সবকিছু পরিচালনা করেন। অতঃপর তা তার নিকট এমন একদিনে পৌঁছবে, যা তোমাদের গণনায় একহাজার বছরের সমান। (সূরা সাজদা : আয়াত ০৫)

৩. ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। (সূরা আল-মাআরিজ : আয়াত ০৪)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ ও ২ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, কেয়ামত দিবসের পরিমাণ একহাজার বছর হবে।

অথচ ৩ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামত দিবসের পরিমাণ একহাজার বছর নয়; বরং পঞ্চাশ হাজার বছর। সুতরাং শেষোক্ত আয়াতটি প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. আয়াতগুলো اِخْتِلَافُ الْمَكَانِ তথা স্থানের তারতম্যের ওপর ভিত্তিশীল। যেভাবে বর্তমান দুনিয়াতে কোনো কোনো স্থানে দিন বড় হয় আবার কোনো কোনো স্থানে ছোট হয়, সেভাবে কেয়ামতের দিবসটিও কোনো স্থানে ছোট হয়ে পৃথিবীর একহাজার বছর পরিমাণ দীর্ঘকাল হবে। আবার কোনো স্থানে বড় হয়ে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছর পরিমাণ দীর্ঘ হবে। সুতরাং আয়াতগুলোতে এখন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। (তাফসীরে বয়ানুল কুরআন)

২. কেয়ামত দিবস শুধু একদিন নয়; বরং বহু দিবসের ওপর পরিব্যাপ্ত হবে। সে দিবসগুলোতে কোনোটি পঞ্চাশ হাজার বছর সমপরিমাণ হবে, আবার কোনোটি একহাজার বছর সমপরিমাণ হবে। (হাশিয়ায়ে জালালাইন)

সমস্ত ফেরেশতাকে বার্তাবাহক বানানো হয়েছে নাকি কোনো কোনো ফেরেশতাকে?

١. اللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا. *

٢. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا.

অনুবাদ

১. আল্লাহ্ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে রাসূল নির্বাচন করেন। (সূরা হজ্জ : আয়াত ৭৫)

২. সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা। ফেরেশতাদের করেছেন বার্তাবাহক। (সূরা ফাত্বির : আয়াত ০১)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, কিছু কিছু ফেরেশতাকে আল্লাহ্ তায়ালা বার্তাবাহক হিসেবে নির্বাচন করেছেন। কেননা, উক্ত আয়াতে مِنْ-টি تَبْعِيْضِيَّة-এর জন্যে ব্যবহার হয়েছে, যা কোনো বস্তুর অংশ বোঝানোর প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে।

২ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, সকল ফেরেশতাকে বার্তাবাহক বানানো হয়েছে। কেননা, সে আয়াতে مِن-টি تَبْعِيْضِيَّة-এর জন্যে ব্যবহার হয়নি। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১ নং আয়াতে رُسُلًا اِلٰى بَنِىْ آدَمَ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির নিকট কিছু কিছু ফেরেশতাকে বার্তবাহকরূপে পাঠিয়েছেন এবং এ কাজের জন্যে নির্বাচন করেছেন।

আর ২ নং আয়াতে সমস্ত ফেরেশতাকে বার্তাবাহক বানোনো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফেরেশতাদের পরস্পর একের জন্যে অপরকে বার্তাবাহক বানানো। অথবা প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লিখিত رُسُلًا দ্বারা উদ্দেশ্য رُسُلًا اِلَى الْاَنْبِيَاءِ অর্থাৎ, আল্লাহ নবীগণের প্রতি কোনো কোনো ফেরেশতাকে বার্তাবাহকরূপে নির্বাচন করেছেন এবং দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে উল্লিখিত اَلْمَلَائِكَة শব্দের শুরুতে بَعْض শব্দটি مُضَاف হিসেবে উহ্য রয়েছে। সুতরাং এবার এ আয়াত দ্বারাও কোনো কোনো ফেরেশতা বার্তাবাহক হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যায়, যারা নবীগণের নিকট প্রেরিত হয়েছেন। (তাফসীরে কাবীর, সাবী, জুমাল)

আদ সম্প্রদায়ের ওপর কী শাস্তি এসেছিল?

١. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. *

٢. فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.

٣. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ.

٤. بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.

٥. وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.

٦. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ.

٨. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.

অনুবাদ

১. অতঃপর সত্যই তাদেরকে বিকট আওয়াজ পাকড়াও করল। আর আমি তাদেরকে পরিণত করেছি আবর্জনায়। অতএব ধ্বংস জালেম সম্প্রদায়ের জন্যে। (সূরা মুমিনূন : আয়াত ৪১)

২. অতএব আপনি বলুন, আমি তোমাদের ভয়প্রদর্শন করছি কওমে আদ ও ছামূদের শাস্তির ন্যায় এক কঠিন শাস্তির। (সূরা হা-মীম সাজদা : আয়াত-১৩)

৩. অতঃপর কিছু অশুভ দিনে আমি তাদের ওপর ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করলাম। (সূরা হা-মীম সাজদা : আয়াত ১৬)

৪. বরং এটা তা-ই যা তোমরা দ্রুত কামনা করছিলে। তা এমন বায়ু যাতে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (সূরা আহকাফ : আয়াত ২৪)

৫. এবং কওমে আদের মাঝে যখন আমি তাদের ওপর প্রেরণ করেছি নিষ্ফল বায়ু। (সূরা যারিয়াত : আয়াত ৪১)

৬. নিশ্চয় আমি তাদের ওপর প্রেরণ করেছি ঝঞ্ঝাবায়ু এক চিরাচরিত অশুভ দিনে। (সূর ক্বামার : আয়াত ১৯)

৭. আর আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। (সূরা হাককাহ : আয়াত ০৬)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপর্যুক্ত আয়াতগুলো আদ সম্প্রদায়ের শাস্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে তাদেরকে কোন বস্তুর মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, এ ব্যাপারে আয়াতগুলো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী।

১ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, বিকট আওয়াজের মাধ্যমে তাদের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

২ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, বিদ্যুৎচমকের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

এবং ৫ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, বাতাস, তুফান, তীব্র তুফান, বরকতশূন্য বাতাস বা সীমাতিরিক্ত তুফানের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

১. মূলত তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল তুফানের মাধ্যমে, তবে এটাকে প্রথমোক্ত দুই আয়াতে صَيْحَة ও صَاعِقَة দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে এ হিসেবে যে, صَيْحَة ও صَاعِقَة আভিধানিকভাবে সাধারণ শাস্তি বোঝানোর জন্যে ব্যবহার হয়। (হাশিয়ায়ে জালালাইন)
২. হযরত জিবরাঈল (আ)-এর বিকট আওয়াজ ও তীব্র তুফানের মাধ্যমে তাদের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। (হাশিয়ায়ে জালালাইন)

কেয়ামত দিবসে মানবসমাজ একে অপরকে কোনো প্রশ্ন করবে কি না?

١. فَلَآ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ. *

٢. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ.

٣. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ.

٤. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ.

অনুবাদ

১. সেদিন তাদের মাঝে কোনো বংশপরিচয় থাকবে না, এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না। (সূরা মুমিনূন : আয়াত ১০১)

২. এবং তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসা করবে। (সূরা আস-সাফফাত : আয়াত ২৭)

৩. অতঃপর তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসা করবে।

৪. এবং তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসা করবে। (সূরা তূর : আয়াত ২৫)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে تَسَاؤُل অর্থাৎ, কেয়ামত দিবসে মানবসমাজ একে অপর থেকে কিছু চাওয়ার আবেদন করাকে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ শেষোক্ত তিন আয়াতে تَسَاؤُل-কে সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং ১ নং আয়াত ও শেষ ৩ আয়াতের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১. আয়াতগুলো অবস্থা ও স্থানের তারমত্যের ওপর ভিত্তিশীল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামত দিবসে বিভিন্ন স্থানে লোকসমাজ বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হবে। যেমন– কোনো কোনো স্থানে লোক সমাজের ওপর কেয়ামত দিবসের কঠিন শাস্তি এমনভাবে প্রতিপন্ন হবে যে, তখন প্রত্যেকেই يَا نَفْسِىْ يَا نَفْسِىْ অযিফা জপতে থাকবে। সে সময় কেউ কারো নিকট কোনো রকমের সওয়াল করতে সক্ষম হবে না। আবার কোনো কোনো স্থানে লোকদের ওপর কেয়ামতের ভয়ানক

অবস্থা লাঘব করে দেয়া হবে। তখন একে অপরের কাছে সওয়াল করার চেষ্টা করবে। (হাশিয়ায়ে জালালাইন)

২. আয়াতগুলো সময়ের তারতম্যের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, ইসরাফীল (আ) প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পরবর্তী সময়ে কোনো মানুষ অপরের নিকট কোনো বিষয়ে সওয়াল করার কোনো সুযোগ পাবে না। কিন্তু দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর যখন মানবসমাজ জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্র হবে, তখন একে অপরের নিকট সওয়াল বা কথাবার্তা বলার সুযোগ পাবে। এ তাফসীরও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। (রূহুল মাআনী)

৩. দুটি দুই বিষয়ের প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ, কাফেররা কেয়ামতের বংশ পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন করবে না। কিন্তু অন্যান্য অবস্থা নিয়ে পরস্পর প্রশ্ন করবে। ফলে نَفْى ও اِثْبَات দুটি আলাদা বিষয়ে হওয়ার কারণে কোনো বিরোধ থাকল না।

উপরিউক্ত আলোচনা হলো কাফেরদের পারস্পরিক প্রশ্ন সম্পর্কে। শেষ দুটি আয়াত জান্নাতীদের সম্পর্কে। এর ব্যাখ্যা হলো,

আয়াতগুলো اِخْتِلَافُ الْأَشْخَاص তথা লোকে তারতম্যের ওপর ভিত্তিশীল। অর্থাৎ, কাফের ও মুশরিকরা একে অপরের নিকট কেয়ামত দিবসে কোনো সওয়াল করতে পারবে না। কিন্তু জান্নাতী লোকেরা একে অপরের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে সওয়াল করতে কোনো বাধা নেই।

যেনাকারীর সঙ্গে সতী নারীর বিবাহ বৈধ কি না?

١. اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ. *

٢. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ.

অনুবাদ

১. ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারীকেই বিবাহ করবে। আর ব্যভিচারিণী কেবল ব্যভিচারী বা মুশরিক পুরুষকেই বিবাহ করবে। আর তা মুমিনদের ওপর হারাম করা হয়েছে। (সূরা নূর : আয়াত ০৩)

২. তোমাদের মধ্য থেকে অবিবাহিতদের বিবাহ দিয়ে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরও। (সূরা নূর : আয়াত ৩২)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করতে পারবে। এভাবে ব্যভিচারিণী মহিলা ব্যভিচারী পুরুষের সাথে বা মুশরিক পুরুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে এবং মুমিনগণের জন্যে ব্যভিচারিণী মহিলাকে বিবাহ করা হারাম করা গেল। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সৎ ও নেককার পুরুষ যেনাকারিণী মহিলার সাথে এবং সতী নারী যেনাকারী পুরুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম।

কিন্তু ২ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, তোমরা অবিবাহিতদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দাও। এ নির্দেশটি শর্তহীন। তার মধ্যে ব্যভিচার ও সৎ হওয়ার কোনো শর্ত যুক্ত করা হয়নি। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় যে, যেনাকারী ও সতী নারীর মাঝে বিবাহবন্ধন হতে পারে। পক্ষান্তরে সৎ ব্যক্তি ও ব্যভিচারী মহিলার মাঝেও বিবাহবন্ধন হতে পারে। অতএব আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ক. ১ নং আয়াত ২ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। প্রথমত, সৎলোক ও যেনাকারীণী মহিলা এভাবে যেনাকারী পুরুষ ও সতী নারীর সাথে বিবাহবন্ধন হারাম ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায় এবং সাধারণ নির্দেশ অবতরণ হয়– وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ (জালালাইন)
অতএব রহিতকরণের পর আয়াতদ্বয়ের মাঝে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই।

খ. প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হলো, যেনাকারী পুরুষ ও সতী নারী কুফূ এর দিক দিয়ে সমান নয়। এভাবে ব্যভিচারিণী মহিলা ও সৎপুরুষ কুফূ এর দিক দিয়ে সমান নয়। সুতরাং ওদের মাঝে বিবাহবন্ধন তো শরয়ীভাবে বৈধ, তবে কুফূ এর দিক দিয়ে অমিল হওয়ার কারণে অনুচিত হয়ে দাঁড়ায় এবং حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ-এর মধ্যে ذٰلِك শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে زِنَا ও شِرْك-এর দিকে। نِكَاح زَوَانِى (যেনাকারীদের বিবাহবন্ধন)-এর দিকে নয়। সুতরাং আয়াতের এ অংশের মর্মার্থ হবে, যেনা ও শিরক করা মুমিনদের ওপর হারাম করা গেল। অতএব, এ আয়াত যেনাকার ও সতী নারীর মাঝে বিবাহ হারাম হওয়ার ওপর নির্দেশনা প্রদানকারী নয়। ফলে আয়াতটি দ্বিতীয়োক্ত আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বীও হবে না। (আল-ফাওযুল কাবীর)

শয়তানরা ফেরেশতাদের কথা শুনতে পায় কি না?

١. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ. *

٢. يُلْقُوْنَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُوْنَ.

অনুবাদ

১. তাদের শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। (সূরা শুআরা : আয়াত ২১২)

২. তারা শ্রুত কথা এনে দেয়। তাদের অধিকাংশই মিথ্যা। (সূরা শুআরা : আয়াত ২২৩)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, নিশ্চয় তারা অর্থাৎ শয়তানরা ফেরেশতাগণের উক্তি শ্রবণ করা থেকে বঞ্চিত। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, শয়তানরা ফেরেশতাগণের উক্তি শুনতে সক্ষম নয়।

অথচ ২ নং আয়াতে ইরশাদ হয় যে, শয়তানরা ফেরেশতাদের থেকে শ্রবণকৃত কথাগুলোকে গণকদের নিকট পৌঁছে দেয়। অথচ সেগুলোর অধিকাংশই মিথ্যা হয়ে থাকে। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, শয়তানরা ফেরেশতাগণের কথা শুনতে সক্ষম। অতএব আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১. হুজুর (স)-এর জন্মের পূর্বে শয়তানরা আকাশসীমা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হতো এবং ফেরেশতাগণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যেসব বিষয়ে আলাপ করতেন, তা শ্রবণ করে তার সাথে মিথ্যা যুক্ত করে গণকদের কানে পৌঁছে দিত। ফলে গণকরা সেসব বিষয় সম্পর্কে লোকদের সংবাদ দিত। যেমন– গণকরা লোকদের বলত, অমুক দিবসে বৃষ্টি হবে, অমুক দিবসে ভূমিকম্প হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। অতঃপর তাদের কিছু কথা বা ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হতো, আবার কিছু কথা মিথ্যা প্রমাণিত হতো। হুজুর (স)-এর

জন্মের পর শয়তানদের আকাশে পৌঁছতে এবং ফেরেশতাগণের কথা বা ভবিষ্যদ্বানী শ্রবণ করতে বাধা দেয়া হয়।

অতএব যখন কোনো শয়তান আকাশে যেতে চেষ্টা করতো, তখন তাকে দীপ্তিমান অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করা হতো। ফলে সে ধ্বংস, আঘাতপ্রাপ্ত বা পাগল হয়ে যেত।

সারকথা হলো, শয়তানরা ফেরেশতাগণের আলাপ শ্রবণের বিষয়টি নবীজী (স)-এর জন্মের পূর্ববর্তী সময়ের ওপর ভিত্তিশীল। আর ফেরেশতাগণের আলাপ শ্রবণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি নবীজী (স)-এর আবির্ভাবের পরবর্তী সময়ের ওপর ভিত্তিশীল। সুতরাং এখন আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। (তাফসীরে জালালাইন, সাবী)

২. শয়তানরা ফেরেশতাগণ থেকে ঐ সমস্ত কথা শুনতে পায়, যা সৃষ্টিজগতের ইসলাহ বা সংশোধনের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। তবে ঐ সমস্ত কথা শুনতে সক্ষম নয়, যেগুলো সৃষ্টিজগতের ইসলাহ ও সংশোধনের সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্ক রাখে। (বয়ানুল কুরআন)

সোলাইমান (আ) শুধু পাখির ভাষা
বুঝতেন নাকি অন্যান্য প্রাণীরও?

১. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ. *

২. قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا.

অনুবাদ

১. আর সোলায়মান উত্তরাধিকারী হলো দাউদের। সে বলল, হে লোকসকল! আমাকে শেখানো হয়েছে পাখির ভাষা। (সূরা নামল : ১৬)

২. এক পিপীলিকা বলল, হে পিঁপড়ার দল! তোমরা তোমাদের ঘরে প্রবেশ করো। সোলায়মান ও তাঁর সেনাবাহিনী যেন তোমাদের পিষে না ফেলে বেখায়ালে। তখন সোলায়মান হেসে বললেন তার কথায়। (সূরা নামল : আয়াত ১৮-১৯)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত সোলাইমান (আ)-কে পাখির ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি শুধু পাখির ভাষা বুঝতেন।

এবং ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি পিপীলিকার কথা শুনে হাসতে লাগলেন, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি পিপীলিকার ভাষাও বুঝতেন। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১. আয়াতে উল্লিখিত পিপীলিকাগুলো দুটো ডানাবিশিষ্ট ছিল। যেভাবে ইমাম শাবী ও হযরত কাতাদা (র) বর্ণনা করেছেন। এ হিসেবে সেগুলোকেও পাখির মধ্যে গণ্য করা যায়। এভাবে অনেক পিপীলিকার পাখা থাকে, যা দ্বারা তারা উড়তে সক্ষম হয়। (রুহুল মাআয়ানী)

২. হযরত সোলাইমান (আ) অধিকাংশ সময় পাখিদের ভাষা বুঝতেন, তবে কোনো কোনো সময় অন্যান্য প্রাণীর ভাষাও বুঝতেন। সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াত এ কথা বোঝায় না যে, হযরত সুলাইমান শুধু পাখির কথা বুঝতেন; অন্যান্য প্রাণীর কথা বুঝতেন না। কেননা, এক বস্তু সাব্যস্ত করার দ্বারা অপর বস্তু রহিত হয়ে যায় না এবং আয়াতে উল্লিখিত عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ দ্বারা এ কথা অত্যাবশ্যকও হয় না যে, হযরত সোলাইমান (আ) পাখি ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর কথা কোনো সময় বুঝতেন না। (রুহুল মাআনী)

ইসরাফীল (আ)-এর প্রথম শিঙ্গা ফুঁকে
লোকজন আতঙ্কিত হবে, না মৃত্যুবরণ করবে?

١. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. *

٢. وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ.

অনুবাদ

১. যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, অতঃপর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা রয়েছে, তারা সকলেই ভীতবিহ্বল হয়ে যাবে। (সূরা নামল : আয়াত ৮৭)

২. শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। ফলে আসমান ও জমিনে যারা আছে, সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে। (সূরা যুমার : আয়াত ৬৮)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসরাফীল (আ)-এর প্রথম শিঙ্গা ফুঁকে লোকসমাজের মাঝে আতঙ্ক ও ভয়ের সৃষ্টি হবে।

আর ২ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, লোকসমাজ বেহুঁশ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেননা, জালালাইন শরীফের লেখক এ আয়াতে صَعِقَ শব্দের তাফসীর مَاتَ শব্দ দিয়ে করেছেন। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ইসরাফীলের শিঙ্গা ফুঁকে প্রথমে মানুষের মাঝে আতঙ্ক ও ভয়ের সৃষ্টি হবে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে সব মৃত্যুমুখে পতিত হবে। প্রাথমিক অবস্থা প্রথম আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর চূড়ান্ত অবস্থা তথা মৃত্যুর সুধা পান করার কথা শেষোক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। (তাফসীরে জালালাইন)

হযরত মুসা (আ)-এর ব্যাপারে
তাঁর মাতা কোনো আশঙ্কা করেছিলেন কি?

١. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي.

অনুবাদ

১. অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আকাঙ্ক্ষা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করবে। আর ভয় করো না এবং দুঃখও করো না।

(সূরা কাসাস : আয়াত ০৭)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : উপর্যুক্ত আয়াতটির প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়। উক্ত বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিশ্লেষণ এভাবে করা যায় যে, হযরত মুসা (আ) জন্ম লাভ করেছেন এমন সময়ে যখন ফেরআউন বনী ইসরাঈলের নবজাতক শিশুদের হত্যা করছিল। ফেরআউনের এ অসৎ কর্মের দরুন মুসা (আ)-এর আম্মাজান স্বীয় পুত্রের ব্যাপারে আশঙ্কা করছিলেন। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, তুমি এ শিশুটির ব্যাপারে যখন কোনো আশঙ্কা বা ভয় অনুভব করবে, তখন তাকে সিন্ধুকের মধ্যে ঢুকিয়ে তালাবদ্ধ করে নদীতে নিক্ষেপ করে দিবে এবং তখন তুমি ভীত-পেরেশান হয়ো না। সুতরাং আয়াতের প্রথম অংশ দ্বারা বোঝা যায় যে, মুসা (আ)-এর ব্যাপারে তাঁর মাতা আশঙ্কা করেছেন।

আর দ্বিতীয় অংশ দ্বারা বোঝা যায় যে, কোনো আশঙ্কা করেননি। এজন্যে বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয় অংশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : উপর্যুক্ত আয়াতের প্রথম অংশে হত্যার আশঙ্কা করা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশে নদীর পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয়কে রহিত করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ হলো এই যে, হে মুসার মাতা! তুমি যদি জালেম ফেরআউনের পক্ষ থেকে তোমার সন্তানের ব্যাপারে হত্যার আশঙ্কা কর, তাহলে তাকে নীল নদীতে ফেলে দিবে এবং সেখানে তার ব্যাপারে ডুবে যাওয়ার কোনো ভয় অনুভব করবে না। আমি আল্লাহ তার হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এবার আয়াতটির উভয় অংশে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি নেই। (জুমাল)

প্রিয়নবী (স) কাউকে হেদায়াত করতে পারেন কি?

١. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ.

٢. وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ. *

٣. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ

১. নিশ্চয় আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকেই সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে হেদায়াত দান করেন। (সূরা কাসাস : আয়াত ৫৬)

২. আর আপনি অন্ধ লোকদেরকে তাদের ভ্রষ্টতা থেকে হেদায়াত দান করতে পারবেন না। (সূরা রূম : আয়াত ৫৩)

৩. আর নিশ্চয় আপনি সরল-সঠিক পথের দিকে হেদায়াত দান করতে পারবেন। (সূরা শূরা : আয়াত ৫২)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : প্রথমোক্ত দুই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রিয়নবী (স) কাউকে হেদায়াত প্রদান করতে পারেন না।

অথচ শেষোক্ত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, তিনি সরল পথের দিকে হেদায়াত প্রদান করতে পারেন। সুতরাং শেষোক্ত আয়াতটি প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : হেদায়াত শব্দের দুটি অর্থ আছে। যথা– ১. اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ তথা উদ্দিষ্ট বস্তু পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। যাকে خَلْقُ اِهْتِدَاء তথা হেদায়াত সৃষ্টি করা বলে বিশ্লেষণ করা হয়। ২. اِرَاءَةُ الطَّرِيْق তথা পথ দেখানো।

১ ও ২ নং আয়াতে হেদায়াত শব্দ প্রথম অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর ৩ নং আয়াতে হেদায়াত শব্দ দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতগুলোর মর্মার্থ হবে এটা যে, প্রিয়নবী (স) কোনো ব্যক্তিকে উদ্দিষ্ট বস্তু তথা গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌছাতে পারবেন না। তবে গন্তব্যস্থলে উপনীত হওয়ার পথের সন্ধান অবশ্যই দিতে পারবেন। (হাশিয়ায়ে সাবী)

প্রিয়নবী (স)-এর জন্যে নয়জন পবিত্রতমা পত্নীর অতিরিক্ত কোনো পত্নী গ্রহণ করা বৈধ ছিল কি?

١۔ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ. *

٢۔ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ.

অনুবাদ

১. হে নবী, আপনার জন্যে আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেছেন। (সূরা আহযাব : আয়াত ৫০)

২. এরপর আপনার জন্যে কোনো নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয়। (সূরা আহযাব : আয়াত ৫২)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী (স)-এর নয়জন পবিত্রতমা পত্নীর অতিরিক্ত অন্য মহিলাকেও বিবাহ করা বৈধ আছে।

পক্ষান্তরে ২ নং আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত পবিত্রতমা পত্নীগণ ছাড়া অন্য মহিলার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। এভাবে উক্ত পত্নীগণের মধ্য থেকে কাউকে তালাক দিয়ে তার পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও প্রিয়নবীর জন্যে বৈধ নয়। সুতরাং আয়াতদ্বয় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব দেয়া গেল।

ক. ১ নং আয়াত দ্বারা ২ নং আয়াত রহিত হয়ে গেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে নবীজী (স)-এর জন্যে নয়জন পবিত্রতমা পত্নী ব্যতীত অন্য কোনো মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ ছিল না। পরবর্তীকালে يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا الخ এ আয়াত নাযিল করে উপর্যুক্ত হুকুম রহিত করা হয়েছে। হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা, উম্মে সালামা ও ইমাম যাহহাক (র) দ্বিতীয়োক্ত আয়াতটি রহিত হয়ে যাওয়ার মত পোষণ করেন।

তবে রহিতকারী আয়াত সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন– اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ الخ রহিতকারী আয়াত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, রহিতকারী আয়াত হলো– تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِىْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ

এখানে শেষোক্ত আয়াতটি রহিতকারী হওয়ার পক্ষে হযরত আয়েশা (রা)-এর পক্ষ থেকে একটি রেওয়ায়াতও পাওয়া যায়–

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ لَمْ يَمُتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَحَلَّ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهٗ اَنْ يَّتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاۤءِ مَاشَاءَ اِلَّا ذَاتَ مَحْرَمٍ لِقَوْلِهٖ سُبْحَانَهٗ تُرْجِىْ مَنْ تَشَاۤءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِىْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاۤءُ. (رواه ابو داود فى ناسخه والترمذى وصححه والنسائى والحاكم وصححه ايضا وابن المنذر وغيرهم، روح المعانى ٦٦/٢٢

অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর ওফাত ততক্ষণ পর্যন্ত হয়নি যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্যে মাহরাম নারী ব্যতীত যতো ইচ্ছা নারীকে বিবাহের অনুমতি প্রদান করেছেন। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

تُرْجِىْ مَنْ تَشَاۤءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِىْٓ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاۤءُ.

এখানে এ প্রশ্ন অবান্তর যে, নাসেখ তো মানসুখের পরে আসার কথা। অথচ - لَا يَحِلُّ لَكَ ... إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ.... الخ আয়াত দুটি فِىْ تُرْجِىْ مَن .... الخ এর আগের আয়াত।

কারণ, নাসেখ অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের দিক থেকে মানসুখের পরে আসা আবশ্যক; তেলাওয়াতের দিক থেকে নয়।

(তাফসীরে মাদারিক, রুহুল মাআনী, আল-ফাওযুল কাবীর)

খ. ২ নং আয়াতটি রহিত নয়; বরং মুহকাম। আয়াতটির উদ্দেশ্য হলো, পূর্বে বর্ণিত চার প্রকার নারী ছাড়া অন্য কোনো নারী গ্রহণ করা আপনার জন্যে বৈধ নয়। চার প্রকার নারী হলো–

১. মোহরানা সহকারে বিবাহিত নারী।
২. মালিকানাধীন দাসী।
৩. হিজরতকারী খালাতো, মামাতো ও ফুফাতো বোন।
৪. যে নারী মোহর ছাড়াই নিজেকে রাসূল (স)-এর জন্যে হেবা করেছে।

এই অভিমতটি উবাই ইবনে কাব, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, ইমাম তাবারী ও আবু হাইয়ান থেকে বর্ণিত আছে।

(তাফসীরে রুহুল মায়ানী, হাশিয়ায়ে জালালাইন)

কেয়ামতের দিন কাফেরদের
দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হবে নাকি দুর্বল?

১. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ *

২. لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ.

অনুবাদ

১. জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করার সময় আপনি তাদেরকে দেখবেন, অপমানে অবনত ও অর্ধ নির্মীলিত দৃষ্টিতে তাকায়। (সূরা শূরা : আয়াত ৪৫)

২. তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার থেকে যবনিকা সরিয়ে নিয়েছ। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। (সূরা কাফ : আয়াত ২২)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, কেয়ামতের দিন কাফেরদের দৃষ্টি দুর্বল হবে।

এবং আয়াত ২ নং দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের দৃষ্টি তীব্র ও সতেজ হবে। কেননা, সে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তুমি এদিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি খুব সতেজ ও তীব্র হয়ে গেল। সুতরাং আয়াতদ্বয় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হলো।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : দুই নং আয়াতে بَصَر শব্দ দ্বারা চোখের দৃষ্টি উদ্দেশ্য নয়; বরং ইলম ও মারেফাত উদ্দেশ্য। তার প্রমাণ হলো– فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ আয়াতাংশ। আয়াতের এ অংশে পর্দা সরিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। পর্দা দ্বারা উদ্দেশ্য চোখের পর্দা নয়; বরং গাফেল হওয়ার পর্দা, যা অন্তরের ওপরেই পতিত হয়; চোখের ওপর নয়।

আর অন্তর হলো ইলম ও মারেফাতের স্থান। যখন ইলম ও মারেফাতের স্থান থেকে পর্দা সরিয়ে দেয়া হয়, তখন ইলম ও মারেফাত স্বস্থানে সতেজতা ও তীব্রতার সাথে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। সুতরাং এ আয়াতের মর্মার্থ হলো, দুনিয়াতে তোমার অন্তর পরকালীন বিষয়াদির ইলম ও মারেফত থেকে খালি ছিল। ফলে তুমি পরকালীন বিষয়াদিকে অস্বীকার করতে। কারণ, তোমার অন্তর গাফলতের পর্দা দ্বারা আবৃত ছিল। আজ আমি আল্লাহ সে পর্দা সরিয়ে দিলাম। সুতরাং আজ তোমার ইলম ও মারেফত এ পরিমাণ সতেজ হবে যে, তুমি সব বস্তু জানবে এবং বুঝবে; এবং তুমি প্রত্যেক জিনিসকে বিশ্বাসও করবে। অথচ তুমি দুনিয়াতে এগুলোকে অস্বীকার করেছিলে। অতএব উপর্যুক্ত ১ নং আয়াত দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ও হালকা হওয়ার ওপর ভিত্তিশীল। আর ২ নং আয়াত ইলম ও মারেফত সতেজ ও তীব্র হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং আয়াতদ্বয়ে এখন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি নেই। (আল-ইতকান মাআত তাওযীহ)

আল্লাহ তায়ালা
মক্কা নগরের শপথ করেছেন কি?

১. لَا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ. *

২. وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ.

অনুবাদ

১. আমি এই শহরের শপথ করছি। (সূরা বালাদ : আয়াত ০১)

২. শপথ ডুমুর ও যাইতুনের এবং তূর ও সীনাই পর্বতের এবং এই নিরাপদ শহরের। (সূরা তীন : আয়াত ১-৩)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা মক্কা নগরের শপথ করেননি। কেননা, উক্ত আয়াতে لَا শব্দ ব্যবহার হয়েছে, যা নাবোধক হওয়ার ওপর নির্দেশ প্রদান করে। অথচ শেষোক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে ৩ নং আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তায়ালা মক্কা নগরের শপথ করেছেন। সুতরাং ১ নং আয়াত ও শেষোক্ত আয়াতসমূহের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : এর দুটি জবাব প্রদান করা হলো।

ক. ১ নং আয়াতে لَا اُقْسِمُ শব্দের মধ্যে لَا অব্যয়টি নাবোধক নয়; বরং কালামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্যে ব্যবহার হয়েছে। এর দ্বারা শপথকে রহিত করা হয়নি। এটি অতিরিক্ত অবস্থায় আয়াতের শুরুতে এসেছে। সুতরাং এটি কোনো অর্থ প্রদান করবে না। ফলে এ আয়াত শেষোক্ত আয়াতসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বীও নয়; বরং উভয় আয়াতের মর্মার্থ এক ও অভিন্ন। (তাফসীরে জালালাইন)

খ. ১ নং আয়াতে اُقْسِمُ শব্দের শুরুতে لَا অব্যয়টি لَا نَافِيَة নয়; বরং এটি ছিল لَأُقْسِمُ; সবরের উচ্চারণ اِشْبَاع করে দীর্ঘস্বরে পড়ার কারণে তারপর একটি الف প্রকাশ হয়ে গেছে। হযরত ওসমান (রা)-এর মাসহাফের মধ্যে الف ব্যতীত শুধু যবরবিশিষ্ট لام-ই লিপিবদ্ধ আছে। এমনটি হযরত হাসান বসরী (র) থেকেও বর্ণিত আছে।

অতঃপর এ لام অব্যয়টি তিন প্রকারের কোনো এক প্রকার হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। (১) এটি اُقْسِمُ শব্দটি উহ্য مُبْتَدَا-এর خَبَر; মূলত ছিল لَاَنَا اُقْسِمُ (২) এটি لَامِ اِبْتِدَاء এবং اُقْسِمُ ক্রিয়াপদের পূর্বে বাক্যের বিষয়বস্তুকে দৃঢ় করার জন্যে ব্যবহার হয়েছে। (৩) এটি لَامِ قَسَم (শপথের لام), তবে لَامِ قَسَم হওয়া অবস্থায় একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, لام قَسَم-এর পর উল্লিখিত ক্রিয়াপদের সাথে نُوْن تَاكِيْد সংযুক্ত হয়। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে لَا اُقْسِمُ না বলে لَأُقْسِمَنَّ বলা সংগত ছিল। এ প্রশ্নের জবাব এভাবে দেয়া যায় যে, এ অবস্থায় نُوْن تَاكِيْد আনা জরুরি ও অত্যাবশ্যক নয়; বরং نُوْن تَاكِيْد ব্যতীত ব্যবহার করাও বৈধ আছে। যেমন– ইমাম ওয়াহেদী, আল্লামা সীবওয়াই ও ইমাম ফাররা থেকে বৈধতার কথা বর্ণিত আছে। এর বিস্তারিত আলোচনা তাফসীরে রুহুল মাআনী ও তাফসীরে কাবীরের মধ্যে لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ-এর অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বনী ইসরাঈল
গরু জবাই করেছিল কি?

١. فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ.

অনুবাদ

১. অবশেষে তারা তা জবাই করল, কিন্তু তারা তা করতে চাচ্ছিল না।

(সূরা বাকারা : আয়াত ৭১)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ

উপরিউক্ত আয়াতের প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশ পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল এভাবে যে, উক্ত আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বনী ইসরাঈলের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা : এর সারাংশ হলো, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দুই ভাই নিজ চাচাতো ভাইকে এ উদ্দেশ্যে হত্যা করেছে যে, তারা আপন চাচাতো ভাইয়ের ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী ও মালিক হয়ে যাবে। হত্যা করার পর তারা নিহত ব্যক্তিকে ঘরের দরজায় ফেলে রাখল। অতঃপর তারা নিজেই নিহত ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে বলতে লাগল যে আমাদের চাচাতো ভাইকে কে হত্যা করল? আমরা তার হত্যার প্রতিশোধ নেব। লোকেরা জানে না যে, ওকে কে হত্যা করল। হত্যাকারীর সন্ধান পেতে সকলে মরিয়া হয়ে উঠেছে। পরস্পর আলোচনা-পর্যালোচনায় লিপ্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা হত্যাকারীর সন্ধান লাভের এক চমৎকার পদ্ধতি হযরত মুসা (আ)-এর মাধ্যমে অহী অবতরণ করে লোকদের শিখিয়ে দিলেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ)-কে বললেন যে, আপনি বনী ইসরাঈলের লোকদেরকে বলুন, তোমরা একটি গাভী জবাই করে তার একটি অংশ নিহত ব্যক্তির শরীরে নিক্ষেপ করো। যার ফলে উক্ত নিহত ব্যক্তি জীবিত হয়ে নিজের হত্যাকারী সম্পর্কে লোকদের সন্ধান দিয়ে দেবে। এ খবর পেয়ে

তারা যদি কোনো না কোনো গাভী জবাই করে দিত, তাহলে তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যেত।
তারা এ পদ্ধতিকে বহু আশ্চর্য মনে করল এবং ভাবতে লাগল যে, এ অদ্ভুত কর্ম সম্পাদনের জন্যে কতই না আশ্চর্যজনক গাভী জবাই করতে হবে যেন, তার মধ্যে হত্যাকারীর সন্ধানের বিশেষ নিদর্শন প্রতিপন্ন হয়। অতঃপর তারা হযরত মুসা (আ)-কে বলতে লাগল, আপনি আল্লাহ্ তায়ালার কাছ থেকে জেনে নিন যে, গাভীটি কোন গুণের অধিকারী হতে হবে। মুসা (আ) বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, সেটি এমন একটি গাভী হতে হবে, যা বৃদ্ধও নয় এবং কুমারীও নয়। তা হবে বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের। সুতরাং এখন আদিষ্ট কাজ করে ফেলো। এরপর তারা আবার বলল, আপনি পালনকর্তার কাছ থেকে জেনে নিন যে, তার রঙ কীরূপ হতে হবে? মুসা (আ) বললেন, তিনি বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী, যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে। অতঃপর তারা বলল, আপনি পুনরায় পালনকর্তার কাছে জেনে নিন সেটি কীরূপ হবে? কেননা, গরু আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল মনে হয়। ইনশাআল্লাহ্ এবার আমরা অবশ্যই আদিষ্ট কর্ম সম্পাদন করব।
হযরত মুসা (আ) বললেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, এ গাভী ভূকর্ষণ ও জল সেচনের কাজে অভ্যস্ত নয় এমন নিষ্কলঙ্ক ও নিখুঁত হতে হবে। বনী ইসরাঈল এবার হযরত মুসা (আ)-কে বলল যে, আপনি এখন সঠিক তথ্য নিয়ে এসেছেন। অতঃপর তারা উপর্যুক্ত বর্ণনা ও গুণাগুণসম্পন্ন একটি গাভী তালাশ করে নিয়ে আসল একজন যুবক থেকে। যুবক উক্ত গাভীটি বিক্রয় করলেন গাভীর চামড়ার ভিতর অংশের খালি জায়গা সমপরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে।
এরপর উক্ত গাভী জবাই করে নিহত ব্যক্তির শরীরে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে নিহত ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে জীবিত হয়ে হত্যাকারীদের নাম বলে দিলেন যে, অমুক অমুক ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে। হত্যাকারীদের নাম বলার পর নিহত ব্যক্তি আবার মৃত্যুবরণ করেন।
দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর এখন উপর্যুক্ত আয়াতের উভয় অংশের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তায়ালা প্রথমে বললেন– فَذَبَحُوْهَا (বনী ইসরাঈল গাভীটিকে জবাই করল)। আয়াতের এ অংশ দ্বারা গাভী জবাই করা প্রমাণিত হয়। আর অপর অংশ– وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ (তারা গাভী জবাই করার ধারে-কাছেও ছিল না)। এ অংশ দ্বারা গাভী জবাই নিষেধ করা হয়। কারণ, كَادَ ক্রিয়াপদটি

فعل مقارب; তার সম্পর্কে নাহুশাস্ত্রবিদগণের বহু মত বিদ্যমান থাকলেও বিশুদ্ধ মত হলো, كاد নাবোধক ও হ্যাঁবোধক হওয়ার মধ্যে অন্যান্য فعل-সমূহের মতো হয়ে থাকে।

সুতরাং আয়াতের মধ্যে যেহেতু كاد ক্রিয়াপদটি নাবোধক ব্যবহার হয়েছে, সেহেতু গাভী জবাই করার নিকটবর্তী না হওয়ার ওপর উক্ত فعل (ক্রিয়া)-টি নির্দেশনা প্রদান করবে। যার ফলে উপর্যুক্ত আয়াতের এ অংশ দ্বারা বোঝা যায় যে, বনী ইসরাঈল গাভী জবাই করাতো দূরের কথা, গাভী জবাই করার নিকটেও ছিল না। অথচ প্রথম অংশ দ্বারা গাভী জবাই করা সাব্যস্ত হয়। অতএব আয়াতটির প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশ উভয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতের প্রথম অংশে গাভী জবাই করা সাব্যস্ত করা আর দ্বিতীয় অংশে গাভী জবাই করার নিকটেও না পৌঁছা এ দুটি অবস্থা সময়ের তারতম্যের ওপর ভিত্তিশীল। আয়াতের উভয় অংশের সারাংশ হলো, প্রথমত, বনী ইসরাঈল গাভী জবাই করার নিকটেও ছিল না। তারা বিভিন্ন বাহানা তালাশ করতে শুরু করল। তারা বলতে লাগল যে, আমরা কীভাবে গাভী জবাই করব? আমরা তো জানি না যে, কোন রঙের গাভী হতে হবে। গাভীটি কী কী গুণের অধিকারী হতে হবে? এসব কথা বলার দ্বারা তাদের এটা উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা যাতে ওদেরকে বলে দেন, তোমাদের গাভী জবাই করতে হবে না। সুতরাং পেরেশানি অনুভব করো না। তোমাদেরকে আমি (আল্লাহ) হত্যাকারী সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছি। কিন্তু যখন আল্লাহ তাদের প্রশ্নগুলোর জবাব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিলেন, একের পর এক তাদের সকল তালবাহানা শেষ হয়ে গেল এবং তারা উপরিউক্ত গুণাগুণসম্পন্ন একটি গাভীও পেয়ে গেল, তখন তারা গাভী জবাই করতে প্রস্তুত হয়ে আল্লাহর আদিষ্ট কর্ম সম্পাদন করল। সুতরাং উপরিউক্ত আয়াতটির মর্মার্থ হবে– فَذَبَحُوْهَا فِى الزَّمَانِ الثَّانِىْ وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ فِى الزَّمَانِ الْاَوَّلِ অর্থাৎ, গাভী জবাই করার আদেশ পাওয়া মাত্র উক্ত কর্ম সম্পাদন করতে বনী ইসরাঈল সম্মত ছিল না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তারা উক্ত কাজ করতে সম্মত হয়ে গেল। সুতরাং আয়াতটির সময় ও কালের তারতম্য বোঝার পর আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি নেই।

(তাফসীরে রুহুল মাআনী : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২৯২; বয়ানুল কুরআন ৩৯-৪০পৃষ্ঠা, পারা-১)

ইহুদিরা জাদুর
অনুকরণ করাকে কি ঘৃণ্য জানত?

١. وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ

১. তারা ভালোভাবে জানত, যে কেউ তা অবলম্বন করে, তার জন্যে পরকালে কোনো অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানত। (সূরা বাকারা : আয়াত ১০২)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ

উপরিউক্ত আয়াতের প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে যায়। যার ব্যাখ্যা ইহুদিরা আল্লাহর কিতাবের অনুকরণ করার স্থলে জাদুর অনুকরণ করতে লাগল। বাবেল শহরে হারুত ও মারুত নামে দু'জন ফেরেশতাকে আল্লাহ তায়ালা লোকসমাজের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠালেন (যাদের আলোচনা উক্ত আয়াতটির পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সংক্ষিপ্তাকারে এবং তাফসীরের কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে)। হারুত ও মারুত নামের ফেরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে ইহুদিরা জাদু শিখত এবং তার অনুসরণও করতো। অথচ তারা জানত, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের স্থলে জাদুর অনুকরণ করে, তার জন্যে আখেরাতে কোনো অংশ নেই।

এটাকে আয়াতের প্রথম অংশে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে– لَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِى الْآخِرَةِ الخ; অতএব এর দ্বারা জানা যায় যে, ইহুদিরা জাদুর অনুকরণ করাকে খারাপ ও ঘৃণ্য জানত এবং জাদুর অনুকরণ করা ঘৃণ্যকাজ ও মন্দকর্ম বলে তাদের জ্ঞানও ছিল।

অথচ আয়াতের শেষ অংশ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, তারা জাদুর অনুকরণ করাকে ঘৃণ্য ও খারাপ কাজ বলে জানত না। কারণ, لَوْ শব্দটি إِنْتِفَاءُ شَيْءٍ لِانْتِفَاءِ غَيْرِهِ (এক বস্তু নাবোধক হওয়ার কারণে অপর

বস্তুও নাবোধক হওয়া)-এর জন্যে ব্যবহার হয়। সুতরাং উপর্যুক্ত আয়াতের শুরু অংশ ও শেষাংশের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন

১. ইমাম রাগেব (র) বলেছেন যে, উক্ত আয়াতের প্রথম অংশে ইলমে ইজমালী (সংক্ষিপ্ত জ্ঞান) প্রমাণ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশে ইলমে তফসীলি (বিস্তারিত জ্ঞান) রহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ আয়াতের সারমর্ম হলো, ইহুদিরা সংক্ষিপ্তাকারে জানত যে, জাদুর অনুকরণ করা ঘৃণিত এবং অপছন্দীয় কাজ। কিন্তু তারা এটা জানত না যে, আমরা যা করছি সেটাও সেই ঘৃণিত ও অপছন্দীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত।

(তাফসীরে রুহুল মাআনী : খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৬; শায়খ যাদাহ : ১/৩৭৭)

২. আয়াতের প্রথম অংশে যা প্রমাণিত হয়েছে, সেটা হলো জাদুর অনুকরণ ঘৃণ্য হওয়া ও তার ওপর শাস্তি সাব্যস্ত হওয়ার জ্ঞান লাভ করা। আর দ্বিতীয় অংশের দ্বারা যা বাতিল করা হয়েছে তা হলো, শাস্তির বাস্তবতা ও কঠোরতার জ্ঞান অর্জন করা। সুতরাং ইহুদিরা জাদুর অনুকরণ করার ওপর শাস্তি সাব্যস্ত হওয়ার জ্ঞান রাখত, কিন্তু উক্ত শাস্তির বাস্তবতা ও কঠোরতা যে কী পরিমাণ হবে, তার সম্পর্কে তাদের সামান্যতমও জ্ঞান ছিল না। অতএব আয়াতের প্রথম অংশে اِثْبَاتُ عِلْمِ عِقَابِ ও দ্বিতীয় অংশে نَفْىُ عِلْمِ شِدَّتِ عِقَابِ বোঝানো হয়েছে।

(শায়খ যাদাহ : ১/৩৭৭; রুহুল মাআনী : ১/২৪৬)

৩. তাফসীরে কাশশাফের লেখক আল্লামা যামাখশরী (র) বর্ণনা করেন যে, উপর্যুক্ত আয়াতের প্রথমাংশে এ সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, ইহুদিরা জাদুবিদ্যা সম্পর্কে অবগত ছিল। আর দ্বিতীয় অংশে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে যে, তারা উক্ত বস্তুর ইলম অনুযায়ী কোনো আমল করতো না।

সুতরাং আয়াতটির সারমর্ম হলো, ইহুদিরা জাদুবিদ্যার নিকৃষ্টতা ও তার পরকালীন শাস্তির ব্যাপারে খুব অবগত ছিল। তবে তারা জাদু সম্পর্কে তাদের এ ইলম অনুযায়ী কোনো আমল করতো না। আর যে ব্যক্তি ইলম অনুসারে আমল করে না, তাকে অজ্ঞ লোকের মতো মনে করা হয়। ফলে উক্ত বিষয়ে তার ইলম হওয়া-না হওয়া সমান হয়ে গেল। এজন্যে আয়াতের শেষ অংশে তাদের থেকে জাদুর ইলমকেই বাতিল করা হয়েছে। অতএব لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ-এর এখন মর্মার্থ হবে– لَوْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِمَوْجَبِ عِلْمِهِمْ (যদি তারা উক্ত জ্ঞান অনুপাতে আমল করতো, তাহলে তারা জাদু জ্ঞান নির্বাচন করা ও শিক্ষা করা থেকে বেঁচে

থাকত)। সুতরাং আয়াতের প্রথম অংশে জাদু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশে সে অনুযায়ী আমল করাকে নিষেধ করা হয়েছে। তাফসীরে রূহুল মাআনীর লেখক বলেছেন যে, আমার কাছে এ জবাবটি উত্তম বলে মনে হয়। (কাশশাফ : ১/৮৫; শায়খ যাদাহ : ১/৩৭৭; রূহুল মাআনী : ১/৩৪৬ ও বয়ানুল কুরআন : ১/৫৭, পারা ১)

৪. আয়াতের উভয় অংশ اِخْتِلَافُ اَشْخَاص-এর ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, প্রথম অংশের ضَمِيْر (সর্বনাম) দ্বারা উদ্দেশ্য شَياطِين (শয়তানরা), যারা জাদু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের অধিকারী ছিল। আর শেষ অংশ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ-এর ضَمِيْر (সর্বনাম) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইহুদিরা, যারা জাদু সম্পর্কে কোনো জ্ঞানের অধিকারী ছিল না। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ হবে– শয়তানরা জানত, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের পরিবর্তে জাদুর অনুকরণ করবে, তার জন্যে পরকালে কিছুই মিলবে না। কিন্তু ইহুদিরা একথা জানত না। এজন্যে তারা জাদুবিদ্যা শিখত এবং তার অনুসরণ করতো। (তাফসীরে কুরতুবী : ২/৫৬)

৫. وَلَقَدْ عَلِمُوْا-এর ضَمِيْر (সর্বনাম) দ্বারা উদ্দেশ্য হারুত-মারুত নামে দু'জন ফেরেশতা, যারা জাদুর নিকৃষ্টতা ও পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে অবগত ছিল। যদিও عَلِمُوْا ক্রিয়াপদের সর্বনামটি বহুবচনের সর্বনাম হয় এবং তার مَرْجَع দ্বিবচন হয়। কেননা, বহুবচনের সর্বনাম দ্বারা দ্বিবচন উদ্দেশ্য নেয়া আরবি ভাষার ব্যাকরণ পরিপন্থি নয়। এবং لَوْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-এর সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইহুদিরা। অর্থাৎ, হারুত ও মারুত নামে দু'জন ফেরেশতা জাদু নিকৃষ্ট হওয়া ও ঘৃণিত হওয়ার ব্যাপারে অবগত ছিল, অথচ ইহুদিরা একথা জানত না। তাই তারা জাদুবিদ্যা শিক্ষা করে তার অনুকরণ করতো। আহ! যদি তারা জাদুর নিকৃষ্টতা ও খারাবি সম্পর্কে অবগত হতো। (তাফসীরে কুরতুবী : ২/৫৬)

বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহর ইচ্ছায় প্রকাশিত হয়, না বান্দার ইচ্ছায়?

١۔ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

٢۔ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

٣۔ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ.

٤۔ مَنْ يَّشَإِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَّشَأْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

٥۔ مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ.

٦۔ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُّرِدْ أَنْ يُّضِلَّهٗ
يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا.

٧۔ وَمَا يَكُوْنُ لَنَا أَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ.

٨۔ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ.

٩۔ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

١٠۔ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ.

١١۔ وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ.

١٢۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ.

١٣۔ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا.

١٤۔ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

١٥۔ سَتَجِدُنِيٓ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

١٦۔ فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ.

١٧۔ سَتَجِدُنِيٓ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ.

١٨۔ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ.

١٩۔ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا.

٢٠۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ آمِنِيْنَ.

٢١۔ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ.

٢٢۔ وَمَا يَذْكُرُوْنَ إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ.

٢٣۔ وَمَا تَشَآءُوْنَ إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ.

٢٤۔ يُدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ.

٢٥۔ وَمَا تَشَآءُوْنَ إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ. *

٢٦۔ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ.

٢٧۔ قُلْ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَآءَ أَنْ يَّتَّخِذَ إِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا.

٢٨۔ إِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ.

٢٩۔ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا.

٣٠۔ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَّتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ.

٣١۔ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ.

٣٢۔ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا.

٣٣۔ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَّسْتَقِيْمَ.

অনুবাদ

১. তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৪২)

২. আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।
(সূরা বাকারা : আয়াত ২১৩)

৩. কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে হেদায়াত দান করেন।
(সূরা বাকারা : আয়াত ২৭২)

৪. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (সূরা আনয়াম : আয়াত ৩৯)

৫. তারা কখনো বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়; কিন্তু যদি আল্লাহ চান। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ। (সূরা আনয়াম : আয়াত ১১১)

৬. অতঃপর আল্লাহ যাকে হেদায়াত দানের ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন। (সূরা আনয়াম : আয়াত ১২৫)

৭. আর আমাদের উচিত নয় তাতে প্রত্যাবর্তন করা, তবে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (সূরা আরাফ : আয়াত ৮৯)

৮. এর দ্বারা যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। (সূরা আরাফ : আয়াত ১৫৫)

৯. আর তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।
(সূরা ইউনুস : আয়াত ২৫

১০. আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা নাহাল : আয়াত ৯৩)

১১. আর আপনি কোনো বিষয়ে কখনো বলবেন না যে, আমি আগামীকাল তা করব, তবে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (সূরা কাহাফ : আয়াত ২২-২৩)

১২. যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন একথা কেন বললে না; আল্লাহ যা চান। (সূরা কাহাফ : আয়াত ৩৯)

১৩. আল্লাহ চাহেতো আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যধারণকারী হিসেবে পাবেন। (সূরা কাহাফ : আয়াত ৬৯)

১৪. আর আল্লাহ যাকে চান, সঠিক পথে পরিচালিত করেন।
(সূরা নূর : আয়াত ৪৬)

১৫. আল্লাহ চাহেতো আপনি আমাকে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যে পাবেন। (সূরা কাসাস : আয়াত ২৭)

১৬. অতঃপর নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। (সূরা ফাত্বির : আয়াত ০৮)

১৭. আল্লাহ্ চাহেতো আপনি আমাকে ধৈর্যধারণকারীদের মধ্যে পাবেন। (সূরা সাফফাত : আয়াত ১০২)

১৮. এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। (সূরা যুমার : আয়াত ২৩)

১৯. কিন্তু আমি তাকে করেছি নূর, যার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করি। (সূরা যুখরুফ : আয়াত ৫২)

২০. নিশ্চয় তোমরা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে। (সূরা ফাতহ্ : আয়াত ২৭)

২১. এভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। (সূরা মুদ্দাছছির : আয়াত ৩১)

২২. তারা স্মরণ করবে না, কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান। (সূরা মুদ্দাছছির : আয়াত ৫৬)

২৩. আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোনো অভিপ্রায় পোষণ করবে না। (সূরা দাহার : আয়াত ৩০)

২৪. যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন। (সূরা দাহার : আয়াত ৩১)

২৫. আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোনো অভিপ্রায় পোষণ করবে না। (সূরা তাকভীর : আয়াত ২৯)

২৬. অতএব, যে ইচ্ছা করে ঈমান গ্রহণ করুক, আর যে ইচ্ছা করে কুফরি অবলম্বন করুক। (সূরা কাহাফ : আয়াত ২৯)

২৭. বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর কোনো বিনিময় চাই না, কিন্তু যে ইচ্ছা করে, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (সূরা ফুরকান : আয়াত ৫৭)

২৮. তোমরা যা ইচ্ছা করো। (সূরা হা-মীম সাজদা : আয়াত ৪০)

২৯. অতএব, যে ইচ্ছা করে সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (সূরা মুযযাম্মিল : আয়াত ২৯)

৩০. তোমাদের মধ্যে যে চায় সে সামনে অগ্রসর হয়, অথবা পশ্চাতে থাকে। (সূরা মুদ্দাছছির : আয়াত ৩৭)

৩১. অতএব, যার ইচ্ছা সে একে স্মরণ করুক। (সূরা মুদ্দাছছির : আয়াত ৫৫)

৩২. অতএব, যে ইচ্ছা করে সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (সূরা দাহার : আয়াত ২৯)

৩৩. তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়। (সূরা তাকভীর : আয়াত ২৮)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ

১ থেকে ২৫ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহ দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, বান্দাদের আমল ও কর্মসমূহ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়; চাই বান্দারা হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকুক অথবা পথভ্রষ্টতার ওপর বিদ্যমান হোক, ভালো করুক অথবা মন্দ করুক। এছাড়াও আরো যত কর্ম আছে, সেগুলোও বান্দা আল্লাহর ইচ্ছায়ই সম্পাদন করে; নিজের ইচ্ছায় নয়। কারণ, আয়াতগুলোর মধ্যে مَشِيَّتٌ (ইচ্ছা)-এর সম্বোধন আল্লাহর দিকেই করা হয়েছে। যার দ্বারা বোঝা যায় যে, বান্দারা হলেন কর্ম সম্পাদনে বাধ্য ও আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত।

অথচ ২৬ থেকে ৩৩ নং পর্যন্ত আয়াতগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে, বান্দা নিজের কর্ম নিজ ইচ্ছায়ই সম্পাদন করে থাকে। কারণ, উক্ত আয়াতগুলোতে مَشِيَّتٌ (ইচ্ছা)-এর নিসবত (সম্বোধন) বান্দার প্রতি করা হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বান্দা নিজ কর্ম সম্পাদনে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। যা চায়, তা-ই করতে পারে। অতএব আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন

বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহ তায়ালা ও বান্দা উভয়ের ইচ্ছার অধীনে প্রকাশিত হয়। তবে আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের ইচ্ছার দিকগুলো ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং বান্দার কর্ম সম্পাদনে আল্লাহ ইচ্ছা পোষণ করা সৃষ্টির ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আর বান্দা স্বীয় কর্মে ইচ্ছা পোষণ করা সম্পাদন করার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। অর্থাৎ, বান্দা নিজ ইচ্ছায় স্বীয় কর্ম সম্পাদন করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হলেন উক্ত কর্মের স্রষ্টা। আল্লাহ তায়ালার এ রীতিনীতি প্রচলিত আছে যে, যখন বান্দা নিজ ইচ্ছাবশত কোনো কর্ম সম্পাদন করতে চায়, তখন তিনি সে বান্দার জন্যে উক্ত কর্ম সৃষ্টি করেন। যেমন কোনো বান্দা চলাফেরার ইচ্ছা করলে তার জন্যে চলাফেরার কর্ম সৃষ্টি করেন। এভাবে অন্যান্য কর্মসমূহকেও অনুমান করা চাই। অতএব বান্দা مَجْبُوْر مَحَض (সম্পূর্ণ বাধ্যগত)-ও নয় এবং خُوْد مُخْتَار (সম্পূর্ণ স্বাধীন)-ও নয়। এ বিশ্লেষণের পর উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি থাকে না। (শরহে আকাইদ)

আল্লাহ্ তায়ালা কেয়ামত দিবসে কাফেরদের সাথে আলাপ করবেন কি?

١۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

٢۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. *

٣۔ وَنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ.

٤۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ.

٥۔ وَلَوْ تَرٰى إِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ.

٦۔ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُوْلَاهُمْ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ أَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ.

٧۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ.

٨۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ.

٩۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَاقُّوْنَ فِيْهِمْ.

١٠۔ وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَائِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ.

١١. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ.

١٢. قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ.

١٣. قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

١٤. حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا.

١٥. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ.

١٦. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ.

١٧. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

١٨. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ.

١٩. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا آذَنَّاكَ.

٢٠. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.

٢١. قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ.

অনুবাদ

১. আর কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৭৪)

২. আর কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিও দেবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৭৭)

৩. আর আমি বলব, তোমরা আস্বাদন করো দহন শাস্তি।
(সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৮১)

৪. আর স্মরণ করো সেদিনের কথা, যেদিন আমি তাদের সকলকে সমবেত করব। অতঃপর যারা শিরক করেছে তাদের বলব, কোথায় তোমাদের শরীকরা? (সূরা আনয়াম : আয়াত ২২)

৫. আর যদি আপনি দেখেন; যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম। তিনি বলবেন, অতএব, স্বীয় কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন করো। (সূরা আনয়াম : আয়াত ৩০)

৬. তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণের ব্যাপারে বলবে, হে আমাদের প্রভু! এরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছে। অতএব তাদেরকে জাহান্নামের দ্বিগুণ শাস্তি দান করুন। তিনি বলবেন, প্রত্যেকের জন্যেই দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা জানবে না। (সূরা আরাফ : আয়াত ৩৮)

৭. আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে সমবেত করব, আর যারা শিরক করতো তাদের বলব, তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও। (সূরা ইউনুস : আয়াত ২৮)

৮. অতএব আপনার পালনকর্তার শপথ! আমি অবশ্যই তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করব। (সূরা হাজর : আয়াত ৯২)

৯. অতঃপর কেয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন, আমার অংশীদাররা কোথায়, যাদের ব্যাপারে তোমরা খুব হঠকারিতা করতে? (সূরা নাহাল : আয়াত ২৭)

১০. আর যেদিন তিনি বলবেন, তোমরা তাদের ডাক দাও, যাদেরকে আমার অংশীদার হিসেবে ধারণা করতে। (সূরা কাহাফ : আয়াত ৫২)

১১. আল্লাহ বলবেন, তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থেকো এবং আমার সাথে কোনো কথা বলো না। (সূরা মুমিনূন : আয়াত ১০৮)

১২. তিনি বললেন, তোমরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করেছ বাৎসরিক গণনা হিসেবে। (সূরা মুমিনূন : আয়াত ১১২)

১৩. তিনি বললেন, তোমরা অল্পকিছু দিনই অবস্থান করেছ, যদি তোমরা জানতে। (সূরা মুমিনূন : আয়াত ১১৪)

১৪. যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলে, অথচ এগুলো সম্পর্কে তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিল না? (সূরা নামল : আয়াত ৮৪)

১৫. আর যেদিন তাদের ডাক দেবেন, অতঃপর বলবেন, তোমরা রাসূলগণকে কি উত্তর দিয়েছিলে? (সূরা কাসাস : আয়াত ৬৫)

১৬. আর যেদিন তাদের ডাক দেবেন, অতঃপর বলবেন, কোথায় আমার সে অংশীদাররা? যাদের তোমরা অংশীদার হিসেবে ধারণা করতে।

(সূরা কাসাস : আয়াত ৬২)

১৭. আর তিনি বলবেন, তোমরা যা করতে তা আস্বাদন করো।

(সূরা আনকাবূত : আয়াত ৫৫)

১৮. আর যারা জুলুম করেছে আমরা তাদের বলব, তোমরা জাহান্নামের শাস্তি আস্বাদন করো। (সূরা সাবা : আয়াত ৪২)

১৯. যেদিন আল্লাহ্ তাদের ডেকে বলবেন, আমার শরীকরা কোথায়? সেদিন তারা বলবে, আমরা আপনাকে বলে দিয়েছি। (সূরা হা-মীম সাজদা : আয়াত ৪৭)

২০. তিনি বলবেন, অতএব তোমরা কুফরি করার কারণে শাস্তি আস্বাদন করো। (সূরা আহকাফ : আয়াত ৩৪)

২১. তিনি বলবেন, তোমরা আমার নিকট ঝগড়া করো না। (সূরা কাফ : আয়াত ২৮)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ

১ নং ও ২ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা কেয়ামতের দিন কাফেরদের সাথে কোনো আলাপ করবেন না।

অথচ বাকি আয়াতগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি কাফেরদের সাথে কেয়ামত দিবসে আলাপ-আলোচনা করবেন। কারণ, আয়াতগুলোতে তাদের সাথে কথোপকথন ও বিভিন্ন প্রশ্ন করার কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং উপরের ১ নং ও ২ নং আয়াতের সাথে শেষোক্ত আয়াতগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন

কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদের সাথে দয়া ও করুণা প্রদর্শনার্থে কোনো কথা বলবেন না। যা ১ নং ও ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা ওদের সাথে রাগান্বিত হয়ে কথা বলবেন, যা শেষোক্ত আয়াতগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে।

সুতরাং এখন আয়াতগুলোর মাঝে আর কোনো বিরোধ বাকি নেই।

(তাফসীরে রুহুল মাআনী : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৪; বয়ানুল কুরআন : পারা ১)

পূর্ববর্তী যুগে লোকেরা ধর্মের ব্যাপারে এক ছিলেন, না ভিন্ন ভিন্ন?

١. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ. *

٢. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ.

٣. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ.

অনুবাদ

১. সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পয়গাম্বর পাঠালেন সু-সংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে।
(সূরা বাকারা : আয়াত ২১৩)

২. আর আপনার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই জাতিসত্তায় পরিণত করতে পারতেন। আর তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হতো না। (সূরা হূদ : আয়াত ১১৮)

৩. আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা নাহল : আয়াত ৯৩)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ

১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, পূর্ববর্তী যুগে লোকেরা ধর্মের ব্যাপারে এক ও অভিন্ন ছিল। তাদের মাঝে ধর্ম নিয়ে কোনো মতানৈক্য ছিল না।

কিন্তু ২ নং ও ৩ নং আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, তারা মতানৈক্যে লিপ্ত ছিল। কেননা, উক্ত আয়াতদ্বয়ে لَو শব্দ ব্যবহার হয়েছে যা, تَعْلِيْقٌ فِى الْمَاضِىْ مَعَ الْقَطْعِ بِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ-এর জন্যে ব্যবহার হয়। অর্থাৎ, لَو-এর দ্বারা অতীতকালে এক বস্তুকে অপর বস্তুর ওপর সম্পৃক্ত করা হয়, সাথে সাথে شَرْط নাবোধক হওয়ার কারণে جَزَاء-ও নাবোধক হয়ে যায়। যেমন কেউ

বললেন- لَوْ جِئْتَنِى لَاَكْرَمْتُكَ (যদি তুমি আমার কাছে আস, তাহলে আমি তোমাকে সম্মান করব)। সুতরাং এ বাক্যে সম্মানকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে আগমনের ওপর। আগমন ঘটলে সম্মান পাওয়া যাবে। আর আগমন যদি না ঘটে, তাহলে সম্মানও পাওয়া যাবে না। অতএব আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হবে, যদি আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করতেন, তাহলে অতীতকালে সমস্ত লোক একই ধর্মে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেত। সুতরাং একই ধর্মে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ওপর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না বিধায় লোকেরা একই ধর্মে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারেনি। যার দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, পূর্ববর্তী যুগে লোকেরা ধর্মের ব্যাপারে এক ও অভিন্ন ছিল না। অতএব আয়াতগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন

পূর্ববর্তী যুগ যেহেতু দীর্ঘ ও লম্বা ছিল, সেজন্যে উক্ত যুগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে সমস্ত লোক ধর্মের ব্যাপারে এক ও অভিন্ন ছিল। যেমন- হযরত আদম (আ)-এর যুগে লোকেরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ধর্মের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে লোকসমাজ ধীরে ধীরে ধর্মের ব্যাপারে মতানৈক্য করতে শুরু করে। ফলে তাদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন ধর্মের আবিষ্কার হলো। সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ পূর্ববর্তী আয়াতের প্রথম ভাগের ওপর ভিত্তিশীল। আর শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ দ্বিতীয় ভাগের ওপর ভিত্তিশীল। অতএব যেহেতু ইত্তেহাদ ও ইখতেলাফের সময় পৃথক পৃথক হওয়ার কথা জানা গেল, সেহেতু আয়াতগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হওয়ার কথাও বোধগম্য হয়ে গেল।

(বয়ানুল কুরআন : পারা নং ১২, পৃষ্ঠা ৫৭)

মানবসমাজের মধ্যে মতানৈক্য
নবীগণের আগমনের পূর্বে হয়েছে, না পরে?

١. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الَّذِيْنَ أُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ.

অনুবাদ

১. সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পয়গাম্বর পাঠালেন সু-সংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ আসার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশত তারাই করেছে, যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল। (সূরা বাকারা : আয়াত ২১৩)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : আয়াতের প্রথম অংশে ইরশাদ হয়েছে যে, পূর্ববর্তী যুগে সব মানুষ এক ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কারণ, হযরত আদম (আ) স্বীয় সন্তানগণকে সত্য ধর্মের তালীম দিতেন এবং তাঁর তালীমের ওপর তারা আমলও করতো। এককাল এভাবে অতিবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর লোকসমাজে ব্যাপক ইখতেলাফ ও মতানৈক্য দেখা দিল। তখন আল্লাহ তায়ালা পয়গাম্বরগণকে কিতাব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠালেন, যাতে তারা লোকদের মাঝে সে বিষয়ে ফয়সালা করেন, যে বিষয়ে তারা মতানৈক্যে লিপ্ত হয়। অতএব, আয়াতের এ অংশ দ্বারা জানা যায় যে, লোকসমাজ নবীগণের আগমনের পূর্বে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছে।

এবং আয়াতের দ্বিতীয় অংশ দ্বারা বোঝা যায় যে, মানবসমাজে মতানৈক্য নবীগণের আগমন ও কিতাব নাযিলের পর হয়েছিল। কারণ, তার মধ্যে

ইরশাদ হয় যে, মতানৈক্যকারী ওরাই ছিল, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং তারা মতানৈক্য করেছে সে সময় যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসেছে। অতএব আয়াতটির উভয় অংশে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : আয়াতের প্রথম অংশে যে মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, লোকসমাজ নিজেদের বিভিন্ন কাজকর্মে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়, এমনকি তারা নিজেদের আমল ও আকিদাগত বিষয়েও মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছিল। এ মতানৈক্য হযরত আদম (আ) দুনিয়াতে আগমন করার এক যুগ পর সৃষ্টি হয়। সে সময় আদম (আ) ব্যতীত দুনিয়াতে কোনো নবী শুভাগমন করেননি। অতএব লোকসমাজের মাঝে সৃষ্ট বিভিন্ন রকম ইখতেলাফ ও মতানৈক্যকে দূরীভূত করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে বহু নবী-রাসূল পাঠাতে আরম্ভ করলেন।

এভাবে দ্বিতীয় অংশে যে মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, লোকসমাজ আসমানী কিতাব নিয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হওয়া। যখন নবীগণ দুনিয়াতে আগমন করলেন, কিতাবও নাযিল হলো এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিও এসে গেল, তখন লোকসমাজের উচিত ছিল যে, তারা আসমানী কিতাব গ্রহণ করে ও নবীগণের কথা মান্য করে নিজেদের সকল মতানৈক্য মিটিয়ে ফেলা। কিন্তু তারা খোদ কিতাবকেই মানতে সম্মত ছিল না; বরং তারা আসমানী কিতাব নিয়েই এবার মতানৈক্যে মেতে উঠল।

সুতরাং সারকথা হলো, নবীগণের আগমনের পূর্বে লোকসমাজের মতানৈক্য ছিল তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও আমল-আকিদাগত বিষয় নিয়ে। আর নবীগণের আগমনের পর লোকসমাজের মাঝে মতানৈক্য ছিল আসমানী কিতাব নিয়ে। অতএব এ বিশ্লেষণের পর উক্ত আয়াতের উভয় অংশে আর কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। (বয়ানুল কুরআন : পারা নং ২, পৃষ্ঠা ১২০)

হযরত ঈসা (আ) শুধু বনী ইসরাঈলের নবীরূপে প্রেরিত হয়েছেন, না অন্যান্যদেরও?

১. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. *

২. قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ.

অনুবাদ

১. এবং বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল হিসেবে। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৪৯)

২. তিনি বললেন, কারা আছে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্যকারী (হাওয়ারী)? সঙ্গী-সাথিরা বলল, আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা সে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছি যা কিছু আপনি অবতরণ করেছেন এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করলাম। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৫২-৫৩)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ

১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, হযরত ঈসা (আ) শুধু বনী ইসরাঈলের প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছেন।

২ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি হাওয়ারিয়্যীনেরও নবী ছিলেন। কেননা, এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ) হাওয়ারিয়্যীনকে দীনের প্রতি আহ্বান জানালে তারা তা কবুল করে ঈমান নিয়ে আসেন এবং হযরত ঈসা (আ)-এর অনুকরণ করেন। হাওয়ারিয়্যীন হাওয়ারী-এর বহুবচন। হাওয়ারী ঈসা (আ)-এর মুখলিস সাথি ছিলেন, যারা তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করে খাঁটি মুমিন হয়ে গেলেন। তাদের সংখ্যা বারো বা ঊনত্রিশের কাছাকাছি ছিল। حَوَارِى শব্দটি حَوْر শব্দ থেকে নির্গত। حَوْر শব্দের অর্থ হলো ধবধবে সাদা। حَوَارِىٌّ-কে حَوَارِىٌّ এজন্যে বলা হয় যে, তারা ধবধবে সাদা কাপড় পরিধান করতেন।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলের প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছেন এবং হাওয়ারীগণও বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন তাফসীরে রূহুল মাআনীর ৭ নং খণ্ডের ৫৮ নং পৃষ্ঠায় একটি রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উক্ত রেওয়ায়াতের সারাংশ হলো, হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলকে বললেন, তোমরা ত্রিশটি রোযা রেখে আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত করো, ইনশাআল্লাহ কবুল হবে। তারা রোযা রেখে আল্লাহর দরবারে আসমান থেকে খাদ্য অবতরণের জন্যে দোয়া করলেন। আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করলেন। এ ঘটনা কুরআন শরীফে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ الخ (سورة مائدة - ١١٢)

(বয়ানুল কুরআন : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২, পারা ৩)

বনী ইসরাঈলের সবাই
কাফের ছিল, না কিছু মুমিনও ছিল?

١. فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيْٓ إِلَى اللهِ. *

٢. فَآمَنَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ.

অনুবাদ

১. অতঃপর ঈসা (আ) যখন তাদের পক্ষ থেকে কুফরি সম্পর্কে অনুভব করতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, কারা আছে আমাকে আল্লাহর পথে সাহায্যকারী? (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৫২)

২. অতঃপর বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে একটি দল ঈমান আনল এবং অপর একটি দল কুফরি করল। (সূরা আস-সাফ : আয়াত ১৪)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ

১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলের পক্ষ থেকে কুফর অনুভব করছিলেন এবং তারা তাঁর মুজিযা অস্বীকার করে তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে আরম্ভ করল, তখন তিনি হাওয়ারীগণকে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন, কে আল্লাহর ওয়াস্তে আমার সাহায্যকারী হবে? তখন হাওয়ারীগণ বললেন, আল্লাহর দীনের ব্যাপারে আমরা সাহায্যকারী হব। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, বনী ইসরাঈল সব কাফের ছিল। শুধু হাওয়ারীগণ মুমিন ছিলেন।

অথচ ২ নং আয়াত দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, বনী ইসরাঈলের একদল কাফের ছিল। আর অপর দল মুমিন ছিলেন। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন

যখন হযরত ঈসা (আ) হাওয়ারীগণকে সম্বোধন করে مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ বললেন, তখন বনী ইসরাঈলের সব লোক কাফের ছিল, এবং তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে আরম্ভ করল। কিন্তু কিছুকাল পর বনী ইসরাঈল দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ হযরত ঈসা (আ)-এর ওপর ঈমান নিয়ে আসলেন। অপর ভাগ কুফরি অবস্থায় বিদ্যমান রইল। সুতরাং উভয় কথার কাল বা সময় ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তাই আয়াতদ্বয়ে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি নেই। (বয়ানুল কুরআন : পারা ৩, পৃষ্ঠা ২১)

দাওয়াত ও তাবলীগ পুরা উম্মতের ওপর অত্যাবশ্যক, না উম্মতের একাংশের ওপর?

١. وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

٢. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

অনুবাদ

১. তোমাদের মাঝে একটি দল যেন কল্যাণের প্রতি আহ্বান করে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০৪)

২. তোমরা হলে উত্তম জাতি, যাদের বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্যে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১১০)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ

১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক এমন হওয়া উচিত, যারা লোকদের কল্যাণের দিকে ডাকবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, দাওয়াত ও তাবলীগ এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা পুরো উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর অত্যাবশ্যক নয়; বরং কিছু লোক উক্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিলেই চলবে।

আর ২ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, পুরো উম্মতই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করবে। কেননা, সে আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরাই হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদেরকে বের করা হয়েছে লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বারণ করার জন্যে। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

১ নং আয়াত ২ নং আয়াতের অস্পষ্টতার ব্যাখ্যাস্বরূপ। কেননা, ২ নং আয়াত দ্বারা বোধগম্য হয় যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পুরো উম্মতের ওপর ফরয হয়ে আছে। কিন্তু ফরয দুই প্রকার। ১. ফরজে কেফায়া। ২. ফরযে আইন। ফরযে কেফায়া দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো এই যে, কাজটি সকলের ওপর ফরজ, কিন্তু কিছু লোক উক্ত কাজ আদায় করার দ্বারা সবার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়। তবে কেউ যদি সে কাজ আদায় না করে, তাহলে সকলেই গুনাহগার ও শাস্তিযোগ্য হয়। আর ফরজে আইন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর কোনো কাজ ফরজ হওয়া এবং সে কাজ প্রত্যেকেই আদায় করা অপরিহার্য হওয়া। সুতরাং সবার পক্ষ থেকে কিছু লোক কাজটি আদায় করে দিলে চলবে না। যেমন– নামায, রোযা ইত্যাদি। অতএব উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে ২ নং আয়াত এ ব্যাপারে অস্পষ্ট হয়ে আছে যে, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পুরো উম্মতে মুহাম্মদীর জিম্মায় ফরজে আইন না ফরযে কেফায়া।

এ অস্পষ্টতাকে দূরকরণার্থে আল্লাহ তায়ালা ১ নং আয়াতটি অবতরণ করে বর্ণনা করেছেন যে, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সবার জিম্মায় ফরযে আইন নয়; বরং ফরজে কেফায়া। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদীর কোনো একদল উক্ত কাজ আঞ্জাম দিলেই সবার পক্ষ থেকে দায়িত্ব ও জিম্মাদারী আদায় হয়ে যাবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলামায়ে কেরামও এ মত পোষণ করেন যে, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ ফরজে আইন নয়; বরং ফরজে কেফায়া। ইমামুল মুফাসসিরীন আল্লামা কুরতুবী (র) এ মতকে اَصَحّ (অতি বিশুদ্ধ) বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব এ আলোচনার পর আয়াতদ্বয়ে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি থাকে না।

(তাফসীরে রুহুল মাআনী : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২১-২২)

নবী করীম (স) শুধু
ভীতিপ্রদর্শনকারী না সুসংবাদদাতাও?

١. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ.

٢. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

٣. إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ.

٤. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.

٥. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.

٦. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.

٧. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا.

٨. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا.

٩. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. *

١٠. إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ.

١١. إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ.

١٢. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ.

١٣. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ.

١٤. إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ.

١٥. إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ.

١٦. قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ.

١٧. إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ.

١٨. وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.

١٩. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.

অনুবাদ

১. তোমাদের নিকট এসেছে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী। (সূরা মায়েদা : আয়াত ১৯)

২. আমিতো কেবল ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা মুমিন সম্প্রদায়ের জন্যে। (সূরা আরাফ : আয়াত ১৮৮)

৩. নিশ্চয় আমি তোমাদের তা থেকে ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ প্রদানকারী। (সূরা হূদ : আয়াত ০২)

৪. আর আমি আপনাকে একমাত্র সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ১০৫)

৫. আর আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি কেবল সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে। (সূরা ফুরকান : আয়াত ৫৬)

৬. নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে। (সূরা আহযাব : আয়াত ৪৫)

৭. আর আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সকল মানুষের জন্যে একমাত্র সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে। (সূরা সাবা : আয়াত ২৮)

৮. নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে। (সূরা ফাত্বির : আয়াত ২৪)

৯. নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে। (সূরা ফাতহ : আয়াত ০৮)

১০. তিনি তো কেবল সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী। (সূরা আরাফ : আয়াত ১৮৪)

১১. নিশ্চয় আপনি ভয় প্রদর্শনকারী। (সূরা হূদ : আয়াত ১২)

১২. নিশ্চয় আপনি ভয় প্রদর্শনকারী, আর প্রত্যেক জাতির জন্যে রয়েছে পথপ্রদর্শক। (সূরা রাদ : আয়াত ০৭)

১৩. আর নিশ্চয় আমি সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী। (সূরা আনকাবূত : আয়াত ৫০)

১৪. তিনি তো আসন্ন কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ককারী মাত্র। (সূরা সাবা : আয়াত ৪৬)

১৫. আপনি তো কেবল ভয় প্রদর্শনকারী। (সূরা ফাত্বির : আয়াত ২৩)

১৬. বলুন, নিশ্চয় আমি ভয় প্রদর্শনকারী। (সূরা সোয়াদ : আয়াত ৬৫)

১৭. আমার নিকট এ অহীই আসে যে, আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (সূরা সোয়াদ : আয়াত ৭০)

১৮. আর নিশ্চয় আমি একমাত্র সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী। (সূরা আহকাফ : আয়াত ০৯)

১৯. বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার কাছেই আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী। (সূরা মুলক : আয়াত ২৬)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ

প্রথম ৯ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, প্রিয়নবী (স)-কে আল্লাহ তায়ালা বাশীর ও নাযীর অর্থাৎ, জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও জাহান্নাম থেকে ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন।

অথচ শেষোক্ত ১০ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী (স) শুধু ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছেন। কারণ, উক্ত আয়াতসমূহে نَفْى ও اِسْتِثْنَاء কিংবা اِنَّمَا শব্দ দ্বারা নাযীর হওয়াকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যার দরুন বাশীর হওয়া বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং আয়াতগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন

আল্লাহ তায়ালা প্রথমোক্ত নয়টি আয়াতে নবীজী (স)-কে বাশীর ও নাযীর তথা সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী আখ্যা দান করেছেন। কারণ, তিনি মুমিন-মুসলমানদের জন্যে জান্নাত ও তার নেয়ামতসমূহের সুসংবাদ প্রদান করার নিমিত্তে প্রেরিত হয়েছেন এবং কাফের ও মুশরিকদের জন্যে ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে আগমন করেছেন। সুতরাং প্রথমোক্ত ৯ আয়াত মুমিন ও কাফের উভয় দলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

আর শেষোক্ত ১০ আয়াত শুধু কাফেরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যে, প্রিয় নবী (স) কাফেরদের জন্যে শুধু ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছেন। তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করার কোনো সুযোগ নেই। এজন্যে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ আয়াতগুলোতে নবীজী (স)-কে শুধু নাযীর শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। সুতরাং এ আলোচনার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, নবীজী (স) বাশীর ও নাযীর উভয় গুণে গুণান্বিত হয়ে দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছেন। (বয়ানুল কুরআন : খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৯৭, পারা ২২)

কাফেররা নবুওয়তের নিদর্শনাবলি
দেখলে কি ঈমান আনয়ন করতো?

১. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا. *

২. إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ.

অনুবাদ

১. যদি তারা সকল নিদর্শনও দেখে, তবুও তারা তার প্রতি ঈমান আনবে না। (সূরা আনয়াম : আয়াত ২৫)

২. আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে আকাশ থেকে তাদের কাছে কোনো নিদর্শন নাযিল করতে পারি। অতঃপর তাদের গর্দানসমূহ তার সামনে নত হয়ে যাবে। (সূরা শোআরা : আয়াত ৪)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ

১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যদি কাফেররা আপনার নবুওয়তের সমস্ত নিদর্শন দেখে, তবুও তারা ঈমান আনয়ন করবে না।

আর ২ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যদি আমি চাইতাম, তাহলে তাদের ওপর আকাশ থেকে একটি বড় নিদর্শন নাযিল করে দিতে পারতাম। ফলে তাদের ঘাড়সমূহ উক্ত নিদর্শনের সামনে অবনত হয়ে যেত এবং তারা ঈমানও নিয়ে আসত। সুতরাং ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, তারা কোনো নিদর্শন দেখে ঈমান আনয়ন করবে না। অথচ ২ নং আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিছু নিদর্শনের মাধ্যমে তারা ঈমান আনয়ন করতে পারে। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন ১ নং আয়াতে কাফেরদের যে ঈমান না আনার কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐচ্ছিক ঈমান।

আর ২ নং আয়াতে যে ঈমান আনয়নের কথা বলা হয়েছে, তা হলো বাধ্যগত ঈমান। অর্থাৎ, তারা নবুওয়তের সমস্ত নিদর্শনও দেখে স্বেচ্ছায় ঈমান আনয়ন করতো না। অথচ শরীয়তের মধ্যে স্বেচ্ছায় ঈমান আনয়ন করাই উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু যদি আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করতেন, তাহলে এমন নিদর্শনও অবতীর্ণ করতে পারতেন, যার দ্বারা জোরপূর্বক ও বাধ্যবাধকতার সাথে তাদেরকে ঈমান আনয়নকারী বানাতে পারতেন। কিন্তু এমন ঈমান তো শরয়ীভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা এমন নিদর্শন অবতীর্ণ করেননি। সুতরাং ১ নং আয়াতে যে ঈমানকে না করা হয়েছে ২ নং আয়াতে সে ঈমানকে হ্যাঁ করা হয়নি। (বয়ানুল কুরআন : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮৬, পারা ৭)

হযরত আদম (আ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ইচ্ছাকৃত ভক্ষ করেছেন না ভুলবশত?

١. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. *

٢. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا.

অনুবাদ

১. এবং সে বলল, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে এ জন্যেই নিষেধ করেছেন যে, যাতে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা কিংবা চিরস্থায়ীদের মধ্য থেকে না হয়ে যাও। (সূরা আরাফ : আয়াত ২০)

২. আমি ইতঃপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মাঝে দৃঢ়তা পাইনি। (সূরা তোয়াহা : আয়াত ১১৫)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, হযরত আদম (আ) বেহেশতের মধ্যে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষ করেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে। কেননা, উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, ইবলিস হযরত আদম ও হাওয়াকে বলল, হে আদম ও হাওয়া! তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের এ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন এজন্যে যে, যাতে তোমরা ফেরেশতার গুণে গুণান্বিত হতে না পার, কিংবা জান্নাতে চিরকাল বসবাসকারী হতে না পার।

অতঃপর অভিশপ্ত ইবলিস একটি মিথ্যা, বানোয়াট অপকৌশল বর্ণনা করতে গিয়ে আরো বলল, এ গাছের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর তা হলো, যে ব্যক্তি এ গাছের ফল ভক্ষণ করবে, সে ফেরেশতা গুণের অধিকারী হয়ে যাবে এবং সর্বদা জান্নাতে বসবাস করবে।

অথচ ২ নং আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, তিনি ভুলক্রমে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেছেন। কেননা, উক্ত আয়াতে نسى শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অতএব আয়াতদ্বয় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : যখন ইবলিস শয়তান হযরত আদম (আ)-কে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করতে উৎসাহ প্রদান করল এবং আল্লাহর নিষেধের হেকমত বর্ণনা করতে লাগল, তখন হযরত আদম (আ) তার কথা মোটেই বিশ্বাস করলেন না এবং ফল ভক্ষণের ধারে-কাছেও গেলেন না। কারণ, সে সময় হযরত আদম (আ) আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা স্মরণ রেখে শয়তানের প্ররোচনায় নিমজ্জিত হয়ে এমন গর্হিত কাজে লিপ্ত হতে পারেন না। হ্যাঁ, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত আদম (আ) উক্ত নিষেধাজ্ঞা ভুলে গেলেন। অবশ্য শয়তানের বর্ণনাকৃত বানোয়াট অপকৌশলটি হযরত আদমের স্মরণ হলো। এজন্যে তিনি ফেরেশতা গুণের অধিকারী ও চিরস্থায়ী জান্নাতী হওয়ার জন্যে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভুলবশত ভক্ষণ করে ফেলেন। অতএব এ আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝে আসল যে, হযরত আদম (আ) আল্লাহ তায়ালার নিষেধাজ্ঞা স্মরণ রেখে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করেননি। (শায়খ যাদাহ : খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৭৮)

মানব ও জিন জাতিকে ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, নাকি ইবাদত বর্জনের জন্যে?

١. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. *

٢. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

অনুবাদ

১. আর আমি জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছি বহু জিন ও ইনসান।
(সূরা আরাফ : আয়াত ১৭৯)

২. আর আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যে। (সূরা যারিয়াত : আয়াত ৫৬)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা বহু মানব ও জিনকে জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। আর জাহান্নামে মানব ও জিন প্রবেশ করবে ইবাদত বর্জনের কারণে। সুতরাং এবার আয়াতটির সারমর্ম হবে এই যে, আল্লাহ তায়ালা বহু মানব ও জিনকে ইবাদত বর্জনের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। অথচ ২ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা মানব ও জিনকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মাঝে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : মানব ও জিনকে সৃষ্টি করার দুটি উদ্দেশ্য। যথা– (১) مَقْصَد تَكْوِيْنِى (অস্তিত্বগত উদ্দেশ্য)। (২) مَقْصَد تَشْرِيْعِى (বিধানগত উদ্দেশ্য)। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা ১ নং আয়াতে মানব ও জিনের অস্তিত্বগত উদ্দেশ্যের বর্ণনা প্রদান করেছেন যে, বহু মানব ও জিনকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর ২ নং আয়াতে বিধানগত উদ্দেশ্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, মানব ও জিনকে বিধানগত দিক দিয়ে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু সে হেকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়াদি আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করা হলো, যেগুলোর কারণে বহু মানব ও জিন ইবাদতে মশগুল থাকবে না এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতএব আয়াতদ্বয়ের উদ্দিষ্ট বস্তু ভিন্ন হওয়ার পর আয়াতদ্বয়ের মাঝে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি থাকতে পারে না। (বয়ানুল কুরআন : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৪, পারা ৯)

সাহাবায়ে কেরাম কি প্রিয়নবী (স)-এর কাছ থেকে জিহাদে গমন থেকে বিরত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করতেন?

١. لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يُّجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. *

٢. وَإِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰۤى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوْهُ.

অনুবাদ

১. আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে, তারা মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না। (সূরা তাওবা : আয়াত ৪৪)

২. এবং রাসূলের সাথে কোনো সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলে যায় না। (সূরা নূর : আয়াত ৬২)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও শেষ দিবসকে বিশ্বাস করে, সে নিজ জানমাল নিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে কখনো আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করবে না।

আর ২ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যখন তারা নবীজী (স)-এর সাথে এমন কাজে মশগুল থাকে, যার জন্যে তাদেরকে একত্র করা হয়েছে; যেমন– জিহাদ, নামাযে জুমা ও নামাযে ঈদ ইত্যাদি, তখন তারা সে কাজ থেকে কোথাও যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা নবীজীর কাছ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করে।

সুতরাং ১ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ থেকে বিরত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করা যাবে না। আর ২ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, অনুমতি প্রার্থনা করা যাবে।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১ নং আয়াতে যে اِسْتِيْذَان (অনুমতি প্রার্থনা)-কে নিষেধ করা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– اِسْتِيْذَان بِلَا عُذْر অর্থাৎ, কোনো ওজর ব্যতীত জিহাদে গমন করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করা।

আর ২ নং আয়াতে যে اِسْتِيْذَان সাব্যস্ত করা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– اِسْتِيْذَان بِالْعُذْر অর্থাৎ, ওজরবশত জিহাদে গমন থেকে বিরত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করা, যা সম্পূর্ণ বৈধ বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং ১ নং আয়াতে যে اِسْتِيْذَان নিষেধ করা হয়েছে, শেষোক্ত আয়াত দ্বারা তাকেই সাব্যস্ত করা হয়নি। (বয়ানুল কুরআন : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১৪, পারা ১০)

আজাব প্রত্যক্ষ করার পর
ঈমান আনয়নে কোনো লাভ হবে কি না?

١۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ. *

٢۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ.

অনুবাদ

১. সুতরাং কোনো জনপদ কেন এমন হলো না যে ঈমান এনেছে, অতঃপর তার সে ঈমান উপকারে এসেছে? তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত। তারা যখন ঈমান আনল তখন আমি দূর করে দিয়েছি তাদের থেকে অপমানজনক আজাব। (সূরা ইউনুস : আয়াত ৯৮)

২. অতঃপর তাদের এ ঈমান তাদের কোনো উপকারে আসল না যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল। আল্লাহর এ নিয়মই পূর্ব থেকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। (সূরা মুমিন : আয়াত ৮৫)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ

১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহর আজাব প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান আনয়ন করা কারো জন্যে লাভজনক নয়। কিন্তু এ বিধান থেকে বাদ রাখা হয়েছে হযরত ইউনুস (আ)-এর কওমকে। তারা আজাব প্রত্যক্ষ করার পরও যখন ঈমান আনয়ন করে, তখন তাদের ঈমান আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য ও ফায়দাজনক হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কিছুলোক আল্লাহর আজাব প্রত্যক্ষকরণকালেও যদি ঈমান আনয়ন করে, তাহলে তা তাদের জন্যে ফায়দাজনক বলে গণ্য হবে।

আর ২ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, যখন মানুষ আল্লাহর আজাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা যদি ঈমান নিয়ে আসে, তাহলে সে ঈমান তাদের জন্যে কোনো উপকার সাধন করতে পারবে না। ফলে এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আজাব প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান আনয়ন উপকারী নয়। অতএব আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন

১. আল্লাহ তায়ালার নিয়ম হলো, আজাব প্রত্যক্ষ করার পর কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য ও লাভজনক না হওয়া। কিন্তু কিছু কিছু লোকের ক্ষেত্রে উক্ত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছিল। যেমন– হযরত ইউনুস (আ)-এর কওমকে উক্ত নিয়ম থেকে বাদ রাখা হয়েছে। তাদের ঈমান আজাব প্রত্যক্ষকরণের পরও গ্রহণযোগ্য ও লাভজনক বলে বিবেচিত হয়েছে। সুতরাং এটি তাদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈশিষ্ট্য ও ইসতিসনার কথা জানার পর আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারে না।

২. প্রথমোক্ত আয়াতটি আজাব প্রত্যক্ষকরণের প্রাথমিক অবস্থার ওপর ভিত্তিশীল। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি আজাব প্রত্যক্ষ করার প্রারম্ভেই আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করে, তাহলে সে ঈমান তার জন্যে লাভজনক হবে। আর যদি আজাব প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান আনয়ন করে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, যা ২ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩০-৩১, পারা ১১)

অহী আসার পূর্বে প্রিয়নবী (স) ও তাঁর কওম
কি পূর্বেকার গোত্রসমূহের কাহিনী জানতেন?

১. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا.

২. لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ. *

৩. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ.

অনুবাদ

১. এটা অদৃশ্যের সংবাদ, যা আমি আপনার নিকট প্রত্যাদেশ হিসেবে প্রেরণ করেছি, যা আপনি বা আপনার জাতি ইতঃপূর্বে জানত না। (সূরা হূদ : আয়াত ৪৯)

২. যাদের সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানত না। (সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৯)

৩. তোমাদের নিকট কি তোমাদের পূর্ববর্তী নূহ, আদ ও সামূদ জাতি এবং তাদের পরবর্তী জাতিসমূহের সংবাদ আসেনি। (সূরা ইবরাহীম : আয়াত ০৯)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, এ ঘটনা অর্থাৎ, হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনা যা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, গায়েবের সংবাদ থেকে আমি আল্লাহ আপনার নিকট অহীর মাধ্যমে পৌঁছে দিলাম। অহী আসার পূর্বে আপনার ও আপনার কওমের এ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই ছিল না। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অহী আসার পূর্বে নবীজী (স) ও তাঁর কওম (মক্কার কাফেররা) পূর্বেকার উম্মত ও গোত্রসমূহের কোনো ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

এভাবে ২ নং আয়াতেও ইরশাদ হয়েছে যে, পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই অবগত আছেন।

অথচ ৩ নং আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, হে মক্কার কাফেররা! তোমাদের কাছে কি ওদের সংবাদ নেই যারা তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেল।

অর্থাৎ, নূহ (আ)-এর উম্মত, আদ ও সামূদ জাতি এবং তাদের পরবর্তী লোকদের বিভিন্ন কাহিনী ও ঘটনাবলির সংবাদ কি তোমাদের কাছে নেই? এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা অস্বীকৃতিমূলক নেতিবাচক প্রশ্নের মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করেছেন। যার সারাংশ হলো, পূর্বেকার উম্মতগণের বিভিন্ন ঘটনার সংবাদ তোমাদের কাছে অবশ্যই আছে। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, নবীজী (স) ও তাঁর কওম পূর্ববর্তী উম্মতগণের কাহিনী সম্পর্কে অবগত ছিলেন। অতএব আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১ নং ও ২ নং আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে নবীজী (স) ও তাঁর কওম পূর্ববর্তী উম্মতগণের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে যে জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বিস্তারিত জ্ঞান ও ইলম না থাকা।

আর ৩ নং আয়াতে যে জ্ঞান থাকার কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সংক্ষিপ্ত জ্ঞান ও ইলম থাকা। অর্থাৎ, নবীজী (স) ও তাঁর কওম পূর্বেকার উম্মতগণের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে জানতেন এবং বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তায়ালা অহীর মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়েছেন। সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের সাথে ৩ নং আয়াতের আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি নেই।

(বয়ানুল কুরআন : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫, পারা ১৩; ইমদাদুল ফাতাওয়া : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৯)

প্রত্যেক উম্মতের জন্যে
রাসূল প্রেরিত হয়েছেন কি?

١. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ.

٢. وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ. *

٣. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ.

٤. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ.

٥. وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ.

অনুবাদ

১. আমরা প্রত্যেক জাতির মাঝেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। (সূরা নাহাল : আয়াত ৩৬)

২. এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি। (সূরা ফাতির : আয়াত ২৪)

৩. যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করেন যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোনো ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি। (সূরা আল-কাসাস : আয়াত ৪৬)

৪. যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করেন, যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোনো ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি। (সূরা সাজদা : আয়াত ০৩)

৫. আর আপনার পূর্বে আমি তাদের নিকট কোনো ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরণ করিনি। (সূরা সাবা : আয়াত ৪৪)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং ও ২ নং আয়াতদ্বয় দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক উম্মতের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর শেষোক্ত ৩ আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কোনো কোনো কওম (সম্প্রদায়) এমনও ছিল যাদের মাঝে কোনো রাসূল প্রেরিত হননি। সুতরাং আয়াতগুলোর মাঝে বাহ্যিক দিক দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১. প্রথমোক্ত আয়াতে كُلّ শব্দটি تَكْثِيْر তথা আধিক্য বোঝাবার জন্যে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং এবার আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, অধিকাংশ কওম বা গোত্রের মাঝে আল্লাহ তায়ালা রাসূল পাঠিয়েছেন। তবে কিছু কিছু কওম ও গোত্রের মাঝে কোনো রাসূল পাঠাননি।

(বয়ানুল কুরআন : খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৪, পারা ১৪)

২. প্রথমোক্ত দুই আয়াতে যা বলা হয়েছে অর্থাৎ, প্রত্যেক উম্মতের জন্যে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে– এ কথা পূর্ববর্তী উম্মতগণের ব্যাপারে প্রযোজ্য। তৎকালে প্রত্যেক উম্মতের জন্যে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে এমনটা হয়নি। (বয়ানুল কুরআন : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৫, পারা ১৪)

জান্নাতের হুরসমূহ সাদা-হলদে বর্ণ হবে নাকি লাল-সাদা মিশ্রিত?

١. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ. *

٢. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ.

অনুবাদ

১. যেন তারা সংরক্ষিত ডিম। (সূরা সাফফাত : আয়াত ৪৯)

২. ইয়াকুত ও মুক্তাসদৃশ রমণীগণ। (সূরা আর-রহমান : আয়াত ৫৮)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ

১ নং আয়াতে জান্নাতের হুরসমূহকে পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছতা ও রঙের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত ও আচ্ছাদিত ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমনিভাবে ডিমের রং সাদা-হলদে মিশ্রিত উজ্জ্বল হয় এবং পক্ষিকুলের পালকে আচ্ছাদিত হওয়ার কারণে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়। ফলে সেগুলোতে কোনো ধুলোবালি মিশ্রিত হতে পারে না এবং কারো হাত লেগে ময়লাযুক্ত হতে পারে না। ঠিক তেমনিভাবে জান্নাতের হুরসমূহের রঙও সাদা-হলদে মিশ্রিত উজ্জ্বল চমৎকার ও স্বচ্ছ হয়। খাঁটি সাদা বর্ণ যা বকের মতো কিংবা দুধ অথবা চুনের মতো, তা দর্শকের জন্যে আকর্ষণীয় হয় না; বরং পুরুষ সেসব মহিলার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয় যাদের শারীরিক বর্ণ সাদা হওয়ার সাথে সাথে কিছুটা হলদে বর্ণের দিকে ধাবিত হয়। সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, জান্নাতের হুরসমূহের গায়ের বর্ণ সাদা-হলদে মিশ্রিত হবে।

আর ২ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, হুরসমূহের বর্ণ লাল-সাদা মিশ্রিত হবে। কেননা, উক্ত আয়াতে ওদেরকে ইয়াকুত ও মারজানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ইয়াকুত লাল বর্ণের মূল্যবান পাথরে নাম। আর মারজান সাদা রঙের ছোট ছোট মোতিগুলোকে বলা হয়। সুতরাং ইয়াকুত ও মারজান উভয়ের সাথে তুলনা দেয়ার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুরসমূহের বর্ণ হবে লাল-সাদা মিশ্রিত। অতএব আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল।

ক. ১ নং আয়াতে জান্নাতি হুরগণকে بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ তথা সুরক্ষিত ও আচ্ছাদিত ডিমের সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে বর্ণের দিক দিয়ে।

আর ২ নং আয়াতে ইয়াকুতের মতো বলা হয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ হওয়ার অনুপাতে। এভাবে মারজানের মতো বলা হয়েছে মসৃণ ও সুদর্শন হওয়ার মিমিত্তে। সুতরাং উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয়ের সারমর্ম হবে, জান্নাতি হুরগণ সাদা-হলদে বর্ণবিশিষ্ট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ, মসৃণ ও সুদর্শন অবয়বের অধিকারী হবে।(তাফসীরে রুহুল মাআনী : খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৯০)

খ. আয়াতদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনকল্পে এ জবাবও প্রদান করা যাবে যে, হুরদের মুখাবয়বের বর্ণ হবে সাদা-লাল মিশ্রিত গোলাপের মতো। আর বাকি শরীরের বর্ণ হবে সাদা-হলদে মিশ্রিত। সুতরাং ২ নং আয়াতখানা মুখাবয়বের বর্ণনা প্রদান করার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আর ১ নং আয়াত বাকি শরীরের রংয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

(তাফসীরে রুহুল মাআনী : খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৯০)

প্রিয়নবী (স) পথভ্রষ্ট ছিলেন কি?

১. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى. *
২. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى.

অনুবাদ

১. তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। (সূরা নাজম : আয়াত ২)

২. আর তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর তিনি আপনাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করেছেন। (সূরা দোহা : আয়াত ০৭)

দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ : ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্টও হননি এবং বিপথগামীও হননি।

আর ২ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে (নবীজীকে) পথহারা পেয়েছেন। অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব ১ নং আয়াতে নবীজী (স)-কে পথভ্রষ্ট না হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন। আর ২ নং আয়াতে পথভ্রষ্ট হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন। ফলে আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল।

দ্বন্দ্ব-নিরসন : ১. ضَلَال তথা পথভ্রষ্টতা দুই প্রকার। (১) عُدُوْلٌ عَنِ الطَّرِيْقِ بَعْدَ الْعِلْمِ (জেনেশুনে পথ থেকে সরে যাওয়া), যাকে পথভ্রষ্টতা বা কুফর দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়। (২) عُدُوْلٌ عَنِ الطَّرِيْقِ قَبْلَ الْعِلْمِ (না জেনে পথ থেকে সরে যাওয়া), যাকে অজ্ঞতা বা অসতর্কতার দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়। ১ নং আয়াতে ضَلَال (পথভ্রষ্টতা)-এর প্রথম প্রকারকে রহিত করা হয়েছে যে, প্রিয়নবী (স)-এর নিকট ইলমে অহী আসার পর তিনি সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত হননি। এমনটা কখনো তাঁর শানে হতেও পারে না।

আর ২ নং আয়াতে ضَلَال (পথভ্রষ্টতা)-এর দ্বিতীয় প্রকার সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, প্রিয়নবী (স) ইলমে অহী আসার পূর্বে শরয়ী হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না। আল্লাহ তায়ালা ইলমে অহীর মাধ্যমে তাঁকে জ্ঞাত করে দেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلَا

الْإِيْمَانُ (আপনি ইলমে অহী আসার পূর্বে কুরআন সম্পর্কে জানতেন না যে, এটি কি জিনিস এবং এটাও জানতেন না যে, ঈমানের বিস্তারিত বিবরণ ও শরীয়তের হুকুম-আহকাম কি বস্তু)। এভাবে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ (আপনি অহী আসার পূর্বে ধর্মীয় বিধিবিধান থেকে বেখবর ও অনভিজ্ঞ ছিলেন)। অবশ্য ইলমে অহী আসার পূর্বে শরীয়ত ও তার হুকুম-আহকাম থেকে অনভিজ্ঞ হওয়া কোনো দূষণীয় ব্যাপার নয়। সুতরাং এ বিবরণ অনুযায়ী আয়াতদ্বয়ের মাঝে সৃষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসন হয়ে গেল। (ইমদাদুল ফাতাওয়া : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬৯; রূহুল মাআনী : খণ্ড ৩০, পৃষ্ঠা ১৬২)

২. দ্বিতীয় জবাব হলো, ২ নং আয়াতে ضَلَال শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য সঠিক পথ থেকে গোমরাহ হয়ে যাওয়া নয়; বরং সফর ইত্যাদিতে যাওয়ার প্রাক্কালে রাস্তা ভুলে যাওয়া। সুতরাং আয়াতটির সারমর্ম হলো, নবীজী (স) একদা সফররত অবস্থায় রাস্তা ভুলে গেলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সঠিক রাস্তার সন্ধান লাভে ধন্য করলেন।

অনুরূপ একটি বর্ণনা হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব থেকেও বর্ণিত আছে যে, একদা হুজুর (স) স্বীয় চাচা হযরত আবু তালেবের সাথে সিরিয়া সফর করছিলেন। প্রিয়নবী উটের উপর আরোহী ছিলেন। রাত্র ছিল খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন। নবীজী (স) ঘুমিয়ে পড়লেন উটের পৃষ্ঠের উপর। এমতাবস্থায় অভিশপ্ত ইবলিস আসল এবং উটের রশি ধরে তাকে সঠিক রাস্তাচ্যুত করে ফেলল, ফলে নবীজী (স) কাফেলার লোকজনকে হারিয়ে ফেললেন। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) উপস্থিত হলেন এবং ইবলিসকে খুব জোরে ফু মেরে হাবশা দেশে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর নবীজী (স)-কে সঠিক পথের সন্ধানের মাধ্যমে কাফেলার লোকজনের নিকট পৌঁছে দিলেন।

অন্য এক রেওয়ায়াতে উল্লেখ আছে যে, একদা নবীজী (স) শৈশবকালে মক্কার গিরিপথে রাস্তা ভুলে যাওয়ার কারণে হারিয়ে গেলেন এবং দাদাজান থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। আবু জেহেল নবীজীকে দেখে বুঝতে পারল যে, তিনি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন। ফলে সে নবীজীকে দাদাজান আব্দুল মুত্তালিবের নিকট পৌঁছে দিল। মুত্তালিব তখন কাবা শরীফের গিলাফ ধরে ক্রন্দনরত অবস্থায় আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন যে, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (স)-কে আমার কাছে পুনরায় উপস্থিত করে দাও। আবু জেহেল তাকে বলল, আমি মুহাম্মদ (স)-কে সওয়ার করানোর

জন্যে আমার উটকে উপবিষ্ট করালাম এবং মুহাম্মদকে আমার পিছনে বসালাম। অতঃপর উটকে বসানো থেকে উঠাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু উট উঠতে রাজি হলো না। তারপর যখন আমি মুহাম্মদকে আমার সামনে বসালাম, তখন উট খুব দ্রুতই ওঠে গেল এবং একথা বলে চলতে লাগল- يَا اَحْمَقُ هُوَ الإِمَامُ فَكَيْفَ يَقُوْمُ خَلْفَ الْمُقْتَدِى (হে নির্বোধ! এ শিশুটি তো ইমাম। মুকতাদির পিছনে কীভাবে বসবে?) এ ধরনের আরো বহু ঘটনা তাফসীরের কিতাবসমূহে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং উপর্যুক্ত ২ নং আয়াতে ضلال দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাস্তা ভুলে যাওয়া; সঠিক ধর্মচ্যুত হওয়া নয়। এবার আয়াতদ্বয়ের মাঝে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। (তাফসীরে রুহুল মাআনী : খণ্ড ৩০, পৃষ্ঠা ১৬২)

বইটি রচনায় যেসব গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে

ক্রম :	কিতাব	লেখক	মৃত্যুসন
১	আল কুরআন		
২	আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন	জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র)	৯১১ হি.
৩	ইমদাদুল ফাতাওয়া	আশরাফ আলী থানভী (র)	১৩৬২ হি.
৪	বয়ানুল কুরআন	আশরাফ আলী থানভী (র)	১৩৬২ হি.
৫	তাফসীরে বায়যাবী	নাসিরুদ্দীন আব্দুল্লাহ (র)	৬৯২ হি.
৬	তোহফায়ে ইছনা আশারিয়া	শাহ্ আব্দুল আযীয (র)	১২৩৯ হি.
৭	তাফসীরে ইবনে কাসীর	আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (র)	৭৭৪ হি.
৮	তাফসীরে আবুস সাঊদ	মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-ইমাদী (র)	৯৫১ হি.
৯	তাফসীরে খাযেন	আলী ইবনে মুহাম্মদ (র)	৭২৫ হি.
১০	তাফসীরে কুরতুবী	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ (র)	৬৭১ হি.
১১	তাফসীরে কাবীর	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ওমর রাজী (র)	৬০৬ হি.
১২	তাফসীরে কাশশাফ	মাহমুদ ইবনে ওমর যামাখশরী (র)	৫৩৮ হি.
১৩	তাফসীরে মাদারিক	আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ আন-নাসাফী (র)	৭৪০ হি.
১৪	তাফসীরে মাযহারী	ছানাউল্লাহ পানিপথী (র)	১২২৫ হি.
১৫	তাফসীরে জালালাইন	জালালুদ্দীন মহল্লী ও সুয়ূতী (র)	৮৬৪ ও ৯১১ হি.
১৬	জুমাল আলাল জালালাইন	সোলাইমান ইবনে ওমর (র)	১২০৪ হি.
১৭	রূহুল মাআনী	আবুল ফযল মাহমুদ আলূসী (র)	১২৭০ হি.
১৮	আর রওযুন নাযীর	মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী (র)	
১৯	শায়খ যাদাহ	মুহাম্মদ ইবনে মুসলেহ উদ্দীন (র)	৯৫১ হি.
২০	সাবী আলাল জালালাইন	আহমদ ইবনে মুহাম্মদ (র)	১২৪১ হি.
২১	আল ফাওযুল কাবীর	শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)	১১৯১ হি.
২২	মিসবাহুল লুগাত	আব্দুল হাফীয বালয়াভী (র)	
২৩	মাআরিফুল কুরআন	মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)	১৩৯৬ হি.
২৪	আন-নিবরাস	আব্দুল আযীয ইবনে আহমদ (র)	১২৪০ হি.

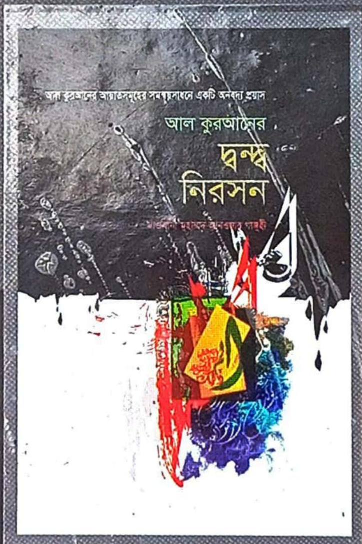

মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ

www.alfatahbd.com